জীবনী-সন্দর্ভ।

(বঙ্গের কর্ম্মবীরগণের জীবনী-সংগ্রহ।)

[চরিত্র গঠনোপযোগী প্রথম পুস্তক।]

বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

Calcutta:

S. C. AUDDY & CO., BOOK-SELLERS & PUBLISHERS.

58 & 12, WELLINGTON STREET.

সন ১৩২৪ সাল।

 [মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

PRINTED BY J. BANERJI
THE LAWRENCE PRINTING WORKS
3, Ramaprosad Roy Lane,
CALCUTTA.



শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ প্রামাণিক।

[illegible] তারক নাথ প্রামাণিক মহাশয়ের

পৌত্র উদারচেতা, বিদ্যোৎসাহী, দয়াবান্

স্বদেশানুরক্ত শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু

প্রমথ নাথ প্রামাণিক মহাশয়ের

কমনীয় করে এই সঙ্গীত সংগ্রহ

অর্পিত হইল।

প্রকাশক।

ভূমিকা।

যাঁহাদের প্রতিভা প্রভাবে বঙ্গসমাজ ও বঙ্গভাষার সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, যাঁহারা বাঙ্গালার গৌরব, যাঁহাদের নাম সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতির ইতিহাসে চিরদিন জাজ্বল্যমান থাকিবে, যাঁহাদের জীবন-বৃত্তান্ত অতীব আদরের ও গৌরবের সামগ্রী, সেই সকল প্রাতঃস্মরণীয় ক্ষণজন্মা মহাত্মগণের চরিত্রকাহিনী ও কীর্ত্তিকলাপ অবগত হইলে আত্ম-গৌরব উদ্দীপিত হইয়া থাকে। দেশের গৌরবস্থল সেই সকল পূর্ব্ব পুরুষগণের জীবনচরিত অবগত হইতে না পারিলে প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার অঙ্গহানি হয়। জীবন-চরিত মানবের প্রধান সখা ও শিক্ষাদাতা। জীবন চরিত পাঠে স্বীয় চরিত্রের উৎকর্ষ লাভ করিতে পারা যায়। শিষ্টাচার, বিনয়, সৎসাহস, সাধুতা, সত্যপরায়ণতা প্রভৃতি গুণলাভ আদর্শ চরিত্র মহাপুরুষগণের জীবন-চরিত পাঠেই হইয়া থাকে। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যই চরিত্র গঠন, এবং চরিত্রই সকল উন্নতির মূল। সুতরাং চরিত্রবান্ হইতে হইলে, জীবনে সফলকাম উন্নত-চরিত্র মহাত্মগণের জীবন-কাহিনী প্রত্যেকেরই পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; এবং তাঁহাদের অবলম্বিত পথানুবর্ত্তী হওয়া সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজন।

চরিত্রবান্ ব্যক্তির মনে শান্তি ও দেহে কান্তি, হৃদয়ে সাহস ও বাক্যে তেজস্বিতা সর্ব্বদা বিরাজমান থাকে। তিনি বিনয় ও সৌজন্য, সত্য-নিষ্ঠা ও সাধুতা, দয়া ও বদান্যতা প্রভৃতি গুণে ভূষিত হইয়া, ইহ জগতে নর-দেবতারূপে সকলকার পূজ্য হইয়া থাকেন। তাঁহার গুণ-প্রভায় জগৎ উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু শিক্ষিত হইয়াও চরিত্রহীন হইলে সকলকার ঘৃণার পাত্র হইতে হয় এবং চরিত্রহীন ব্যক্তির দ্বারা জগতের কোন উপকার

সাধিত হয় না। কারণ স্খলিত-চরিত্র ব্যক্তিগণ অহঙ্কারদৃপ্ত, ব্যসনমত্ত ও হীনমতি হইয়া থাকে। তাহারা কখনই মহত্ত্বের অধিকারী ও আদর্শপুরুষ হইতে পারে না। তাহারা সর্ব্বদাই শঙ্কিত, অশান্ত-হৃদয়, ক্রূরকর্ম্মা, কুটিল ও সঙ্কুচিতমনা হইয়া থাকে। সুতরাং শিক্ষালাভের সহিত চরিত্রবান্ হওয়া সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজন। ইহার জন্যই জীবনী পাঠের আবশ্যকতা।

অধ্যবসায় থাকিলে মানুষ কত বড় হইতে পারে, চেষ্টা ও যত্ন দ্বারা সহায়হীন দরিদ্র অবস্থা হইতে কত উন্নতি করিতে পারা যায়, তাহা মহাপুরুষগণের জীবন-চরিত পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়। কি বিপদে, কি সম্পদে ইহা নিয়ত ছায়ার ন্যায় অনুগামী হইয়া সতত সদুপদেশ দানে মনকে মহত্ত্বের অনুসারী করে। দারিদ্র দুঃখে নিমগ্ন হইলে ইহা উদ্ধার হইবার পথ দেখাইয়া দেয়। ধনমদে মত্ত হইয়া বিপথগামী হইলে, ইহা তৎক্ষণাৎ বিবেকের উপর আধিপত্য করিয়া সৎপথে লইয়া যায়। সন্তাপ অনলে দগ্ধ হইলে, ইহার শান্তি বারিতে মনঃপ্রাণ শীতল হয়। ফলতঃ জীবনীর ন্যায় সদুপদেষ্টা, সদুৎসাহদাতা, সুখ ও শান্তির স্রষ্টা, সদ্বন্ধু জগতে আর নাই।

বাঙ্গালা সাহিত্যে মহৎলোকের জীবনী পুস্তকের সম্পূর্ণ অভাব। ইহার প্রধান কারণ বাঙ্গালী এখনও জীবনচরিত পাঠের উপকারিতা বুঝে নাই। যাহাতে মানব চরিত্রবান্ হইয়া উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করিতে পারে এবং পাপ প্রলোভনকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতে সমর্থ হয়, সেই সকল পুস্তকের উপকারিতা এ হতভাগ্য দেশে কেহ বুঝিল না। বিলাতে যে সকল ব্যক্তি স্বীয় প্রতিভা ও চরিত্রবলে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহাদের জীবনচরিত কিরূপ সমাদরে পঠিত হয়! কিন্তু আমাদের দেশে সেরূপ পুস্তকের অভাব বশতঃ, আমরা এতদ্দেশীয় মহাপুরুষগণের জীবনচরিত পাঠে বঞ্চিত হইয়া থাকি। তজ্জন্যই দেশব্যাপী চরিত্রহীনতা, তজ্জন্যই আমাদের এত অবনতি।

এই সমস্ত কারণে আমাদের দেশের মহাত্মগণ যাঁহারা অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া অমর হইয়াছেন, তাঁহাদের জীবনী সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করিলাম। তাঁহাদের জন্মকাল অনুসারে যথাক্রমে ইহা সজ্জিত হইয়াছে। জীবনচরিত লিখিতে গেলে দেশের আভ্যন্তরীণ ইতিহাসকে বাদ দেওয়া চলে না; সুতরাং তৎকালীন সমাজের অবস্থা ও সমসাময়িক ইতিবৃত্ত কিছু কিছু প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা সুখপাঠ্য ও সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিতে যত্ন, অর্থ ও চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই। এক্ষণে ইহা সর্ব্ব সাধারণের উপভোগ্য হইয়া চরিত্রগঠনে সমর্থ হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। এই পুস্তক সঙ্কলন করিতে আমি অনেক গ্রন্থকারের নিকট ঋণী, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম। যাঁহাদের অনুগ্রহে দুষ্প্রাপ্য চিত্রসকল সংগৃহীত হইয়াছে, তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। বহু চেষ্টাতেও কৃষ্ণপান্তি ও লালাবাবুর চিত্র সংগ্রহ করিতে পারি নাই। যদি কেহ তল্লাভে আনুকূল্য প্রদান করেন, তাহা হইলে বিশেষ বাধিত হইব। পরিশেষে বক্তব্য আমার আবাল্য অকৃত্রিম বন্ধু, রিপন কলেজের শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষাল বি, এ, মহাশয় এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত প্রুফ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন; তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। ইচ্ছা ছিল এই পুস্তকে আরও অনেক জীবনী প্রদান করিব, কিন্তু ইহার কলেবর বৃদ্ধি হওয়ায় অধিক মূল্য হইবে বলিয়া, অবশিষ্ট জীবনীর জন্য দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

কলিকাতা
১২ই আশ্বিন, ১৩২৪। } গ্রন্থকার।

সূচী পত্র

☞ জন্ম তারিখ অনুসারে নামগুলি পর্য্যায়ক্রমে সজ্জিত হইয়াছে

চিত্র সূচী।

জীবনী-সন্দর্ভ ২য় ভাগ।

(যন্ত্রস্থ)

ইহাতে নিম্নলিখিত মহাপুরুষগণের জীবনী থাকিবে।

১	রাজেন্দ্রলাল মল্লিক	...	...	১৮১৯
২	বিদ্যাসাগর	...	...	১৮২০
৩	শম্ভূনাথ পণ্ডিত	...	...	১৮২০
৪	অক্ষয় কুমার দত্ত	...	...	১৮২১
৫	রাজেন্দ্রলাল মিত্র	...	...	১৮২৪
৬	মাইকেল মধুসূদন	...	...	১৮২৪
৭	ভূদেব মুখোপাধ্যায়	...	...	১৮২৫
৮	মহেন্দ্রলাল সরকার	...	...	১৮৩৩
৯	কেশবচন্দ্র সেন	...	...	১৮৩৮
১০	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	...	১৮৩৮
১১	কৃষ্ণদাস পাল	...	...	১৮৩৮
১২	নরেন্দ্রনাথ সেন	...	...	১৮৪৩



মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও সম্মুখে গোপাল ভাঁড়।

By Kind permission of Maharaja Kshounish Chundra Ray Bahadur of Nadia.



জীবনী-সন্দর্ভ।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র।

যে মহাপুরুষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, বিলাস ও বিভবের ক্রোড়ে সংবর্দ্ধিত হইয়াও বিনয় এবং দয়ার অবতার ছিলেন, সেই দানশীল ধর্ম্মপরায়ণ কোমলচেতা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ১৭১০ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি স্বনামধন্য বিখ্যাত রাজা ভবানন্দ মজুমদারের বংশধর। ইহাঁর জীবনী প্রসন্নসলিলা জাহ্নবীর জলপ্রবাহের ন্যায় পবিত্র ও মধুর। তাঁহার উদার দান-শীলতা ও সারল্যময় সদাচার চিরকাল বঙ্গের গৃহে গৃহে দৃষ্টান্তস্বরূপ জাজ্বল্যমান থাকিবে। যখন সমগ্র বঙ্গদেশ যথেচ্ছাচারী যবনের অধিকারে উৎপীড়িত হইয়া মুহ্যমান হইতেছিল, তখন ইনি নিজ জীবন তুচ্ছ করিয়া স্বীয় মস্তকে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সমগ্র দেশ রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাঁরই বুদ্ধিকৌশলে আজ সমগ্র ভারত দুর্ব্বিনীত মুসলমান নৃপতিগণের হস্ত হইতে চ্যুত হইয়া ন্যায়বান ইংরাজগণের হস্তে শান্তিলাভ করিতেছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র হইতেই এদেশে ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত।

কৃষ্ণচন্দ্র ভবানন্দ হইতে ৭ম পুরুষ। ভবানন্দের পূর্ব্বপুরুষের পূর্ব্ব নিবাস যশোহরের অন্তর্গত হাবিলী পরগণার অধীন কাঁকদি গ্রামে ছিল। কিরূপে ইহাঁরা রাজা হইলেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও বংশ পরিচয় নিম্নে প্রকটিত হইল।

বংশপরিচয়।

১ ভট্টনারায়ণ, ২ নিপু, ৩ হলায়ুধ, ৪ হরিহর, ৫ কন্দর্প, ৬ বিশ্বম্ভর, ৭ নরহরি, ৮ নারায়ণ, ৯ প্রিয়ঙ্কর, ১০ ধর্ম্মাঙ্গদ, ১১ তারাপতি, ১২ কামদেব, ১৩ বিশ্বনাথ, ১৪ রামচন্দ্র, ১৫ সুবুদ্ধি, ১৬ কংসারি, ১৭ ত্রিলোচন, ১৮ ষষ্ঠীদাস, ১৯ কাশীনাথ, ২০ রামসমাদ্দার, ২১ দুর্গাদাস (ভবানন্দ মজুমদার), ২২ গোপাল, ২৩ রাঘব, ২৪ রুদ্র, ২৫ রামজীবন, ২৬ রঘুরাম, ২৭ কৃষ্ণচন্দ্র।

১০৭৭ খৃঃ অব্দে বঙ্গেশ্বর আদিশূর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ কামনায় কান্যকুব্জ হইতে সদাচারসম্পন্ন পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, ছান্দড় এবং বেদগর্ভ এই ভট্টনারায়ণের বংশে দ্বাদশ পুরুষ পরে বিশ্বনাথ নামক একজন জন্ম গ্রহণ করেন। ইনিই কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রথম প্রবর্ত্তক। ১৪২৬ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালার নবাব মহম্মদসার মৃত্যু হইলে, নবাবের সন্তানাদি না থাকায় ভয়ানক অরাজক উপস্থিত হয়। সেই সময় বিশ্বনাথ দিল্লী যাইয়া সৈয়দ বংশীয় সম্রাট মোবারিকের নিকট হইতে সর্ব্ব প্রথমে নদীয়া রাজ্য প্রাপ্ত হন। বিশ্বনাথের পাঁচপুরুষ পরে কাশীনাথ নামক রাজা যিনি ভবানন্দ মজুমদারের পিতামহ ছিলেন, তিনি আকবর বাদসাহের হস্তী বধকরা অপরাধে নিহত হন এবং তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। কাশীনাথের স্ত্রী তৎকালে গর্ভবতী ছিলেন। তিনি নিরুপায় হইয়া আন্দুলিয়া নিবাসী বাগওয়ান পরগণার জমীদার শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এক পুত্র প্রসব করেন। সমাদ্দার মহাশয় অপুত্রক ছিলেন, তিনি অপত্যনির্ব্বিশেষে ইহাঁদিগকে লালন পালন করেন। নবজাত কুমারের যথাসময়ে অন্নপ্রাশন দিয়া তিনি পুত্রটীর নাম রাখিলেন রামচন্দ্র। সমাদ্দার মহাশয় পুত্রটিকে এত ভালবাসিতেন যে তিনি মৃত্যুকালে আপনার সমুদয় সম্পত্তি রামচন্দ্রকে দিয়া যান। রামচন্দ্র, সমাদ্দারের বাটীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া এবং ভবিষ্যতে

তাঁহার উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে সকলে রামচন্দ্র সমাদ্দার বলিয়া ডাকিত। তিনি অতি পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান ছিলেন।

সমাদ্দার প্রদত্ত বাগোয়ান পরগণার ও পাটকা বাড়ীর বিষয়ের ভোগ দখলীকার থাকিয়া রামচন্দ্র ১৬০০ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার ৪ পুত্র—১ম দুর্গাদাস, ২য় জগদীশ, ৩য় হরিবল্লভ, চতুর্থ সুবুদ্ধি। রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্গাদাসই ভবানন্দ মজুমদার নামে বিখ্যাত ছিলেন। দুর্গাদাস বাল্যকাল হইতেই প্রতিভাশালী, মনস্বী ও শান্তস্বভাব ছিলেন। ১৫ বৎসর বয়সের সময় তিনি একজন মুসলমান রাজকর্ম্মচারীর অনুরোধে প্রথমে হুগলীতে কানুনগোর পদে প্রতিষ্ঠিত হন; পরে তিনি ঢাকার নবাব এস্মাইল খাঁর মন্ত্রী হন। নবাব বাহাদুর দুর্গাদাসের গুণে মুগ্ধ ও সন্তুষ্ট হইয়া দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে "মজুমদার ভবানন্দ" এই উপাধি প্রদান করেন। তদবধি দুর্গাদাস ভবানন্দ রায় নামে পরিচিত।

এই সময়ে যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য অতিশয় প্রতাপান্বিত হইয়া রাজকর বন্ধ করিয়া স্বাধীন নৃপতি হন। ইহাতে দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর বিদ্রোহী প্রতাপকে ধৃত করিবার জন্য রাজা মানসিংহকে বাঙ্গালার সুবাদার করিয়া প্রেরণ করেন। রাজা মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের উদ্দেশে নবতি লক্ষ সৈন্য লইয়া যাত্রা করিলেন, তিনি প্রথমে ঢাকায় উপস্থিত হন এবং সেখানে ভবানন্দকে বিচক্ষণ ব্যক্তি দেখিয়া নবাবের নিকট হইতে ভবানন্দকে প্রার্থনা করিয়া লইলেন। নবাব অনিচ্ছা সত্ত্বে মানসিংহের প্রার্থনা পূরণ করিলেন। ভবানন্দকে পাইয়া রাজা মানসিংহ মহানন্দে বর্দ্ধমান প্রভৃতি নানাস্থান অতিক্রম করিয়া, শেষে ভবানন্দের বিশেষ আগ্রহে ও যত্নে অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহার বাটীতে উপনীত হইলেন। মানসিংহ ভবানন্দের শিষ্টাচারে ও উপঢৌকনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার যাহাতে উন্নতি হয় তদ্বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিলেন। তৎপরে তাঁহাকে লইয়া যশোহর যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে, সপ্তদিবস ব্যাপী

ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হওয়াতে মানসিংহের সৈন্য মধ্যে ভয়ানক বিশৃঙ্খল ও খাদ্যাভাব ঘটিল। তখন ভবানন্দ রসদ সংগ্রহ করিয়া সৈন্যগণের প্রাণরক্ষা করিলেন। ইহাঁর সাহায্য না পাইলে মানসিংহের কার্য্যোদ্ধার অসম্ভব হইত। মানসিংহ যশোহরে উপস্থিত হইয়া ভবানন্দের সাহায্যে দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ করিলেন। মানসিংহ বন্দী প্রতাপকে লইয়া দিল্লী প্রতিগমন কালে ভবানন্দকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। পিঞ্জরাবদ্ধ প্রতাপাদিত্য অনাহারে পথিমধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন। মানসিংহ তাঁহার শবদেহ ঘৃতে ভর্জ্জিত করিয়া দিল্লীশ্বরকে উপহার প্রদান করিয়া বলিলেন,—"জাঁহাপনা এই সদাশয় ভবানন্দের সাহায্যে দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপকে জয় করিতে সক্ষম হইয়াছি। ইনি আপনার ঢাকার নবাবের মন্ত্রী"। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর মানসিংহের মুখে ভবানন্দের পরিচয় পাইয়া এবং সৈন্যগণের রসদ সংগ্রহের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। পরে তাঁহার পিতামহ কাশীনাথের দুর্গতির বিবরণ পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহার সেই সমস্ত বিষয় ও নবদ্বীপ প্রভৃতি অন্য ১৪টি পরগণার জমীদারি তাঁহাকে প্রদান করিলেন, এবং রাজা উপাধি দিয়া তাঁহার সম্মান বর্দ্ধিত করিলেন।

এইরূপে ভবানীর বরপুত্র ভবানন্দ ১৬০৬ খৃঃ অব্দে বাদসাহের নিকট হইতে বিপুল জমীদারি ও রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপ প্রবাদ যে জগৎ জননী মা লক্ষ্মী-দেবী এই সময় একটি ঝাঁপি লইয়া ভবানন্দের বাটীতে প্রবেশ করেন। মা লক্ষ্মীর কৃপা দৃষ্টিতে ভবানন্দ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া মাটিয়ারি নামক গ্রামে অপূর্ব্ব প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া পরম সুখে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। ১৬১৩ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর ভবানন্দের চরিত্রে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আরও কয়েকটি পরগণা প্রদান করিয়া-

ছিলেন। ভবানন্দের তিন পুত্র—শ্রীকৃষ্ণ, গোপাল ও গোবিন্দ। তিনি পরম সুখে রাজ্যভোগ করিয়া শেষে সুযোগ্য পুত্র গোপালকে রাজ্য-ভার দিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। কবিবর ভারতচন্দ্র ভবানন্দকে অমর করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার অন্নদামঙ্গলে লিখিয়াছেন যে দেবী ভবানীর কৃপা দৃষ্টিতেই ইঁহার শ্রীবৃদ্ধি। ভবানন্দই সর্ব্বপ্রথমে এই দেশে অন্নপূর্ণা পূজা প্রচার করেন। তিনি শাপভ্রষ্ট হইয়া অন্নদার ব্রতদাস রূপে ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভবানন্দ যেমন নদীয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, তেমনি তাঁহার পৌত্র অর্থাৎ গোপালের পুত্র রাঘবই বর্ত্তমান কৃষ্ণনগরে রাজধানীর পত্তন করেন। তদবধি কৃষ্ণনগরেই নদীয়ার রাজগণের বাসস্থান। এই কৃষ্ণনগরেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের উদয়। রাঘবের পুত্র রুদ্র, তাঁহার পুত্র রামজীবন, তাঁহার পুত্র রঘুরাম, রঘুরামের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র।

জন্মবিবরণ।

কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা রাজা রঘুরাম, পরম ধার্ম্মিক, দানশীল ও পুণ্যবান রাজা ছিলেন। কিন্তু তিনি অধিক বয়স পর্য্যন্ত অপুত্রক থাকায় শেষে ঈশ্বরারাধনা ও যাগযজ্ঞ করিয়া বৃদ্ধবয়সে এই পুত্ররত্ন লাভ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করাতে তিনি মুক্তহস্ত হইয়া অপরিসীম দান করিয়াছিলেন। সকলেই কায়মনোবাক্যে ঈশ্বর সমীপে নবকুমারের দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করেন।

কুমার পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিলে, পিতা রঘুরাম পুত্রের শিক্ষার নিমিত্ত পণ্ডিত নিযুক্ত করিলেন। বাল্যকাল হইতেই কৃষ্ণচন্দ্র মেধাবী ও শ্রুতিধর ছিলেন, সুতরাং তিনি অল্প দিন মধ্যে অসাধারণ বুদ্ধি ও মেধার প্রভাবে সংস্কৃত ও পারসীক ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি শস্ত্রবিদ্যাও শিক্ষা করিতে লাগিলেন। শুনিতে পাওয়া

যায় মৃগয়া কালে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্যাঘ্রাদির ভ্রূর মধ্যস্থলে শর-বিদ্ধ করিতে পারিতেন। তজ্জন্য লোকে পূর্ব্বকালের ভীষ্ম দ্রোণাদির সহিত তাঁহার তুলনা করিত। তিনি অশ্বচালনায়ও বিলক্ষণ পটু ছিলেন। রাজা রঘুরাম পুত্রকে প্রাপ্তবয়স্ক ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন দেখিয়া মহাসমারোহে তাঁহার বিবাহ দিলেন। কিছুকাল পরে তিনি পুত্রহস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বিষয়বিরত হইয়া ঈশ্বর উপাসনা করিতে করিতে ১৭২৮ খৃঃ অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। কেহ কেহ বলেন যে রাজা রঘুরাম পুত্রকে অল্পবয়স্ক দেখিয়া, স্বীয় ভ্রাতা রামগোপালকে রাজ্যভার দিয়া যান; কিন্তু বালক কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় প্রতিভাবলে এবং বুদ্ধি কৌশলে পিতৃ সিংহাসন অধিকার করেন।

রাজ্যশাসন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অষ্টাদশ বৎসর মাত্র বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া আত্মসুখে মোহিত না হইয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। তিনি কখন ধনগর্ব্বিত বা ক্ষমতাদীপ্ত হইয়া মধ্যাহ্ন তপনের ন্যায় রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করেন নাই। তিনি কোমলপ্রাণ বালকের ন্যায় মাধুর্য্য স্বভাবসম্পন্ন ছিলেন। শিষ্টাচার তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল। তিনি সকলের প্রতি সমান সৌজন্য প্রকাশ করিতেন। প্রজাগণ তাঁহার ন্যায় বিচারে ও বিবিধ গুণে মুগ্ধ হইয়া মনের সুখে বাস করিতেন। অধিক কি তাঁহারা আপনাদিগকে রাম রাজত্বের প্রজা বলিয়া আত্ম-শ্লাঘা করিতেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যেরূপ বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও কার্য্যদক্ষ, তেমনি দয়াশীল, ন্যায়বান এবং স্বধর্ম্মানুরক্ত ছিলেন। এজন্য তাঁহার রাজসভায় সর্ব্বদা প্রধান প্রধান পণ্ডিতের সমাগম হইত। রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় যেমন নবরত্ন ছিলেন, তেমনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায়

দেশবিখ্যাত মহা মহা পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা রাজসভা উজ্জ্বল করিয়া থাকিতেন। গুপ্তিপাড়ার প্রসিদ্ধ কবি রামেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, ত্রিবেণীর অদ্ভুত শ্রুতিধর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, নবদ্বীপের নৈয়ায়িক হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, ষড়দর্শনবেত্তা শিবরাম বাচস্পতি, সাধকচূড়ামণি কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, বিখ্যাত কবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র, জ্যোতিষী অনুকুল বাচস্পতি, পণ্ডিত রামগোপাল সার্ব্বভৌম, প্রাণনাথ ন্যায়রত্ন, মধু-সূদন ন্যায়ালঙ্কার, শরণ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সভা আলোকিত করিয়া থাকিতেন। এতদ্ভিন্ন মহারাজের মনস্তুষ্টির জন্য উপস্থিত বক্তা মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়, হাস্যার্ণব এবং স্বনাম ধন্য বিখ্যাত গোপাল ভাঁড় প্রভৃতি নিয়ত তাঁহার সভায় থাকিয়া হাস্যরসে সকলকে আপ্লুত করিতেন। তাঁহার সভা যেন নানা জাতি সুগন্ধ সুন্দর-কুসুম শোভিত উদ্যানের ন্যায় বিবিধ গুণসম্পন্ন বুধগণে শোভমান থাকিত। এই সময়ে একদিকে যেমন পণ্ডিতগণ জ্ঞান-প্রভা দ্বারা দেশকে সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সুখ্যাতি দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তেমনি অন্যদিকে তাঁহার প্রজাবৃন্দেরও সভ্যতা, শিষ্টাচার, শিল্প-কুশলতা, সুরসিকতা প্রভৃতির খ্যাতি সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল।

কৃষ্ণচন্দ্র তরুণ বয়সেই যেমন উদ্যোগী, সাহসী ও কর্ম্মদক্ষ হইয়াছিলেন, তেমনি বিষয় সংক্রান্ত নানাবিধ ঘোরতর বিপদ তাঁহাকে উদ্বেজিত করিয়াছিল। তাঁহার পিতামহ রাজা রামজীবন এবং পিতামহের অগ্রজ রাজা রামচন্দ্র এবং বৈমাত্রেয় রাজা রামকৃষ্ণ এই তিন জন নির্দ্ধারিত রাজস্ব না দেওয়াতে কুড়ি লক্ষ টাকা দেনা হয়। তন্মধ্যে তদীয় পিতামহ ও পিতা উভয়ে দশ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেন। সুতরাং তাঁহার পিতা যখন স্বর্গারোহণ করেন, তখন তাঁহার পিতার দশলক্ষ টাকা রাজস্ব বাকি ছিল, এবং কৃষ্ণচন্দ্র নূতন রাজা হইলেন বলিয়া, নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ ১২ লক্ষ টাকা নজরানা চান। মোট এই ২২ লক্ষ টাকা

দিতে না পারাতে নবাব তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। তাঁহার দেওয়ান রঘুনন্দনের বুদ্ধিকৌশলে কতক টাকা দেওয়া হয় এবং কতক টাকা ছাড় পান।

এই বিশৃঙ্খলা কেবল তাঁহার অপরিসীম দানের পরিণাম বলিতে হইবে। ক্রমাগত দান করায় এবং নিয়মিত রাজস্ব আদায় না হওয়ায় তাঁহাকে এই বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। কারাগারে যাইয়াও তাঁহার দানের অভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। কথিত আছে কোন এক বিপন্ন ব্রাহ্মণ ঋণের দায়ে কারাগারে যাইয়া মহারাজের শরণাপন্ন হন। তিনি ব্রাহ্মণের সকল কথা শুনিয়া সজলনয়নে বলিলেন, "মহাশয়! উপস্থিত আমি আপনার জন্য কি উপকার করিতে পারি! এখন আমি কারাগারে, অর্থ সাহায্য আমা দ্বারা অসম্ভব, তবে আমি আপনাকে কিছু ভূমি দান করিতেছি, যদ্দ্বারা আপনার দুঃখের লাঘব হইতে পারে। এই বলিয়া তিনি নখদ্বারা নিজ অঙ্গ হইতে শোণিত বাহির করিয়া ভূর্জ্জ পত্রে লিখিয়া ১০০ বিঘা ভূমি দান করিয়া ছিলেন। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ মহারাজের এই অপরিসীম দানের কথা শুনিয়া এবং তাঁহার হৃদয় নিহিত উচ্চভাব ও উদার স্বভাব দেখিয়া, শীঘ্র তাঁহাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দেন।

পুরাকালে নৃপতিগণ যেমন অমিত অর্থব্যয় করিয়া বিবিধ যজ্ঞ করিতেন তেমনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পাত্র মিত্র ও পণ্ডিত গণের সহিত পরামর্শ করিয়া এক বৃহৎ যজ্ঞ করিবার অনুষ্ঠান করিলেন। সকলেই তাঁহাকে কহিলেন "মহারাজ! আপনি অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী যজ্ঞ করুন।" কৃষ্ণচন্দ্র পণ্ডিতগণের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া যজ্ঞ করিবার সামগ্রী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তিনি অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, দ্রাবিড়, কাশী, কাঞ্চিপুর, কাশ্মীর, প্রভৃতি নানা স্থানের পণ্ডিত মণ্ডলীকে মহা আদরের সহিত নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া প্রথমে অগ্নিহোত্র পরে

শ্রীশ্রীদুর্গা
শরণং

শ্রীবনরামবাচস্পতিসু চরিতেষু
নমস্কার: প্রয়োজনঞ্চ বিশেষঃ
শ্মানতরফপরগণায় মাপজোখ হৈতে তোমার
ভোগপ্রমাণ বৃত্তি সামিলপতিত ভূমি ১০৷ দশবিঘা
মৌজে বহুনা — মৌজে বাকড়া বিঃ [illegible]
৮/ আটবিঘা — ২৷ দুইবিঘা পাঁচকাঠা —

অতএব তোমার বৃত্তি বাহিস মধ্যে বাহির হইতেছে —
ভোগপ্রমাণ বৃত্তি বহাল রাখিলাম ভূমি নিজ জোতে
ভোগ করহ ইতি সন ১১৬১ এগারশত একষট্টি
[illegible] তারিখ [illegible]

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের হস্তাক্ষর (সহি) [৯ পৃঃ]

Queen Press.

বাজপেয় এই উভয়বিধ যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিলেন। এই যজ্ঞ ব্যাপারে মহারাজ বিংশতি লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করেন। এইরূপ যজ্ঞ বহুকাল কোন নৃপতি করেন নাই। পণ্ডিতগণ মিলিত হইয়া তাঁহাকে "অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র" এই উপাধি প্রদান করিলেন।

তিনি যেমন উচ্চমনা নৃপতি ছিলেন তেমনি মহৎ মহৎ কার্য্য দ্বারা দেশের প্রভূত উপকার করিয়া গিয়াছেন। স্থানে স্থানে পুষ্করিণী খনন, বৃক্ষরোপণ, রাজপথ, ঠাকুরবাটী ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, অতিথিশালা বৃত্তিদান, ব্রাহ্মণগণকে ভূমিদান প্রভৃতি রাজোচিত বহুবিধ পুণ্যকর্ম্ম করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার দানের এমনি প্রবাদ ছিল, যে ব্রাহ্মণ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর বা বৃত্তিভোগ না করিয়াছেন তিনি ব্রাহ্মণই নন।

তিনি দানে যেমন মুক্তহস্ত তেমনি বুদ্ধিমত্তার বিষয়েও তাঁহার অনেক আখ্যায়িকা শ্রবণ করা যায়। একদিন তিনি কোন সভাসদকে বলিলেন "দেখুন, কোথাও কোন নূতন সামগ্রী দেখিলে আমার জন্য আনিবেন।" সেই ব্যক্তি রাজার উপযুক্ত কোন নূতন সামগ্রী না পাইয়া বিষণ্ণ বদনে একজন চিত্রকরের বাটীতে প্রবেশ করিলেন। চিত্রকর তাঁহাকে ম্লানমুখী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়! আজ আপনাকে এত বিমর্ষ দেখিতেছি কেন?" সভাসদ বিষন্নতার কারণ নির্দ্দেশ করিলে, চিত্রকর একখণ্ড বস্ত্রে যথেচ্ছাক্রমে একটী কালির দাগ দিয়া কহিল "এই নূতন দ্রব্য লইয়া গিয়া মহারাজাকে দিবেন।" সভাসদ তাঁহাকে বাতুল মনে করিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কিন্তু চিত্রকর তাঁহাকে অনেক অনুরোধ করাতে তিনি সেই নূতন দ্রব্য লইয়া সঙ্কুচিত মনে বিমর্ষ ভাবে মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাজা বস্ত্রখণ্ড লইয়া বিস্মিত নেত্রে পুনঃ পুনঃ দেখিতে লাগিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি চিত্রকরকে ডাকাইয়া সর্ব্ব সমক্ষে চিত্রকরের গুণ

কীর্ত্তন করিয়া তাহাকে ৫০০ টাকা পারিতোষিক প্রদান করিলেন। পরে সকলকে তিনি দেখাইতে লাগিলেন যে দেখ চিত্রকর বস্ত্রোপরি যথেচ্ছা দাগ দিয়াছে, কিন্তু রেখার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দাগটি উর্দ্ধে বা নিম্নে দুইটি সূতা অতিক্রম করে নাই। সভাসদ মনে করিয়াছিলেন না জানি রাজার নিকট কিরূপ লাঞ্ছিত হইব, কিন্তু তিনি তাঁহার নিকট হইতে প্রভূত সম্মান লাভ করিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। সভাস্থ সকলেই রাজার বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও গুণের বিষয় দেখিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

এইরূপ আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। কোন সুদক্ষ শিল্পী, ঝটিকা কালীন একখানি চিত্র অঙ্কিত করিয়া মহারাজকে উপঢৌকন প্রদান করে। তাহাতে তিনি চিত্রকরের নিন্দা করিয়া তাহার পারিতোষিক ১৲ টাকা মাত্র এবং পাথেয় ১০০৲ টাকা দিয়া বিদায় করেন। চিত্রকর তাহার দোষ বুঝিতে পারিয়া রাজার বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে প্রস্থান করিল। সভাসদ্‌গণ রাজার অসঙ্গত বিচার দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি উড্ডীয়মান বংশপত্র নিম্নাভিমুখী করিয়া চিত্র অঙ্কিত করে, তাহার ১৲ টাকাই যথেষ্ট পারিতোষিক। তবে সে ব্যক্তি চিত্রখানি অঙ্কিত করিতে অধিক পরিশ্রম করিয়াছে বলিয়া তাহাকে পাথেয় কিছু দেওয়া গেল। এইরূপ তাঁহার বুদ্ধি বিষয়ক অনেক আখ্যায়িকা শুনিতে পাওয়া যায়।

গোপাল ভাঁড়।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনের বিশেষ গুণ এই যে তিনি নানা বিপদে পড়িলেও কখন চিন্তাযুক্ত বা বিমর্ষ হইতেন না। চিন্তা ও উৎকণ্ঠা সত্বেও তিনি সর্ব্বদা শাস্ত্রালোচনা ও আমোদ আহ্লাদে কাল যাপন করিতেন। তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা আনন্দ প্রদান করিবার জন্য গোপাল

নামক জনৈক "ভাঁড়" রূপে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বেশ সুরসিক ও প্রত্যুৎপন্নমতি ছিলেন এবং হাস্যরস উদ্দীপনে তাঁহার সমাধিক শক্তি ছিল। তাঁহার নাম জড়িত যে সকল গল্প মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে তাহাতেই তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও রসিকতা বিলক্ষণ প্রতীত হয়। গোপালের উপস্থিত বুদ্ধির জন্য মহারাজ তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। গোপালও রসিকতার গুণে সর্ব্বদাই মহারাজের বয়স্য স্বরূপ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। তজ্জন্য উভয়ের সম্প্রীতি বিশেষ ভাবে ঘনিষ্ঠতা ছিল। গোপালকে সকলেই ভালবাসিতেন এবং রাজার প্রিয়পাত্র বলিয়া সকলেই সম্মানও করিতেন। গোপালের রসালাপের চির প্রচলিত গল্প গুলিই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

রাজধানী পরিবর্ত্তন।

যৎকালে কৃষ্ণচন্দ্রের জমীদারি মধ্যে মহারাষ্ট্রীয়গণের উপদ্রব সংঘটিত হয়, তৎকালে কৃষ্ণচন্দ্র অপেক্ষাকৃত কোন নিরাপদ স্থানে বাস করিবার মানস করেন। একদিবস তাঁহার কর্ণগোচর হইল যে নসরৎ খাঁ নামক একজন দস্যু তাঁহার রাজ্যমধ্যে ভয়ঙ্কর উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে। কৃষ্ণনগরের ছয় ক্রোশ দূরে ইচ্ছামতী নদীর নিকটস্থ জঙ্গলময় স্থানে উক্ত দস্যু বাস করিত। রাজাও এই স্থানে মৃগয়া করিতে যাইবার মনস্থ করিয়াছিলেন। সুতরাং নসরৎ খাঁকে উচ্ছেদ ও মৃগয়া করিবার বাসনা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হওয়ায়, তিনি পাত্র মিত্র সমভিব্যাহারে উপযুক্ত সাজ সজ্জা করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। নসরৎ খাঁ তাঁহার আগমন বার্ত্তা পূর্ব্বেই পরিজ্ঞাত হইয়া তথা হইতে পলায়ন করে। সে রাত্রে সকলকেই সেই জঙ্গলময় স্থানে নিশা অতিবাহিত করিতে হয়। পরদিবস প্রাতে নদী তীরবর্ত্তী শিবিরের সম্মুখে বসিয়া মহারাজ মুখ প্রক্ষালন করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ একটি বৃহৎ রোহিত মৎস্য

উল্লম্ফনে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তদ্দৃষ্টে আনুলীয়া নিবাসী কৃপারাম রায় নামক জনৈক সভাসদ বলিলেন—"দেখুন এস্থান অতি উত্তম, যেহেতু রাজভোগ সামগ্রী আপনা হইতে আসিয়া আপন উপঢৌকন স্বরূপ অর্পিত হইল। কি আশ্চর্য্য! আরও দেখুন এস্থানে চতুর্দ্দিকে নানা-জাতীয় পক্ষিগণের সুমধুর কলতানে কর্ণকুহর শীতল হইতেছে। সুস্নিগ্ধ পুষ্পসৌরভে চারিদিক আমোদিত। আপনি সুরম্য ও নির্জ্জন স্থান অনুসন্ধান করিতেছিলেন, আমার বিবেচনায় এস্থান অতি উত্তম, এখানে বাস করিলে আপনি সুখী হইবেন।" রাজা দেখিলেন সত্য, লতাপাদপ কুসুমশোভিত, অতিরম্য কানন, ইহার চতুর্দ্দিকে প্রসন্নসলিলা প্রবহমানা নদী। স্থানে স্থানে নানা-জাতীয় পক্ষিগণের অব্যক্ত কলতানে নীরস হৃদয় কন্দরে যেন শান্তিসুধা ঢালিয়া দিতেছে। তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া পাত্রকে ঐ স্থানেই পুরী নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা দিলেন।

রাজার আদেশে পাত্র ঐ স্থান বনশূন্য করিয়া নগর পত্তন করিলেন। চতুর্দ্দিকে যে জলাশয় ছিল, তাহার পূর্ব্বদিক হইতে দৈর্ঘ্য সহস্র হস্ত পরিমিত এক প্রশস্ত পরিখা খনন করিয়া ইচ্ছামতী নদীর সঙ্গে এবং পশ্চিমদিক হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দীর্ঘ আর একটি পরিখা খনন করিয়া হাঁস-খালির উত্তরে অঞ্জনা নদীর মোহানার সহিত মিলাইয়া দিলেন। এই উভয় দিকস্থ নদীর সহিত মিলিত পরিখা দ্বারা পুরীকে কঙ্কণাকারে বেষ্টিত করিয়াছিল বলিয়া, রাজা উহার নাম কঙ্কণা এবং তথায় বিস্তর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া ঐ পুরীর নাম শিবনিবাস রাখেন। পরিখা বেষ্টিত তোরণাদি সমন্বিত এই অপূর্ব্ব পুরীতে আসিয়া মহারাজ যাবজ্জীবন সপরিবারে নিরাপদে বাস করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ে যে শিব-নিবাস ষ্টেশন আছে তাহা এই স্থান। আজকাল শিবনিবাসের আর সে শ্রী নাই, কেবল কতগুলি ভগ্নপ্রায় শিবমন্দির মাত্র দৃষ্ট হয়। শিবনিবাসের

সন্নিকট বর্ত্তমান কৃষ্ণপুর, কৃষ্ণগঞ্জ, চূর্ণীনদীর তীরবর্ত্তী হরধাম ও আনন্দ-ধাম, নবদ্বীপের গঙ্গাবাস প্রভৃতি স্থান সকলও তাঁহার স্থাপিত।

সিরাজুদ্দৌলা।

তিনি শিবনিবাসে মহা শান্তিতে অবস্থান করিলেও মুরশিদাবাদের নবাব সিরাজুদ্দৌলার উৎপাতে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে মহা অশান্তিতে কালযাপন করিতে হইত। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে এপ্রেলমাসে সুপ্রসিদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তর গমন করিলে, তাঁহার সপ্তদশ বর্ষীয় ইন্দ্রিয় সুখাসক্ত দুর্দ্দান্ত দৌহিত্র সিরাজুদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের মসনদে অধিষ্ঠিত হন। বর্গীর হাঙ্গামার পর হইতে দিল্লীশ্বর ক্ষমতাশূন্য নাম মাত্র সম্রাট্ ছিলেন, তজ্জন্য সিরাজ বাদশাহের নিকট হইতে সুবাদারী সনন্দ আনাইবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই এবং দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণ রহিত করিয়া স্বাধীন হন। ক্রমে ক্রমে সিরাজ এমন যথেচ্ছাচারী ও কুকর্ম্মান্বিত হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার অত্যাচারে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ভূম্যধিকারী, কি প্রজাবৃন্দ, কি কর্ম্মচারী সকলেই সশঙ্কিত হইলেন। কেহ সদুপদেশ কিম্বা সৎপরামর্শ দিলে তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না, বরং তাঁহার অত্যাচার আরও বর্দ্ধিত হইত।

ষড়যন্ত্র।

এইরূপে সিরাজ দুশ্চরিত্রতা ও নিষ্ঠুরতা নিবন্ধন শীঘ্রই লোকের অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার পদচ্যুত করিবার অবসর সকলেই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ক্রমে এক ষড়যন্ত্রের আয়োজন হইল। তথন কোষাধ্যক্ষ জগৎশেঠ উদ্যোগী হইয়া, তাঁহার বাটীতে মন্ত্রী রায় দুর্ল্লভ (রাজা মহেন্দ্র) রাজা রামনারায়ণ, রাজা কৃষ্ণদাস ও তাঁহার পিতা রাজা রাজবল্লভ, সেনাপতি মীরজাফর, মীরমদন, উমীচাঁদ, খোজা বাজীচ

প্রভৃতিকে লইয়া দুর্দ্দান্ত নবাবের উৎপীড়নের প্রতিবিধান করিবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। নানা তর্ক বিতর্কে কিছুই স্থিরতা হইল না, তখন সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ব্যতীত ইহার মীমাংসা হইতে পারেনা। কারণ তিনি সর্ব্ববিষয়ে অতি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। তখন সভাস্থ সকলে তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে আসিবার জন্য পত্র লিখিলেন।

দূত পত্র লইয়া শিবনিবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলে, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র উহা পাঠ করিয়া সভাসদগণের সহিত পরামর্শ করিয়া অবিলম্বে দেওয়ান কালী প্রসাদকে তথায় পাঠাইলেন। তিনি সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া শিবনিবাসে প্রত্যাগমন করিলে, কৃষ্ণচন্দ্র সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া স্বয়ং মুর্শিদাবাদে গমন করিলেন। তিনি তথায় উপনীত হইলে জগৎ শেঠের বাটীতে পুনরায় একটি সভা হইল। সভায় রাজা মহেন্দ্র প্রভৃতি পূর্ব্বসভ্যগণ সকলেই উপস্থিত ছিলেন। জগৎ শেঠ বলিলেন "মহারাজ! আপনি সিরাজের অত্যাচারের কথা সকলি অবগত আছেন, আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য সম্রাট সমীপে আবেদন করা হউক। নূতন কোন উপযুক্ত সদ্ব্যক্তি নবাব না হইলে আমাদের আর শ্রেয়ঃ নাই।" ইহাতে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন এ সমস্ত পরামর্শ ভাল নহে। কারণ ইহাতে অধর্ম্ম ও অখ্যাতি অর্জ্জন ভিন্ন আর কিছুই লভ্য নাই। যদি সম্রাট আবেদন অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে সিরাজের ক্রোধানলে আমাদের প্রাণদণ্ড নিশ্চয়। তখন জগৎ শেঠ রাজবল্লভ প্রভৃতি কহিলেন, যদি আপনি এ পরামর্শ হইতে ক্ষান্ত হন, তাহা হইলে দেশ রক্ষার আর উপায় নাই। প্রজাবৃন্দের জাতি, সম্পদ ও প্রাণ থাকা ভার। রাজা মহেন্দ্র বলিল এক্ষণে যবন কর্ত্তৃত্বাধীন হিন্দু জাতির নিরাপদে বাস করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যাহাতে আর যবনের অধীন না থাকিতে হয় ইহারই মন্ত্রণা করা কর্ত্তব্য। এই প্রস্তাবে

কেহ অনুমোদন কেহ বা প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুই স্থির সিদ্ধান্ত হইল না। তখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কহিলেন "যে সভায় মিরজাফর একজন প্রধান সভ্য ও জাতিতে যবন অথচ আপনারা যবনাধিকার নিরাকৃত করিতে চাহেন, সেস্থানে আমি আর কি কহিব?" ইহাতে সকলেই বলিয়া উঠিলেন "মিরজাফর অতি উদার প্রকৃতির লোক ইহাঁকে অবিশ্বাস করিবেন না।

তখন• কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন যদি আমার মতামত জানিতে চাহেন তাহা হইলে শ্রবণ করুন। "যবন আধিপত্যে আমাদিগের নিরাপদে বাস করা একপ্রকার অসম্ভব এবং হিন্দু রাজা হইবারও কোন সম্ভাবনা নাই, কারণ সকলেই শক্তিহীন। এ স্থলে যদি মীরজাফর সহায়তা করেন তাহা হইলে আমার জমীদারির * মধ্যে কলিকাতার যে সকল ইংরাজ বণিক বাস করেন, তাঁহারা মনে করিলে এ দেশ রক্ষা করিতে পারেন। আমি তাঁহাদের রীতি, নীতি, স্বভাব, চরিত্র, উত্তমরূপে অবগত আছি। তাঁহারা যেমন পরাক্রান্ত ও সাহসী, তেমনি বুদ্ধিমান ও বিশ্বস্ত। যদি ইংরাজ রাজা হন তাহা হইলে দেশের মঙ্গল, ইংরাজ নাম মাত্র রাজা থাকিবেন এবং মীরজাফরই নবাব হইবেন। এইরূপ হইলে, আমাদের সুখ শান্তিতে কালযাপন হইবে। যদি আপনাদের ইহাতে মত হয় তাহা হইলে আমি ইংরাজদের নিকট এবিষয় প্রস্তাব করি।"

* অধিকার রাজার চৌরাশী পরগণা।
গাড়ি জুড়ী আদি করি দপ্তরে গণনা॥
রাজ্যের উত্তর সীমা মুরশিদাবাদ।
পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথী খাদ॥
দক্ষিণের সীমা গঙ্গা সাগরের ধার।
পূর্ব্বসীমা ধুল্যাপুর বুড়ো গঙ্গা পার॥

এই সকল কথা শুনিয়া রাজা মহেন্দ্র, জগৎশেঠ প্রভৃতি সভাগণ বলিলেন "যদি আপনি ইংরাজ চরিত্র বিশেষরূপে অবগত থাকেন, তাহা হইলে আমাদের আর আপত্তি কি?" মীরজাফরও নবাবী পদ প্রাপ্ত হইবার আশায় কৃষ্ণচন্দ্রের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন সকলেই কৃষ্ণচন্দ্রের প্রস্তাব শিরোধার্য্য করিলেন। সভাভঙ্গ হইলে অভিবাদন প্রত্যভিবাদনান্তর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া শিবনিবাসে প্রত্যাগমন করিলেন।

ইংরাজগণের সহিত পরামর্শ।

অনন্তর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র পাত্র মিত্র সঙ্গে লইয়া কালীঘাটে আসিয়া জগজ্জননী মা কালিকা দেবীর অর্চ্চনা করিলেন। তৎপরে কলিকাতার বড় সাহেবের কুটীতে একজন বিশ্বস্ত দুত দ্বারা সংবাদ পাঠাইয়া পশ্চাৎ আপনি গমন করিলেন। তখন কুঠির অধ্যক্ষ ড্রেক সাহেব ছিলেন। তিনি মহারাজকে মহা সম্বর্দ্ধনা করিয়া সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিলেন। রাজা ও সাহেব দুইজনে বসিয়া পরস্পর কুশলাদি প্রশ্ন করিয়া নানা কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। তৎপরে সিরাজুদ্দৌলার অত্যাচারের কথা ও ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত করাইয়া বলিলেন "আপনারা এদেশ জয় করিয়া সকলকার জাতি, ধর্ম্ম ও জীবন রক্ষা করুন। জগৎশেঠ, রাজা মহেন্দ্র, রাজা রাজবল্লভ প্রভৃতি নবাবের প্রধান প্রধান পাত্র, মিত্রগণ এই বিষয়ের জন্য উদ্যোগী হইয়া আপনার নিকট আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমাদের সকলকার ইচ্ছা, ইংরাজ রাজা হইয়া এ হতভাগ্য দেশে শান্তি স্থাপনা করেন।"

ড্রেক সাহেব অতি বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ও দুরদর্শী ইংরাজ ছিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন "মহারাজ! আপনি আমাকে দুই তিন মাস সময় দিউন, আমি বিলাতে পত্র লিখি, সেখান হইতে

আদেশ আনাইয়া পশ্চাৎ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইব। আপনি রাজা-মহেন্দ্র প্রভৃতি পাত্র মিত্রগণকে আশ্বাস প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত থাকুন। শীঘ্রই ইহার প্রতিকার করিব।" তখন কৃষ্ণচন্দ্র আশ্বস্ত হইয়া শিবনিবাসে প্রত্যাগমন করিলেন।

এই সময়ে ঢাকার প্রতিনিধি ও শাসনকর্ত্তা রাজা রাজবল্লভ সিরাজের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া তাঁহার পুত্র কৃষ্ণদাসকে মূল্যবান্ সম্পত্তি সহ ঢাকা হইতে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। কৃষ্ণদাস জগন্নাথ দর্শনচ্ছলে কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজগণের শরণাপন্ন হইলেন। ইংরাজগণ ফরাসি-দিগের সহিত যুদ্ধ সম্ভাবনা দেখিয়া এই সময় কলিকাতার দুর্গ সংস্কার করিতেছিলেন। নবাব ঘটনাক্রমে শুনিলেন যে ইংরাজগণ পলাতক কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দিয়াছেন; এবং বিনা অনুমতিতে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছেন। তখন তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া ইংরাজদের পত্র লিখিলেন যে, এখনি দুর্গ ভগ্ন কর ও কৃষ্ণদাসকে বন্ধন করিয়া পাঠাইয়া দাও, নচেৎ তোমরা অশেষ শাস্তি পাইবে।

ইংরাজগণের সহিত সিরাজের যুদ্ধ।

এদিকে পূর্ণিয়ায় আলিবর্দ্দি খাঁর অপর দৌহিত্র শওকতজঙ্গ দিল্লী হইতে নবাবী সনন্দ আনাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। সিরাজ এই সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য পূর্ণিয়াভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। নবাব কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময়ে ইংরাজ অধ্যক্ষের পত্র পাইলেন যে, নূতন দুর্গ নির্ম্মিত হয় নাই, পুরাতন দুর্গের সংস্কার হইতেছে মাত্র। আর শরণাগত কৃষ্ণদাসকে কখনই প্রত্যর্পণ করিতে পারিব না। এই পত্র পাইয়া সিরাজ অগ্নিশর্ম্মা হইয়া পূর্ণিয়া যাত্রা বন্ধ করিয়া কলিকাতায় ইংরাজগণের বিপক্ষে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে ইংরাজদিগের কাশিমবাজারস্থ কুঠী লুণ্ঠন করিয়া তথাকার অধ্যক্ষ ওয়ারেণ হেষ্টিংস ও

অন্যান্য ইংরাজদিগকে কারারুদ্ধ করেন। তৎপরে সিরাজুদ্দৌলা ইংরাজদিগের উচ্ছেদ সাধনে দৃঢ়-সংকল্প হইয়া প্রায় পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য ও তদুপযুক্ত কামান লইয়া কলিকাতার উপনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইংরাজগণ যথাসাধ্য আত্মরক্ষার জন্য বাগবাজারের পুলের উপর দুইটী কামান ও কিছু সৈন্য রাখিলেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুন বাগবাজারের পুলের উপর প্রথম যুদ্ধ হয়।* এই যুদ্ধে ইংরাজগণ মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নবাবের সহিত যুদ্ধ করিয়া শেষে পরাস্ত হন। তখন নবাব সৈন্য কলিকাতায় প্রবেশ করিয়া নানা স্থান লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। শেষে নবাব ইংরাজ দুর্গের নিকট অগ্রসর হইয়া তুমুল যুদ্ধ করিলেন। তিন দিবস ঘোরতর যুদ্ধের পর শেষে দুর্গাধ্যক্ষ ড্রেক সাহেব ভীত হইয়া কতকগুলি ইংরাজ কর্ম্মচারী এবং যাবতীয় বালক বালিকা ও মহিলাদিগকে লইয়া জাহাজে চড়িয়া বজবজের দক্ষিণে ফলতায় পলায়ন করিলেন। হলওয়েল প্রভৃতি ১৭০ জন মাত্র ইংরাজ কলিকাতায় রহিলেন। ইহাঁরাও যুদ্ধ করিয়া শেষে হীনবল হইয়া পঞ্চম দিবসে আত্মসমর্পণ করিলেন। তখন ১৪৬ জন মাত্র অবশিষ্ট ছিল। নবাব ইহাদের কাহারও প্রাণহানি করেন নাই।

২১শে জুন নবাব দুর্গ অধিকার ও ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া দুর্গপ্রাঙ্গণে এক দরবার করিলেন। হলওয়েল সাহেব বন্দী দশায় আনীত হইলে, তিনি তাঁহার বন্ধন মোচন করিয়া দেন; এবং কৃষ্ণদাসকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলে, তিনি তাঁহাকে মার্জ্জনা করিয়া, একটি সম্মানসূচক পরিচ্ছদ প্রদান করিয়া, মিষ্ট কথায় সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ করেন।

* শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় কৃত ১৮১১ খ্রীঃ অব্দে লণ্ডন নগরে মুদ্রিত "কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র" নামক পুস্তক হইতে ইহা উদ্ধৃত। সুতরাং বাগবাজারে যুদ্ধ সম্বন্ধে ১০০ বৎসরের প্রাচীন পুস্তকের কথা কখনও অবিশ্বাস্য হইতে পারে না।

অন্ধকূপ হত্যা।

অতঃপর সিরাজ তাঁহার সেনাপতি মাণিকচাঁদের উপর ১৪৬ জন ইংরাজ বন্দীর রক্ষার ভার ন্যস্ত করিয়া, তিনি উপনগরস্থ শিবিরে প্রত্যাগমন করেন। বন্দীদিগের এমনি দুরদৃষ্ট যে, মাণিকচাঁদ তাঁহাদিগকে রক্ষা না করিয়া অষ্টাদশ ফিট দীর্ঘ ও চতুর্দ্দশ ফিট প্রস্থ দুইটী ক্ষুদ্র গবাক্ষ বিশিষ্ট একটী কারাগৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। জুন মাসের সেই প্রচণ্ড নিদাঘ নিশীথে বন্দীগণ পিপাসার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ১২৩ জন প্রাণ হারাইলেন। ভয়ঙ্করী রজনী প্রভাত হইলে ২৩টী বিবর্ণ বিশীর্ণ জীবিত দেহ মাত্র অবশিষ্ট ছিল। ইহাই ইতিহাস প্রসিদ্ধ অন্ধকূপ হত্যা। যাঁহারা ফলতায় পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে মুন্সী নবকৃষ্ণ গোপনে ছয় মাস কাল খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন।*

ইংরাজদিগের এই শোকাবহ দুর্দ্দশার কাহিনী মান্দ্রাজে পৌঁছিলে রণপোত সজ্জিত করিয়া কর্ণেল ক্লাইভ ও এডমিরাল ওয়াটসন সাহেব প্রায় ২ ০০ সৈন্য সহ কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইয়া নগর অধিকার করিলেন। সিরাজুদ্দৌলা এই সংবাদ পাইয়া পুনর্ব্বার কলিকাতায় আসিয়া হালসি বাগানে উমিচাঁদের উদ্যানে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। সন্ধি প্রার্থনায় মুন্সী নবকৃষ্ণ ক্লাইভের পক্ষ হইয়া নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, কিন্তু কোনও ফলোদয় হইল না। পুনরায় যুদ্ধ হইল, কিন্তু নবাব এবার রণপণ্ডিত ক্লাইভের নিকট পরাজিত হইয়া ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি সন্ধি করিলেন।

পলাশীর যুদ্ধ।

ক্লাইভের এই অসাধারণ বীরত্ব দর্শনে এবং সিরাজের ঔদ্ধত্য ও অত্যাচারে মর্ম্মপীড়িত হইয়া তাঁহার কোষাধ্যক্ষ জগৎশেট, সেনাপতি

* Rev. Long's Selections, No. 235, P. 93 footnote.

মীরজাফর, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি ষড়যন্ত্রকারীগণ পুনর্ব্বার মিলিত হইয়া ক্লাইভকে মুর্শিদাবাদে আগমনের জন্য আহ্বান করিলেন। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে এপ্রেল মাসে তাঁহাকে অতি গোপনে এই সংবাদ প্রদান করা হয়। ছয় মাস ব্যাপিয়া পরস্পর পত্র লেখালিখি চলিয়াছিল। শেষে ক্লাইভ পরমানন্দ সহকারে এই ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়া এক প্রতিজ্ঞাপত্র প্রস্তুত করিলেন। অতঃপর ক্লাইভ ২৩শে জুন প্রায় ৩০০০ হাজার সৈন্য লইয়া কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া নবাব প্রায় ৫০,০০০ সেনা লইয়া মুর্শিদাবাদের ১২ ক্রোশ দক্ষিণে পলাশীর মাঠে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল, শেষে মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক যুদ্ধ বন্ধ করিলেন। এই যুদ্ধে মীরমদন হত হইলে, জেনারেল মোহনলাল একাকী যুদ্ধ করিয়া রণক্ষেত্র কম্পিত করিয়াছিলেন; কিন্তু কি করিবেন মিরজাফরের বিশ্বাস-ঘাতকতায় অনিচ্ছাপূর্ব্বক অস্ত্র সম্বরণ করিতে হইয়াছিল। সুতরাং বিনা ক্লেশে এই যুদ্ধে ইংরাজ জয়ী হইলেন। দুর্ভাগা সিরাজুদ্দৌলা ভগবান গোলায় পলায়ন করিয়াও বাঁচিতে পারিলেন না, ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে আনয়ন পূর্ব্বক দুর্ব্বৃত্ত মীরণের আদেশে হত হন। তাঁহার ধনাগার লুণ্ঠিত হইল। রামচাঁদ, নবকৃষ্ণ, আমীনবেগ, ক্লাইভ, মীরজাফর প্রভৃতি অনেকে এই ধনরাশি বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। পলাশী যুদ্ধজেতা ইংরাজ-দিগের যে বাঙ্গালা অধিকার, ইহা কেবল একমাত্র মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বিবেচনার ফল বলিতে হইবে। ইংরাজদিগকে সাহসী, সত্যবাদী ও দয়ালু দেখিয়াই তিনি এ রাজ্য তাঁহাদের হস্তে তুলিয়া দিয়াছিলেন। তাই আজ বৃটিশ রাজলক্ষ্মীর উজ্জ্বল মুকুট-প্রভা সমস্ত শ্রীহীন ভারতকে আলোকিত করিয়া প্রতিভাময়ী করিতেছে; এবং তাহারই ফলে আমরা হিমাদ্রি-শিখর হইতে কন্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত স্বাধীন ভাবে মনের সুখে বাস করিতেছি।

পলাশী যুদ্ধের পর ক্লাইভ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে কলিকাতায় আহ্বান করিলেন। তিনি তথায় উপনীত হইলে ক্লাইভ তাঁহাকে আদর অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, "আমি আপনার মন্ত্রণায় এই যুদ্ধে জয়ী হইলাম। আমি আপনার আর কি প্রত্যুপকার করিতে পারিব? আপনি যে ১১লক্ষ টাকা রাজকর দিতেন, তাহা ন্যূন করিয়া ৬ লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত করিলাম।" নানা কথাবার্ত্তার পর তাঁহাকে বিদায় দিলেন। তৎপরে ক্লাইভ ৫টি কামান তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে বিদ্যমান আছে। অনন্তর রাজার সুখ্যাতি বিলাত পর্য্যন্ত লিখিয়া পাঠাইলেন; এবং দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে "মহারাজেন্দ্র বাহাদুর" এই উপাধি আনাইয়া দেন। এই কার্য্যে মুন্সী নবকৃষ্ণ অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। ইঁহারই যত্নে এদেশে ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত হয় বলিয়া, ইংরাজেরা ইঁহাকে যথেষ্ট মান্য করিতেন। এবং ইনি যখন মুঙ্গেরে মীরকাসিম কর্ত্তৃক পুত্র সহ কারারুদ্ধ হন, তখন ইংরাজেরা আসিয়া কারামুক্ত করিয়া দেন।

মুঙ্গেরে কারাবাস।

মীরজাফরের জামাতা মীরকাসিম নবাবী পদ প্রাপ্ত হইলে পর, ইংরাজদিগের সহিত মনোমালিন্য ঘটাইয়া প্রায়ই যুদ্ধ করিতেন। তজ্জন্য তিনি মুঙ্গেরে রাজধানী স্থাপন করেন। এবং দেশের মধ্যে প্রথিতযশা যে সমস্ত সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ লোক ইংরাজদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে মুঙ্গেরের দুর্গে বন্দী ও হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তদনুসারে মীরকাসিম, কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রকে মুঙ্গেরের দুর্গে কিছুদিন বন্দী রাখিয়া শেষে হত্যা করিবার আদেশ দেন। হত্যার দিনে পিতা পুত্রে অন্যদিন অপেক্ষা বিশেষ সমারোহে ও ভক্তি গদ্‌গদ চিত্তে ইষ্টদেবতার পূজা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উভয় পার্শ্বে পুষ্প পাত্র, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য প্রভৃতি নানাবিধ উপচার বিন্যস্ত ছিল। প্রহরীরা

সেই সময়ে নবাবের নিষ্ঠুর আজ্ঞা পালনার্থ তাঁহাদিগকে লইতে আসিল। বহুদিবসাবধি বন্দী থাকায় তাঁহাদের শ্মশ্রু, কেশ ও নখ সমধিক বাড়িয়াছিল। তাঁহারা সর্ব্বাঙ্গে গঙ্গা-মৃত্তিকা লেপন এবং গলদেশে রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করিয়াছিলেন। প্রহরীরা তাঁহাদের এই তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি দেখিয়া কিছু বলিতে সাহসী হইল না। শেষে তাঁহারা করপুটে স্বীয় প্রভুর আদেশ নিবেদন করিলে, রাজা সজল নয়নে ও কাতর বচনে বলিলেন, "বাপু সকল, তোমরা ক্ষণেক অপেক্ষা কর, আমরা জন্মের মত পরমেশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া লই।" সুতরাং প্রহরীগণ তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষায় বাহিরে রহিল। নবাব মীরকাসিম বারম্বার ইংরাজদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পাটনায় পলায়ন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। যখন কৃষ্ণচন্দ্রকে পুত্র সহ হত্যা করিবার জন্য রক্ষীগণ বহির্দ্দেশে অপেক্ষা করিতেছিল, এমন সময় নবাবের পাটনায় পলায়ন করিবার সংবাদ প্রচারিত হওয়াতে, দুর্গমধ্যে একটা বিষম কোলাহল উত্থাপিত হইল, সেই সময়ে ইংরাজেরা আসিয়া ধ্যানমগ্ন পিতা পুত্রকে উদ্ধার করিলেন। মনের একাগ্রতা ও ভক্তির বলে পিতা পুত্র এইরূপে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

জীবনের ঘটনা ও কীর্ত্তি।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র দুই সংসার করেন। পিতা বর্ত্তমানে প্রথমা মহিষীর সহিত পরিণয় হয়, তৎপরে রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তিনি পুনর্ব্বার কনিষ্ঠা রাজ্ঞীকে বিবাহ করেন। জ্যেষ্ঠা রাণীর গর্ভে শিবচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র, হরচন্দ্র, মহেশচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন; এবং কনিষ্ঠা রাণীর গর্ভে শম্ভুচন্দ্রের জন্ম হয়। রাজনন্দনদিগের মধ্যে শিবচন্দ্র যেমন শান্তস্বভাব ও পিতৃভক্ত, শম্ভুচন্দ্র তেমনিই উদ্ধত ও পিতার অবাধ্য ছিলেন। যে সময়ে কৃষ্ণচন্দ্র ও শিবচন্দ্র মুঙ্গেরে কারারুদ্ধ ছিলেন, সেই সময়ে শম্ভুচন্দ্র পিতা ও ভ্রাতার মৃত্যু সম্বাদ ঘোষণা করিয়া, পৈতৃক

জমীদারী ও ধনাগার অধিকার করিয়া বিশেষ সমারোহে পিতৃ সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। কিন্তু যখন তাঁহাদের মুঙ্গের হইতে নিষ্কৃতি লাভ করার আগমন বার্ত্তা, চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল, তখন শম্ভুচন্দ্র অনুতপ্ত হইয়া স্বীয় দোষ খণ্ডনার্থ নানাবিধ আরোপিত বাক্য বিন্যাস পূর্ব্বক যৎপরো-নাস্তি অনুনয়ের সহিত জনক সন্নিধানে পত্র লিখিলেন। পিতা পুত্রের ব্যবহার বুঝিতে পারিয়া নিজরাজ্য গ্রহণ করিয়া ১৭৮০ খৃঃ অব্দে পুত্র শিবচন্দ্রকে আপনার রাজ্য সম্পত্তি দান পত্র করিয়া দিলেন।

তৎপরে তিনি ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে শিবচন্দ্রের নামে রাজ-সনন্দ প্রাপ্তির জন্য তৎকালিক গভর্ণর-ওয়ারেণ হেষ্টিংস সমীপে আবেদন করিলেন। শম্ভুচন্দ্র এরূপ মনে করিয়াছিলেন যে, পৈতৃক জমীদারীর অর্দ্ধাংশ তিনি পাইবেন, কিন্তু তিনি পিতার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া হেষ্টিংস সাহেবের দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি কৌশলে তাঁহাকে বশ করিয়া নিজ নামে রাজসনন্দ লইলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই বিষয় অবগত হইয়া মহা ক্ষুণ্ণ হইলেন। শেষে মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া কলিকাতা ও হুগলির বাজারে যত বহুমূল্য মুক্তা পাওয়া সম্ভব, তাহা সংগ্রহ করিয়া একছড়া মালা প্রস্তুত করাইলেন। পর দিবস প্রভাতে হেষ্টিংস সাহেব বায়ু সেবনার্থ বহির্গত হইলে, মহারাজা তাঁহার সুবিজ্ঞ দেওয়ান কালী প্রসাদকে সেই মালাছড়াটি দিয়া মণিকার বেশে লাট ভবনে পাঠাইলেন। হেষ্টিংস পত্নী সেই অপূর্ব্ব মালা দেখিয়া মোহিত হইয়া উহার মূল্য জিজ্ঞাসা করিলেন। ছদ্মবেশী মণিকার বলিলেন, মূল্যের কথা পরে বলিব, উপস্থিত আপনার কণ্ঠে এই মালা কিরূপ শোভা পায় দেখুন। এই কথা বলিবা মাত্র তিনি আনন্দের সহিত সেই মালা গলায় পরিলেন এবং দর্পণে উহার শোভা দেখিতে লাগিলেন। মণিকার সুযোগ পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, আহা কি সুন্দর মানাইয়াছে, যেন মা সরস্বতী "গলায় গজমতি মুক্তার হার," পরিয়াছেন। কি চমৎকার শোভা পাইতেছে! এমালা

আপনার কণ্ঠেরই উপযুক্ত, এমালা আর খুলিবেন না। তখন হেষ্টিংস মহিলা পুনরায় মূল্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, মণিকার কালীপ্রসাদ দীন ভাবে বলিলেন, ইহার মূল্য অনেক, তবে আপনাকে এ মালাছড়াটি ৪০,০০০ হাজার টাকায় দিতে পারি। লাটপত্নী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মালাছড়াটি প্রত্যর্পণ করিতে উদ্যত হইলে, কালীপ্রসাদ কৃতাঞ্জলি-পুটে নিবেদন করিলেন, এ মালা কণ্ঠ হইতে উন্মোচন করিবেন না, ইহা আপনাকে উপহার দিতে আনিয়াছি। এই বলিয়া তিনি অশ্রুপূর্ণ লোচনে আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়া সমস্ত বক্তব্য বিষয় আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "আপনার স্বামী স্বীয় মন্ত্রী গঙ্গা গোবিন্দ সিংহের আরোপিত বাক্যে প্রতারিত হইয়া, অগ্রপশ্চাৎ অনুসন্ধান না করিয়া এই অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। এক্ষণে আপনার অনুগ্রহ ব্যতীত মহারাজের আর অন্য উপায় নাই। হেষ্টিংস পত্নী ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন, মহারাজ প্রদত্ত উপহারের জন্য ধন্যবাদ দিতেছি; এবং তাঁহাকে এ বিষয়ের জন্য নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিবেন। কালীপ্রসাদ বিদায় গ্রহণ করিলে পর, হেষ্টিংস সাহেব গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, তিনি গঙ্গা গোবিন্দের প্রতারণার আমূল বৃত্তান্ত তাহাকে অবগত করাইয়া রাজার প্রার্থনার সিদ্ধির নিমিত্ত বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সাহেব অনেক তর্ক বিতর্কের পর পত্নীর নির্ব্বন্ধতা উল্লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া শিব-চন্দ্রের নামে সনন্দ লিখিয়া দিলেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই সনন্দ পাইয়া অনতিবিলম্বে নবাব ও লাট সাহেব দ্বারা শিবচন্দ্রকে "মহারাজাধিরাজ" এই উপাধি দেওয়াইলেন এবং মহাসমারোহে তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। এই ঘটনাসূত্রে রাজ পরিবার মধ্যে মহা বিবাদ উপস্থিত হইল; এবং মহারাজের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এবং পুত্র শম্ভুচন্দ্র পৃথক হইয়া রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরধামে গিয়া বাস করিলেন। এখনও হরধামে সেই রাজবংশের শাখা বিদ্যমান আছে।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র শাক্ত ছিলেন এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতিও তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। কিন্তু তিনি চৈতন্যদেবকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিতেন না, তজ্জন্য তিনি একটি ৫বৎসর বয়স্কা বালিকার দ্বারা হস্তলিপি করাইয়া ছিলেন, তাহাতে এই শ্লোকটি বালিকার হস্ত হইতে বাহির হয়—

"চৈতন্যো ভগবদ্ভক্তঃ ন চ পূর্ণঃ ন চাংশকঃ।"

ইহার অর্থ এই যে চৈতন্যদেব ভগবদ্ভক্ত, তিনি পূর্ণও নহেন এবং অংশও নহেন। কিন্তু বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বিগণ ইহার স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা করেন যে, "চৈতন্য ভগবদ্ভক্ত নহেন এবং অংশও নহেন, তিনি পূর্ণ।" যাহা হউক তজ্জন্য তিনি চৈতন্যদেবের প্রতি ভক্তি ও সম্মানের হানি করেন নাই। কৃষ্ণচন্দ্রের সময় কৃষ্ণানন্দ সার্ব্বভৌম বলিয়া এক পণ্ডিত ছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রে ইহাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল বলিয়া আগমবাগীশ নামে ইনি প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। অনেকের বিশ্বাস ইনিই মহারাজের গুরু ছিলেন। কথিত আছে কৃষ্ণ-চন্দ্রের উদ্যোগে ইহার দ্বারা বঙ্গদেশে কালীপূজা ও দীপাবলি প্রদান প্রথা প্রচলিত হয়। জগদ্ধাত্রী পুজার প্রচলন কৃষ্ণচন্দ্রের উদ্যোগেই এদেশে প্রথম আরম্ভ হয়। তদবধি বঙ্গদেশে জগদ্ধাত্রী পূজা হইতেছে।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ১৭৮২ খৃঃ অব্দে ২২শে আষাঢ় ৭৩ বৎসর বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার শরীর সুগঠিত ও গৌরবর্ণ ছিল। যেমনি তাঁহার দেহ কান্তিবিশিষ্ট ছিল, তেমনি তাঁহার দানশীলতা ও দয়া দাক্ষিণ্যাদি সচ্চরিত্রতার গুণসকল বিদ্যমান ছিল। তিনি যেরূপ বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ ও কার্য্যদক্ষ ছিলেন, তেমনি দয়াশীল, সত্যপরায়ণ এবং ন্যায় ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার প্রধান গুণ, তিনি সহস্র বিপদে পতিত হইলেও কখন মুহ্যমান হইতেন না। তিনি যৌবনের প্রারম্ভ হইতে আজীবন যেরূপ বিপজ্জালে জড়িত হইয়াছিলেন, এরূপ কখনও কোনও এক ব্যক্তির ভাগ্যে ঘটিতে দেখা যায় না। অসীম প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব গুণে তিনি সমুদয় বিপদ্‌কে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া মেঘোন্মুক্ত শশধরের

ন্যায় বাহির হইতেন। যখন চতুর্দ্দিকে বিপদ্ ঘিরিয়া আসিত, তখনও তিনি পাত্র মিত্র সভাসদ্ লইয়া আমোদ প্রমোদে কাল যাপন করিতেন। তাঁহার মনের জোর এত ছিল যে, তিনি কোন বিপদকে গ্রাহ্য করিতেন না। তাঁহার রাজসভা গুণগ্রাহিতা ও গুণিগণের উৎসাহ দান কার্য্যে অগ্রণী ছিল। ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না যে, সমগ্র ভারতের মধ্যে এই বঙ্গদেশ যে বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা, সুরসিকতা গুণের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে বা করিতেছে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভাই তাহার পত্তন ভূমি স্বরূপ ছিল। তাঁহার রাজসভা গুণিগণের সমাবেশে সমস্ত বিদ্যা ও কর্ম্মের আধার স্বরূপ ছিল। তাঁহারই উদ্যোগে পঞ্জিকার প্রচলন হয়, এবং যখন এদেশে মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হয়, তখনকার পঞ্জিকাতে "নবদ্বীপাধিপতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নৃপতেরনুজ্ঞয়া" এই কথাটী লেখা থাকিত। সমাজের সৃষ্টি ও বন্ধন কৃষ্ণচন্দ্রের শাসনে সম্পাদিত হইয়াছিল। বঙ্গের স্থানে স্থানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার দেবোত্তর ও ব্রাহ্মণগণের দানের ব্রহ্মোত্তর, চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিয়া তাঁহার নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে দেদীপ্যমান থাকিবে। এতদ্ভিন্ন সঙ্গীত শাস্ত্রেও তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি শ্যামা বিষয়ক অনেকগুলি গীত রচনা করিয়া যান। তাঁহার বংশধরগণ নবদ্বীপাধিপতি হইয়া এখনও কৃষ্ণনগরে রাজত্ব করিতেছেন।





[illegible]

Queen's Press.



মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় এই ভাগ্যবান্ মহাপুরুষের জন্ম হয়। ইহাঁর অসীম প্রতিভাবলে ও বুদ্ধিকৌশলে ইনি বিপুল বিভব অর্জ্জন করিয়া জন সমাজে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান শোভাবাজার রাজবাটী ইনিই প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। প্রতিভাবান্ ব্যক্তি স্বীয় বুদ্ধি প্রাখর্য্যে কিরূপে উন্নতি ও সুখলাভ করিতে পারেন, ইনিই তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

মহারাজা নবকৃষ্ণদেব ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে সন ১১৩৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম দেওয়ান রামচরণ দেব। ইঁহারা চিত্রপুরের দেব বংশোদ্ভব মৌলিক কায়স্থ। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ শ্রীহরি দেব মুরশিদাবাদের সন্নিকটস্থ কাণসোণা নামক কায়স্থ-প্রধান গ্রামে বাস করিতেন। শ্রীহরি দেবের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র পীতাম্বর দেব নবাব সরকার হইতে সম্মানসূচক খাঁ উপাধি পাইয়াছিলেন। ইনি বিশেষ ধনশালী ও সম্মানার্হ ছিলেন। কোন সময়ে ইনি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের গমনাগমনের সুবিধার্থে একটী ক্ষুদ্র নদীর একাংশ ধান্য দ্বারা পূর্ণ করিয়া সেতু স্বরূপ বাঁধ করিয়া দেন। তজ্জন্য লোকে তাঁহাকে "ধান্য পীতাম্বর" কহিত। পীতাম্বরের ৯টী প্রপৌত্র স্বগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া বিভিন্ন গ্রামে বাস করেন।

এই বংশের দেবীদাস "রায় মজুমদার" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ডহারবারের নিকট মুড়াগাছা পরগণার কানুনগো পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁর ছয় পুত্র, তন্মধ্যে কনিষ্ঠ রুক্মিণীকান্ত অনেকগুলি জ্ঞাতিকে লইয়া উক্ত মুড়াগাছার অন্তর্গত পঞ্চগ্রামে বাস করেন; এবং নবাব সরকারে কর্ম্ম করিয়া "ব্যবহর্ত্তা" উপাধি পাইয়াছিলেন। ব্যবহর্ত্তা অর্থে রাজ কর্ম্মচারী। তাঁহার পৌত্র রাম চরণ দেব, যিনি নবকৃষ্ণের পিতা, তিনি মুড়াগাছার বাস উঠাইয়া গঙ্গাতীরে গোবিন্দপুর নামক গ্রামে আসিয়া বাস করেন। বর্ত্তমান ফোর্ট উই-লিয়ম দুর্গের ভূমি ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ পূর্ব্বে গোবিন্দপুর নামে আখ্যাত ছিল। তিনি হিজলী, তমলুক, মহিষাদল প্রভৃতি স্থানের নিমক মহলের কর-সংগ্রাহক বা কালেক্টারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই কার্য্যে রামচরণ বিচক্ষণতা প্রকাশ করিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিলে, নবাব মহব্বত জঙ্গ তাঁহাকে কটকের সুবাদারের দেওয়ানী পদ প্রদান করিলেন। এই পদই তাঁহার কাল হইল। কটকাভিমুখে গমনকালে পথিমধ্যে পিণ্ডারী দস্যু কর্তৃক সুবাদার সহিত তিনি নিহত হন।

এইরূপে রামচরণ পরলোক গমন করিলে পর, তাঁহার বিধবা পত্নী তিনটী শিশু পুত্র ও পাঁচটী বালিকা কন্যা লইয়া অর্থকৃচ্ছ্রতা বশতঃ মহা কষ্টে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এই সময়েই তাঁহাদের গোবিন্দ পুরস্থ বাটী ভাগীরথীর ভাঙ্গণে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় কষ্টেসৃষ্টে আর একখানি বাটী তৈয়ারি করেন, কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্ম্মাণের জন্য ঐ স্থান প্রয়োজন হওয়ায়, তাঁহারা আড়পুলীতে কয়েক বিঘা জমী ও কয়েক সহস্র টাকা ক্ষতি পূরণস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের উক্ত স্থান মনোনীত না হওয়ায়, আড়পুলীর জমী বিক্রয় করিয়া গঙ্গার নিকটবর্ত্তী শোভাবাজার নামক স্থানে কিছু জমী ক্রয় করিয়া বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। এই আদিক্রীত ভূমিই শোভাবাজারের বর্ত্তমান রাজবাটী।

রামচরণের তিনটী পুত্র। জ্যেষ্ঠ রামসুন্দর, মধ্যম মাণিক্যচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ নবকৃষ্ণ। অর্থ কষ্ট হইলেও গুণবতী জননী তিনটী পুত্রকে শিক্ষা দান করিতে ক্রটী করেন নাই। জ্যেষ্ঠ পুত্র রামসুন্দর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পঞ্চ-কোট ও অন্যান্য স্থানের দেওয়ান হইয়া পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন। মধ্যম মাণিক্যচন্দ্রও জ্যেষ্ঠের কর্ম্ম স্থানে গমন করিলেন। ১১৭৯ হিজরীতে তাঁহারা দিল্লীর বাদসাহার অনুগ্রহ লাভ করিয়া রায় উপাধি ও হাজারী মন্‌সবদারের পদ লাভ করেন। এই সময় হইতে ইহাদের অর্থ কষ্ট দূর হইয়া পুনরায় সৌভাগ্যরবি উদয় হইতে লাগিল। কনিষ্ঠ নবকৃষ্ণ অল্প বয়সে পিতৃহীন হইলেও জননী ও ভ্রাতাদিগের যত্নে এবং স্বাভাবিক মেধার বলে তিনি অল্পকালের মধ্যেই বাঙ্গলা ও পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। ক্রমে উর্দ্দু, আরবিক, এবং ইংরাজী ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় হইতেই তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য্য, বিদ্যা, সুচতুরতা, শিষ্টাচার, অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণ সকল পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

এই সময়ে কলিকাতায় নূতন বাজারে নকুধর নামক একজন ধনকুবের বাস করিতেন। তিনি জাতিতে সুবর্ণ বণিক। তাঁহার পূর্ণ নাম লক্ষ্মীকান্ত ধর। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সময়ে সময়ে আবশ্যকমত তাঁহার নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করিতেন। ইনি ভবিষ্যতে লর্ড ক্লাইভের মুৎসুদ্দি হইয়াছিলেন। বিপুল বিত্তের অধিকারী হইয়াও তিনি সামান্য ভাবে থাকিতেন। নবকৃষ্ণ এই ধনকুবেরের নিকট চাকরীর উমেদারী করায় তিনি ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। তৎপরে ১৭৫০ খৃঃ অব্দে অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় নবকৃষ্ণ ওয়ারেণ হেষ্টিংসের পারস্য ভাষার শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। এই সময়ে হেষ্টিংস কোম্পানীর একজন উচ্চ কেরাণী মাত্র ছিলেন; এবং নবকৃষ্ণের সমবয়স্ক বিধায় তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর বিশেষ সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছিল।

১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস কাসীম বাজারের কুঠীতে প্রেরিত হইলে নবকৃষ্ণ তাঁহার সমভিব্যাহারী হন। তৎপরে নবাব সিরাজুদ্দৌলা ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য যখন কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করেন, তখন পথিমধ্যে তিনি কাসীম বাজারের কুঠী লুণ্ঠন করিয়া, ওয়ারেণ হেষ্টিংস ও অন্যান্য ইংরাজদিগকে কারারুদ্ধ করেন। সেই সময় নবকৃষ্ণ কলিকাতায় পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করেন। কিন্তু তাঁহাকে অধিক দিন নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতে হয় নাই। কারণ নকুধর নিজের অধীনে তাঁহাকে একটী কর্ম্ম করিয়া দেন। নবকৃষ্ণের পারস্য ভাষায় পারদর্শিতা দেখিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ৬০৲ টাকা বেতনে কোম্পানীর মুন্সীগিরি পদে অধিষ্ঠিত করেন। এবং ইহার কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া অনেক বিশ্বস্ত কার্য্যে ইহাঁকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই পদ হইতেই তিনি মুন্সীনামে খ্যাত হন। এই সময় হইতেই নবকৃষ্ণ উদীয়মান রবির ন্যায় দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন। মুন্সীগিরি কার্য্যে নবকৃষ্ণ এতাদৃশ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যে মুন্সী দপ্তরের কার্য্য ব্যতীত ক্লাইভ তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে দুরূহ দৌত্য কার্য্যের ভার প্রদান করিতেন।

১৭৫৭ খৃঃ অব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে যখন সিরাজুদ্দৌলা দ্বিতীয়বার কলিকাতা আক্রমণেচ্ছায় আসিয়া হালসী বাগানে উমিচাঁদের উদ্যানে শিবির সংস্থাপন করেন সেই সময় মুন্সী নবকৃষ্ণ সন্ধি প্রার্থনায়, ক্লাইভের উপঢৌকন সহ তথায় যাইয়া দূতের কার্য্য করিয়াছিলেন। সুচতুর নবকৃষ্ণ প্রত্যাগমন করিয়া সৈন্য সংখ্যা কম বলায় ক্লাইভ সাহসী হইয়া তৎপর দিন প্রত্যুষে শত্রুদিগকে আক্রমণ করেন। ক্লাইভের এই অসাধারণ বীরত্বদর্শনে নবাব ভীত হইয়া ৯ই ফেব্রুয়ারি সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপরে ষড়্‌যন্ত্র ঘটিত মাসদ্বয় ব্যাপী যে লেখালিখি ক্লাইভের সঙ্গে চলিয়াছিল, তৎসমস্তই মুন্সী নবকৃষ্ণ দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল।

১৭৫৭ খৃঃ অব্দে জুন মাসে সিরাজুদ্দৌলা পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হইলে ওয়ালস্, ওয়াটস, লুসিংটন, দেওয়ান রামচাঁদ রায় এবং মুন্সী নবকৃষ্ণ ইংরাজদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ ধনাগার তত্ত্বাবধারণ করেন। কিন্তু তাহাতে দুই কোটী টাকার অধিক ছিল না। ঐ টাকা ক্লাইভ প্রভৃতি ভাগ করিয়া লন। কিন্তু সিরাজের অন্তঃপুরে আর একটী গুপ্ত ধনাগার ছিল, তাহাতে স্বর্ণ রৌপ্য ও রত্নাদিতে প্রায় আট কোটি টাকা ছিল। এই বিপুল বিত্ত মীরজাফর, আমীর বেগম খাঁ, রামচাঁদ ও নবকৃষ্ণ বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপে নবকৃষ্ণ এককালে সদ্যসদ্যই ক্রোরপতি হইলেন। ঈশ্বরানুগ্রহে এইরূপে প্রভূত ধন রত্ন প্রাপ্ত হইয়া ভাগ্যবান্ নবকৃষ্ণ ধনের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া নানাবিধ সদ্ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের ক্রিয়া কলাপ আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে তিনি দানে কিরূপ মুক্তহস্ত ছিলেন।

এই বিপুল ধনরত্ন লইয়া নবকৃষ্ণ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া স্থির করিলেন, যাঁহার কৃপায় আজ আমি ক্রোরপতি, সেই ভাগ্য বিধাতৃদেবী মা জগজ্জননী দশভূজার অর্চ্চনা করিয়া জীবন সার্থক করিব। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি পূজার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তখন পূজার মাত্র তিন মাসকাল অবশিষ্ট ছিল ; তজ্জন্য তিনি বিশেষ রূপে উদ্যোগী হইয়া অল্প দিবসের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে পূজার দালান বা চণ্ডীমণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইলেন। তৎপরে তিনি কৃষ্ণ নবমীর রাত্রি হইতে দেবীর বোধন আরম্ভ করাইলেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের দ্বারা চণ্ডীপাঠ ও কুলপুরোহিত দ্বারা অর্চ্চনাদি করাইতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে তিনি প্রতিদিন মুক্ত হস্ত হইয়া ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রগণকে বস্ত্র অর্থ ও খাদ্যাদি বিতরণ করিয়াছিলেন। এই মহোৎসবে মুরশিদাবাদ লক্ষ্ণৌ দিল্লী প্রভৃতি নগর হইতে নর্ত্তকীগণ আসিয়াছিল ; এবং একপক্ষ ব্যাপী নৃত্য-গীতের আমোদ চলিয়া ছিল। প্রায় ১৫ দিবস ধরিয়া প্রীতিভোজনের উৎসব চলিয়া

ছিল এবং বিস্তর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় ও নিমন্ত্রিত বর্ণ চতুষ্টয়ের প্রীতিভোজনে এবং আমোদ আহ্লাদে নবনিকেতন হাস্যময়ী হইয়াছিল। এইরূপে তিনি মহাসমারোহে মহামায়ার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। এই উৎসব উপলক্ষে স্বয়ং লর্ড ক্লাইভ এবং প্রধান প্রধান রাজপুরুষেরা পর্য্যন্ত তাঁহার ভবনে নিমন্ত্রিত হইয়া আদর ও যত্নে পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন। এই দুর্গোৎসব তিনি প্রতি বৎসর বৃহদনুষ্ঠানে সম্পন্ন করিয়া, দীন দুঃখীদিগকে অকাতরে অন্ন বস্ত্র ও অর্থাদি দান করিতেন। এতদ্ভিন্ন নগরস্থ হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ, য়িহুদী প্রভৃতিকেও নিমন্ত্রণ করিয়া প্রীতিভোজনে আপ্যায়িত করিতেন। অদ্যাবধি এই দুর্গোৎসব তদবস্থায় তাঁহার প্রপৌত্রদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে।

নর্ত্তকীগণের এই নাচ ইংরাজগণের মাঙ্গলিক বলিয়া অনেক নবাগত ইংরাজ অদ্যাবধি শোভাবাজার রাজবাটীতে নাচ দেখিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে সিপাহী বিদ্রোহের জন্য এই নাচ একবার মাত্র বন্ধ হয়, কিন্তু পর বৎসর বিদ্রোহ শান্তির পর পুনরায় মহাসমারোহে ইহা সম্পন্ন হইয়াছিল। সেই সময় প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্র ইংলিসম্যান আনন্দ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, "ঠিক একশত বৎসর পূর্ব্বে মহারাজা নবকৃষ্ণ পলাশীর যুদ্ধের পর যে বাটীতে দুর্গোৎসব করিয়া রবার্ট ক্লাইভ ও কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ইংরাজদিগকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, সেই ভবনে অদ্য তাঁহার পৌত্রগণ ক্লাইভের সমকালীন ইংরাজদিগের পৌত্রদিগকে সিপাহী বিদ্রোহ শান্তির পর নিমন্ত্রণ করিয়া, পলাশীর যুদ্ধের জয়লাভ, ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত ও একশত বৎসর ব্যাপী এই রাজ্য শাসন ও অধিকার প্রভৃতি, পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। ইহাতে আমরা আপনাদিগকে অত্যন্ত গৌরবান্বিত মনে করিতেছি, এবং এই নাচই আমাদের শতবৎসরের পূর্ব্ব স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে।"

দেশের অবস্থা।

১৭৬০ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে লর্ড ক্লাইভ বিপুল অর্থ ও মহা সম্মানের সহিত স্বদেশ যাত্রা করিলে, কলিকাতা কাউন্সিলের সভ্য ভানসীটার্ট সাহেব তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ক্লাইভের ন্যায় তিনি উপযুক্ত ছিলেন না, এবং মীরজাফরও নবাবী পদ প্রাপ্ত হইয়া রিপু পরায়ণ ও যথেচ্ছাচারী হইয়াছিলেন। সুতরাং রাজ্য মধ্যে মহা অশান্তি উৎপন্ন হইল। এই কারণে কলিকাতার কাউন্সিলের সভ্যগণ মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তদীয় জামাতা মীরকাসিমকে উক্ত পদে বসাইলেন। এই অনুগ্রহের জন্য মীরকাসিম কলিকাতাস্থ কাউন্সিলকে কুড়ি লক্ষ টাকা প্রদান ও কোম্পানীকে মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান এবং চট্টগ্রাম এই ৩টী প্রদেশ অর্পণ করেন। ইহাঁর মধ্যেও নবকৃষ্ণ লিপ্ত ছিলেন। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে শুল্ক লইয়া মীরকাসিমের সহিত ইংরাজদিগের সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, নবকৃষ্ণ সেনাপতি মেজার এডামসের সহিত যুদ্ধস্থানে গমন করেন। তথায় তাঁহার উপর নানা বিষয়ের তত্ত্বাবধারণের ভার অর্পিত হয়। যুদ্ধের ফলে মীরকাসিম পরাভূত হইলেন; এবং তাঁহার স্থানে ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে মীরজাফর পুনর্ব্বার নবাবীপদ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই তিনি পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র সুজামুদ্দৌলা নবাবী পদে অভিষিক্ত হন। এই সময়ে কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের অন্যায় আচরণে বঙ্গদেশে নানা গোলযোগ ও অশান্তির কথা শুনিয়া বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হন, এবং নবরাজ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য ক্লাইভকে পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে যাত্রা করিতে অনুরোধ করেন। তৎপরে তাঁহারা ক্লাইভকে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ও প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিয়া Baron Clive of Plassey ও K. C. B. উপাধি প্রদান করিয়া পাঠাইয়া দেন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে ৩রা মে ক্লাইভ কলিকাতায় আসিয়া উপনীত হন।

জুনমাসে ক্লাইভ এলাহাবাদ যাত্রা করেন এবং মুন্সী নবকৃষ্ণ তাঁহার সহিত গমন করেন। দিল্লীর বাদসাহ সাহ আলম এবং অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দিনের সহিত তাঁহার যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহাতে নবকৃষ্ণ দৌত্যকার্য্যে ব্রতী হন এবং সন্ধিপত্রের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। ১২ই আগষ্ট বাদসাহ বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব রাখিয়া ক্লাইভকে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানির সনন্দ প্রদান করেন। সুতরাং এক্ষণে মুরশিদাবাদের নবাব নাম মাত্র সুবেদার রহিলেন।

সম্মান লাভ।

ইহার পর ক্লাইভ নবকৃষ্ণের উপর মহারাজা বলবন্ত সিংহের সহিত বেনারস সম্বন্ধে এবং রাজা সেতাব রায়ের সহিত বিহার সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিবার ভার অর্পণ করিলে, তিনি তাহা অতি সুন্দর রূপে সম্পন্ন করেন। এই সময়ে নবকৃষ্ণ কাশীতে বিশ্বেশ্বরের নাট-মন্দিরে "নবকৃষ্ণেশ্বর" নামে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপরে পাটনায় আসিয়া সেতাব রায়ের সহিত বন্দোবস্ত করেন। এই সকল দুরূহ কার্য্য নবকৃষ্ণের মুন্সীয়ানা ও বাহাদুরীতে সুচারু রূপে সম্পাদিত হওয়ায়, লর্ড ক্লাইভ তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে দিল্লীশ্বর শাহ আলমের নিকট হইতে, প্রথমে তাঁহাকে "রাজাবাহাদুর" ও মন্‌সব্ পঞ্চ হাজারী উপাধি ও তৎসঙ্গে ৩০০০ অশ্বারোহী, ঝালরদার পাল্কী ও নাকাড়া রাখিবার অধিকার আনাইয়া দিয়া নিজ দরবারের ওমরাহ শ্রেণীতে গণ্য করিলেন। পর বৎসর ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে ক্লাইভ আবার "মহারাজা-বাহাদুর" ছয় হাজারী মন্‌সব্‌দারীর ফরমান এবং ৪০০০ অশ্বারোহী রাখিবার অধিকার, সম্রাটের নিকট হইতে আনাইয়া দেন। এই উপলক্ষে ক্লাইভ যে দরবার করেন তাহাতে কলিকাতার সমস্ত সম্ভ্রান্ত ইংরাজ সমাগত হন। ক্লাইভ

নিজে তাঁহাকে পারস্য ভাষায় খোদিত একটী সুবর্ণ পদক, সম্মান-সূচক মূল্যবান্ পরিচ্ছদ, দশবিধ খেলাৎ যথা—হস্তী, অশ্ব, তরবারি, চর্ম্মফলক (ঢাল), চামর, শিরপ্যাঁচ, ছত্র, ঝালরদার পাল্‌কী, ঘড়ী, কুণ্ডল, হীরক ও মুক্তাদি বহুমূল্য রত্ন এবং রত্নের অলঙ্কার প্রভৃতি প্রদান করেন। দরবার সমাপনান্তে লাটসাহেব স্বয়ং তাঁহাকে সুসজ্জিত হস্তীর উপর রৌপ্য নির্ম্মিত হাওদায় আরোহণ করাইয়া দেন। নবকৃষ্ণ বিবাহের বরের ন্যায় নাকাড়া ও ইংরাজী ব্যাণ্ড প্রভৃতি বাদ্যধ্বনি করিতে করিতে মহাসমারোহে গজ পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সুসজ্জিত নিজ প্রাসাদে প্রত্যাগমন করেন। এই সমস্ত রেশালার সহিত বহু সংখ্যক অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্য, তুর্য্যাজীব, আশাবরদার প্রভৃতি গজের অনুগমন করিয়াছিল এবং রাজবর্ত্মে ভয়ঙ্কর লোকারণ্য হইয়াছিল।

তৎপরে ক্লাইভ তাঁহার হস্তে কোম্পানির কয়েকটী প্রধান প্রধান কার্য্য বিভাগের ভার অর্পণ করিলেন। তাঁহার উপর মুন্সীদপ্তর * ব্যতীত আরজবেগী দপ্তর, জাতিমালা কাছারী, খাজনা খানা (ধনাগার), ২৪ পরগণার মাল আদালত এবং তহশীল দপ্তরের ভার অর্পিত হইল। তিনি নিজ-বাটীতে বসিয়া এতগুলি কার্য্য করিতেন, এবং সৈনিক পুরুষেরা তাঁহার দ্বার রক্ষা করিত।

মাতৃ শ্রাদ্ধ।

এই কার্য্য তাঁহার জীবনের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান কার্য্য। শ্রাদ্ধের এরূপ বৃহৎ আয়োজন ও সমারোহ ব্যাপার কখনও কলিকাতায় হয় নাই।

* ১ মুন্সীদপ্তর—পারস্য ভাষা বিভাগের সেক্রেটারী অফিস্।
২ আরজবেগী দপ্তর—যেখানে আবেদন সকল গৃহীত হয়।
৩ জাতিমালা কাছারী—যেখানে জাতি ঘটিত অভিযোগ বিচার হয়।
৪ খাজনা খানা—যেখানে কোম্পানীর টাকা রক্ষিত হয়।
৫ মাল-আদালত—২৪ পরগণার রাজস্ব সম্বন্ধীয় বিচারালয়।
৬ তহশীল দপ্তর—২৪ পরগণার কলেক্টরীর অফিস্।

নবকৃষ্ণ নিঃস্ব অবস্থা হইতে ভগবৎ কৃপায় ক্রোরপতি হইয়াছেন, এমন সময় তাঁহার স্নেহময়ী ও গুণবতী বৃদ্ধা জননী মানবলীলা সংবরণ করিলেন। সুতরাং সেই জননী দেবীর আদ্য শ্রাদ্ধে জলের মত অজস্র খরচ করিয়াও তিনি তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। কিরূপে জননীর ঋণ পরিশোধ করিবেন এই ভাবনায় তিনি মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিলেন। যে জননীর গুণে তিনি দরিদ্রতা সত্ত্বেও সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া রাজপুরুষদের সঙ্গে একত্র কর্ম্ম করিতেন, যে জননীই তাঁহার ভাবী অভাবনীয় সৌভাগ্যের মূলাধার, সেই ভাগ্যবতী জননীর আদ্য শ্রাদ্ধ ব্যাপার শুনিলে হৃদয়ে আনন্দ ও বিস্ময় উৎপাদন করে। তখন নবকৃষ্ণকে জননীর উপযুক্ত পুত্র বলিয়া প্রসংশা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে নানা স্থান হইতে ভাট, ফকির, কাঙ্গালী এবং অন্যান্য অর্থ প্রয়াসী লোক পঙ্গপালের ন্যায় ক্রমাগত তাঁহার বাটীতে আসিতে লাগিল। নবকৃষ্ণ এই সকল কাঙ্গালীদের জন্য বিস্তর পর্ণ-কুটীর ও খাদ্য দ্রব্যাদির আয়োজন করিতে লাগিলেন। শেষে শ্রাদ্ধের দিন যত সন্নিকট হইতে লাগিল, ততই দুর্ভিক্ষের কাঙ্গালীর মত শোভাবাজার জনসংঘে পূর্ণ হইয়া গেল। ক্রমে বাজারের চাউল, ডাউল, ফল, মূল, আনাজ, তরকারী প্রভৃতি সমস্ত খাদ্য সামগ্রী নিঃশেষ হইতে লাগিল। শেষে কদলীপত্র একেবারে শূন্য হইল। কুমারটুলির ভাঁড়, খুরি, হাঁড়ী, কলসী প্রভৃতি নিঃশেষ হইল, তথাচ কাঙ্গালীদের আহারের সংকুলান হয় না। এরূপ অবস্থায় শেষে নবকৃষ্ণের আদেশ-মত প্রত্যেক লোকের বাটীতে তাঁহাদের নিজ ভবনে গৃহস্থগণ অতিথি সেবা করিতে লাগিলেন। এবং তিনি তাহার সমস্ত খরচ, প্রত্যেক বাটীতে দিতে লাগিলেন। শ্রাদ্ধের দিনে অসংখ্য দর্শকবৃন্দ সভার শোভা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। এরূপ অপরূপ শোভা কখনও কাহারও শ্রাদ্ধে হয় নাই। শ্রাদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

একটী সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ড কাষ্ঠ ফলক দ্বারা চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত, মধ্যে মধ্যে প্রবেশপথের অপূর্ব্ব তোরণ, তাহাতে সশস্ত্র সৈনিক পুরুষেরা সর্ব্বদা প্রহরীর কার্য্য করিতেছে। উপরে সুন্দর চন্দ্রাতপ তাহাতে ঝালর সকল দোদুল্যমান। নিম্নে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রগণের বসিবার পৃথক পৃথক আসন। কাশী, নবদ্বীপ, শান্তিপুর ও ভাটপাড়া প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতগণ ন্যায় স্মৃতি ও বেদান্ত প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের তর্ক বিতর্ক করিতেছেন। কোন স্থানে গায়কেরা মধুর হরিসংকীর্ত্তনে শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে ভক্তিসুধা ঢালিয়া দিতেছে। মধ্যস্থলে বেদী সন্নিকটে দ্বাত্রিংশৎ স্বর্ণ ও রৌপের ষোড়শ, পর্ব্বতপ্রমাণ উচ্চ হইয়া চন্দ্রাতপকে স্পর্শ করিতেছে। হস্তি, অশ্ব, সবৎস ধেনু, শিবিকা, শয্যা ছত্র, পাদুকা, আসন প্রভৃতি পর্যায়ক্রমে সজ্জিত হইয়া সভার শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। শাল, বনাত প্রভৃতি গাত্রবস্ত্রের স্তূপ সকল যেন দোকান শূন্য করিয়াছে। সভার অনতিদূরে ভাণ্ডার মহলে দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, তৈল প্রভৃতি তরল পদার্থের হ্রদ কাটান হইয়াছে। মিষ্টান্নের স্তূপ সকল দেখিলে এক একটী পর্ব্বত বলিয়া মনে হয়। বহুসংখ্যক পাচক ব্রাহ্মণ অনবরত মেঠাই সন্দেশ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া এই সকল স্তূপ করিতেছে। তণ্ডুল, ময়দা, মসলা প্রভৃতি, আড়তের ন্যায় রাশীকৃত ঢালা রহিয়াছে, ঘৃতের অসংখ্য মটকীর যেন হাট বসিয়াছে। এরূপ বিপুল আয়োজন দেখিলে মনে হয়, যেন কুম্ভ মেলাকেও পরাস্ত করিয়াছে।

নবকৃষ্ণের বন্ধু ভূকৈলাস রাজবাটীর পূর্ব্ব পুরুষ দেওয়ান গোকুল চন্দ্র ঘোষাল মহাশয় এই সকল দ্রব্যের তত্ত্বাবধারকের ভার গ্রহণ করেন। এবং দেশের যত বড়লোক এই সভায় যোগদান করিয়া সুশৃঙ্খলার সহিত এই বৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। কাঙ্গালীদিগকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া গাত্রবস্ত্র প্রদত্ত হইয়াছিল। নবকৃষ্ণ নয় লক্ষ টাকা শ্রাদ্ধের ফর্দ্দ করিয়াছিলেন; কিন্তু

কাঙ্গালীর সংখ্যা গণনাতীত হওয়ায় আরও অনেক বেশী খরচ হইয়া ছিল। এই শ্রাদ্ধের বিরাট আয়োজন ও চতুর্দ্দিকস্থ পণ্য বীথিকার অপূর্ব্ব শোভা হইতে শোভাবাজার নাম হইয়াছে। অধুনা অনেকে এই স্থানের নাম শোভাবাজারের পরিবর্ত্তে সভাবাজার কহিয়া থাকেন। মতান্তরে বড়বাজার নিবাসী শোভারাম বসাকের এস্থলে একটী বাজার থাকায় এই স্থানের নাম শোভাবাজার হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোনটী ঠিক তাহা বলা সুকঠিন।

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা।

নবকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা আর এক বৃহদ্ব্যাপার। ইহার জন্য তিনি বহুদিবস হইতে আয়োজন করিতেছিলেন। প্রথমে তিনি শ্রীগোবিন্দ নামে এক বিগ্রহ প্রস্তুত করান। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে বঙ্গদেশের সমস্ত বিগ্রহ অপেক্ষা তাঁহার বিগ্রহ ভাস্কর শিল্পে শ্রেষ্ঠ হইবে। কিন্তু তিনি দেখিলেন যে অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ সর্ব্বাপেক্ষা সৌন্দর্য্যশালী। শেষে তিনি বিগ্রহের রূপে এমনই মুগ্ধ হন, যে ১১৭০ সালের শেষ ভাগে এক দিন রাত্রিতে ঐ বিগ্রহ চুরি করিয়া নৌকাযোগে কলিকাতায় আনয়ন করেন। গোপীনাথ তখন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারে ছিলেন। তিনি নবকৃষ্ণের এই অত্যাচারের কথা গবর্ণর জেনারেলের নিকট জানাইলেন। ইহাতে লাট বাহাদুর বিচার করিয়া বিগ্রহ প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ দেন। নবকৃষ্ণ নিরুপায় হইয়া তৎক্ষণাৎ উত্তমোত্তম ভাস্কর আনাইয়া ঠিক গোপীনাথের অনুরূপ আর এক বিগ্রহ নির্ম্মাণ করাইলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই চাতুরীর কথা শুনিয়া চিন্তাকুল হইলেন, কিন্তু গোপীনাথের পূজক ব্রাহ্মণ বলিলেন—আমার চির সেবিত ঠাকুর আমি ঠিক চিনিয়া লইতে পারিব। কথিত আছে পূজক আসিয়া আসল নকল কিছুতেই ঠিক করিতে পারেন নাই। শেষে বিলাপ করিতে করিতে নিদ্রাবশে স্বপ্নে

দেখিলেন, যে, যাঁহার কপালে ঘর্ম্মবিন্দু দেখিবে, তাঁহাকেই আসল জানিবে। তদনুসারে পূজক ব্রাহ্মণ পরদিন ঘর্ম্মবিন্দু দেখিয়া আসল গোপীনাথ বাহির করিয়া লইলেন। তখন নবকৃষ্ণ ক্ষুন্নমনে গোপীনাথকে প্রচুর হীরামুক্তার অলঙ্কার প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন।

এইরূপে তাঁহার গোবিন্দ ও গোপীনাথ দুই বিগ্রহ হইল। শেষে তিনি নিজবাটীতে সন ১১৭৩ সালে বৈশাখ মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে তাঁহার শ্রীশ্রীগোবিন্দ ও শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউ দুই বিগ্রহ মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই উৎসব উপলক্ষে বল্লভপুরের শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউ, খড়দহের শ্যামসুন্দর, সাঁইবোনার নন্দদুলাল, অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ, বিষ্ণুপুরের মদনমোহন প্রভৃতি নানা স্থান হইতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ দেব বিগ্রহ সকল নিজ প্রাসাদে আনয়ন করিয়াছিলেন, এবং প্রত্যাবর্ত্তন কালে প্রত্যেক বিগ্রহকে বহুমূল্যের অলঙ্কার প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত রাধাবল্লভ জীউর সেবার জন্য বল্লভপুর গ্রাম এবং নন্দদুলালের সেবার জন্য চারিটী গ্রাম প্রদান করেন। তিনি নিজ প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ ও গোবিন্দ জীউর দৈনিক সেবার জন্য বিস্তর ব্যয়ের বন্দোবস্ত করেন। এবং জন্মাষ্টমী, রাস ও দোলযাত্রা উপলক্ষে বিস্তর ব্যয় করিতেন। ইহা ব্যতীত তিনি চড়কেও বিস্তর ব্যয় করিতেন; এবং এই উপলক্ষে তিন দিবস ব্যাপী ধূমধামের সহিত সুন্দর মেলা বসিত! এখনও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ ঐ সকল পার্ব্বণ একপ্রকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

বিবাহোৎসব।

নবকৃষ্ণের চতুর্থ কার্য্য জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ। এই বিবাহ উপলক্ষে তিনি নানাস্থান হইতে কুলীন ব্রাহ্মণ ও কুলীন কায়স্থদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করেন এবং বিদায় কালে তাঁহাদিগকে প্রচুর অর্থ দিয়া

সকলকার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। এই বিবাহে বঙ্গের তিন জন বিখ্যাত প্রধান প্রধান ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহারাজা ত্রিলোক চন্দ্র এবং রায়রায়াঁ মহারাজা রাজবল্লভ রায়*। প্রাঙ্গণে বিবাহের যেরূপ সভা হইয়াছিল সেরূপ অভূতপূর্ব্ব অপরূপ সভা অন্য কোথাও কখনও হইয়াছিল কি না সন্দেহ।

১৭৬৭ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে লর্ড ক্লাইভ স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। তিনি এই দুই বৎসরের মধ্যে বুদ্ধি কৌশলে নবরাজ্যে সুশৃঙ্খলা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশ্রমের আতিশয্য নিবন্ধন স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় বিলাত যাইতে বাধ্য হইলেন। নচেৎ তিনি আরও কিছুদিন থাকিয়া কলিকাতা ও দেওয়ানির সনন্দপ্রাপ্ত প্রদেশ গুলির উন্নতি সাধন করিয়া যাইতে পারিতেন। কাউন্সিলের সভ্য ভেরেলেষ্ট সাহেব ক্লাইভের পদে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু ক্লাইভের মত তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্য ছিল না। সুতরাং রাজ্যমধ্যে পুনর্ব্বার বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইল। এই সময়ে নবকৃষ্ণের নামে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ উপস্থিত

* বঙ্গদেশে এই সময়ে রাজবল্লভ নামে দুইজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। একজন বৈদ্যজাতীয় রাজা রাজবল্লভ সেন, অন্য জন কায়স্থ জাতীয় রায়রায়াঁ মহারাজা রাজবল্লভ রায়। প্রথমোক্ত ব্যক্তি ঢাকার ডেপুটি গভর্ণর ছিলেন। ইনি ১৭৬৩ খ্রীঃ অব্দে মীরকাসিম কর্ত্তৃক নিহত হন। দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রধান উজীর রাজা রায় দুর্ল্লভের পুত্র। ইনি গর্ব্বে এবং আত্মাভিমানে স্বীয় প্রভু অপেক্ষা বড় ন্যূন ছিলেন না। ইঁহার আদি নিবাস রাজসাহী জিলায় ছিল, শেষে কলিকাতায় বাগবাজারে বাটী নির্ম্মাণ করেন। রাজস্ব বিষয়ে ইঁহার এতদূর আধিপত্য ছিল যে, খাজনা বাকী পড়িলে বর্দ্ধমান ও নবদ্বীপের মহারাজাদিগকেও নাতক করিয়া মুরশিদাবাদে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিবার ক্ষমতা ছিল, তজ্জন্য সকলেই তাঁহাকে ভয় করিতেন। ১৭৭২ খ্রীঃ অব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস শাসন কর্ত্তা হইলে রাজস্ব বিভাগের ভার কোম্পানি স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন; সুতরাং মুরশিদাবাদের রায়রায়েঁর পদ উঠিয়া গেল। রাজবল্লভ বার্ষিক এক লক্ষ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন; এবং বঙ্গদেশের রাজস্ববিভাগের কার্য্য সুচারুরূপে চলিবার জন্য গভর্ণর জেনারেল তাঁহাকে কার্য্য সভার অতিরিক্ত ও অবৈতনিক সভ্যের পদে নিযুক্ত করেন।

হইল। তাঁহার ধন মান ও পদ বৃদ্ধির সহিত শত্রুও বৃদ্ধি হইয়াছিল। তাঁহার প্রতিযোগী মহারাজা নন্দকুমার, গীউ বাহাদুর এবং তৎকালিক মেয়ার আদালতের ভূতপূর্ব্ব কার্য্যাধক্ষ (অন্ডার ম্যান), উইলিয়ম বোলষ্ট প্রভৃতি সাহেবদিগের কুমন্ত্রণায়, রামনাথ দাস এবং রাম সোণার ঘোষ নবকৃষ্ণের নামে ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে উৎকোচ গ্রহণ, বলপূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ এবং তাহাদিগের পরিবারের প্রতি অত্যাচার প্রভৃতির অভিযোগ আনয়ন করে। চার্লস ফ্লায়ার সাহেবের উপর ইহার তদন্তের ভার অর্পিত হয়। তিনি বিশেষ অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলেন যে, নবকৃষ্ণকে সাধারণ্যে অপদস্থ করিবার মানসে হিংসাপ্রযুক্ত এই সকল কার্য্য সাজান হইয়াছে। সুতরাং বিচারে নবকৃষ্ণের নির্দ্দোষতা সপ্রমাণিত হইল।

১৭৬৯ খৃঃ অব্দে কার্টিয়ার গভর্ণর হন। ইহাঁর শাসনকালে বঙ্গাব্দ ১১৭৬ সালে বঙ্গদেশে মহা ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। তাহাতে দেশের তৃতীয়াংশ অধিবাসী অনাহারে অকালে প্রাণত্যাগ করে। ইহাকেই লোকে "ছিয়াত্তুরে মন্বন্তর" বলে। এই সময় নবকৃষ্ণ মুক্তহস্ত হইয়া অনেক দীন দুঃখীর প্রাণরক্ষা করিয়া ছিলেন।

১৭৭২ খৃঃ অব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা হইলে, তাঁহার পারস্য ভাষার শিক্ষক মুন্সী নবকৃষ্ণ হিন্দুসমাজের অগ্রণী ও সম্মানে মহারাজা বাহাদুর উপাধি লাভ এবং ধনে ক্রোরপতি হইয়াছেন দেখিয়া, তিনি পরম আনন্দ প্রকাশ করিলেন। যে ত্রয়োদশ বৎসর তিনি শাসন কর্ত্তা ছিলেন, নবকৃষ্ণের প্রাদুর্ভাবের পরিসীমা ছিল না। দেশের প্রায় সকল প্রধান লোকই তাঁহার শরণাগত হইতেন।

জায়গীর লাভ।

ছয় বৎসর পরে ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস নবকৃষ্ণকে ন-পাড়া প্রভৃতি গ্রামের বিনিময়ে সুতানুটীর তালুকদারী প্রদান করেন। ইহাতে বাগবাজার নিবাসী দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়, নিমতলার দত্ত চৌধুরী এবং কলিকাতার অন্যান্য পুরাতন অধিবাসী ও বড়লোকগণ গভর্ণমেণ্টের নিকট এই মর্ম্মে আপত্তি করেন যে, মহারাজা নবকৃষ্ণ সহরের নূতন অধিবাসী, তাঁহার অধীনে আমাদিগকে প্রজা হইয়া থাকিতে হইলে সকলকার মানের লাঘব হইবে এবং তাঁহার দ্বারা প্রজা পীড়ন হইবারও বিশেষ সম্ভাবনা। ইহাতে হেষ্টিংস বাহাদুর নবকৃষ্ণকে ইহার পরিবর্ত্তে মফঃস্বলের অধিক মূল্যবান্ জমীদারী দিবার মানস করিলেন। কিন্তু আবেদনকারী-দিগের নিকট থর্ব্ব হইতে হইবে বলিয়া নবকৃষ্ণ সুতানুটীর তালুক প্রাপ্ত হইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ ও আব্দার করায়, লাট সাহেব আবেদনকারী-দিগকে মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া ২৮শে এপ্রেল তারিখে উক্ত তালুক-দারীর সনন্দ প্রদান করিলেন। এই সনন্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস ও ৩ জন সভাসদের স্বাক্ষর ও কোম্পানীর মোহর আছে। সুতানুটীর চৌহদ্দী এইরূপ,—উত্তরে বাগবাজারের খাল, পূর্ব্বে অপার সারকিউলার রোড, পশ্চিমে ভাগীরথী এবং দক্ষিণে বড়বাজার রতন সরকারের গার্ডেন ষ্ট্রীট। এই সমগ্র তালুকের রাজস্ব মোট ১২৩৭৮/১০ টাকা কোম্পানীর ধনাগারে দাখিল করিতে হইবে। নবকৃষ্ণ এই জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রজাপীড়ন করা দূরে থাকুক কখনও কাঠিন্য প্রকাশ করেন নাই। সুতানুটী সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ যে কলিকাতার প্রথম অধিবাসী ও প্রসিদ্ধ ধনী বড়বাজারের সেট বসাকগণ হাটখোলা প্রভৃতি স্থানে তাঁহাদের জাতীয় ব্যবসার সুতার নুটী রৌদ্রে শুকাইতেন, তজ্জন্য ঐ সকল স্থান "সুতানুটী" নামে আখ্যাত।

বর্দ্ধমানের মহারাজা ত্রিলোকচাঁদ বাহাদুর মানবলীলা সংবরণ করিলে, তাঁহার বিস্তৃত জমীদারীর কার্য্য সুন্দররূপে সম্পাদিত না হওয়ায় ৮৭৪৭২৭৲ টাকা রাজস্ব বাকী পড়িয়াছিল। এই রাজস্ব না দিলে জমীদারী নিলামে বিক্রয় হইত, তজ্জন্য হেষ্টিংস বাহাদুর ঐ টাকা কর্জ্জ দিবার জন্য নবকৃষ্ণকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে নবকৃষ্ণ উক্ত টাকা বর্দ্ধমানাধিপতিকে ধার দেন। ১৭৮০ খৃঃ অব্দে জুলাই মাসে তিনি নাবালক মহারাজ কুমার তেজচন্দ্রের অছি এবং তাঁহার জমীদারী তত্ত্বাবধারকের পদে নিযুক্ত হন। উক্ত কার্য্যের জন্য তিনি বার্ষিক ৫০,০০০, টাকা পারিশ্রমিক পাইতেন। নাবালক তেজচন্দ্র নবকৃষ্ণের শোভাবাজারে নিজ বাটীতে ৩ বৎসর কাল বাস করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমানের মহারাণীর সহিত বনিবনা না হওয়াতে তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

পুত্রোৎসব।

১৭৮২ খৃঃ অব্দে নবকৃষ্ণের চতুর্থ স্ত্রীর গর্ভে একটীমাত্র পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। ইনিই রাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুর। পুত্রের জন্ম গ্রহণ উপলক্ষে মহারাজা নবকৃষ্ণ সহর ও মফঃস্বলের প্রজাদিগের বাকি খাজনা রহিত করেন। এবং দরিদ্রদিগকে খাদ্য সামগ্রী ও অনেক অর্থ দান করেন। কলিকাতাস্থ প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে এবং চতুষ্পাটিতে রৌপ্য ও তৈজস বাসনে সন্দেশ ও তৈল পূর্ণ করিয়া পাঠাইয়া দেন। পুত্রাভিলাষে তিনি ক্রমে ক্রমে ৭টী বিবাহ করেন। তন্মধ্যে কেবল তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে একটী কন্যা এবং অনেক দিন পরে উপরোক্ত চতুর্থ স্ত্রীর গর্ভে একটী পুত্র ও ২টী কন্যা জন্মিয়াছিল। তিনি অধিক বয়স পর্য্যন্ত পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিত হওয়ায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামসুন্দরের পুত্র গোপীমোহনকে প্রথমে দত্তকরূপে গ্রহণ করেন। পরে বৃদ্ধ বয়সে রাজকৃষ্ণ নামে তাঁহার এই একমাত্র পুত্র জন্মে। ইহার ২ বৎসর পরে (১৭৮৪ খৃঃ অব্দে) তাঁহার

দত্তক পুত্র গোপী মোহনের একটী পুত্র জন্মে, ইহাতে তাঁহার আর আহ্লাদের সীমা ছিল না। এই উপলক্ষে তিনি মুক্ত হস্ত হইয়া অপরিসীম দান করিয়াছিলেন। নবকৃষ্ণের এই পৌত্রই শব্দকল্পদ্রুম্ প্রণেতা হিন্দু সমাজ চূড়ামণি রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর।

১৭৯১ খৃঃ অব্দে মহারাজ নবকৃষ্ণ খানাকুল নিবাসী কুলীন শ্রেষ্ঠ রামানন্দ বসু মহাশয়ের কন্যার সহিত স্বীয় পুত্র রাজকৃষ্ণের পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করেন। বিবাহের সুবিধার জন্য পাত্রীকে সিমুলীয়াতে আনয়ন করা হয়, সুতরাং শোভাযাত্রার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। এই বিবাহ উপলক্ষে স্বয়ং গবর্ণর জেনারেল, কমণ্ডার-ইন-চিফ প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন রাজপুরুষেরা বরযাত্র হইয়া মহারাজের সম্মান বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। নবকৃষ্ণ "রাজা বাহাদুর" উপাধি পাইবার সময় মসনাব পঞ্চহাজারী এবং "মহারাজা বাহাদুর" উপাধি পাইবার সময় মসনাব সাহ হাজারী মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। এতদনুসারে তাঁহার প্রথমে ৩০০০ এবং পরে ৪০০০ অশ্বারোহী সৈন্য ব্যবহারের যে সত্ব ছিল, তাহা তিনি কেবল এই সময়ে কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ হইতে চারিসহস্র অশ্বারোহী সৈন্য আসিয়া তাঁহার দ্বারে সমবেত হইয়া এই বিবাহ অভিযানে বরের সহগামী হয়। এবং দেশের এমন কোন বড় লোক ছিলেন না যিনি এই বিবাহে বরযাত্র না হইয়াছিলেন। এরূপ শোভা-যাত্রা কথনও এদেশে হয় নাই। ইহার কিছুদিন পরে নবকৃষ্ণ তাঁহার পৌত্র রাধাকান্তের মহাসমারোহে বিবাহ দিয়া গোষ্ঠীপতিত্ব লাভ করেন। বিবাহের পর তিনি নানা স্থান হইতে কুলীন কায়স্থ ও কুলাচার্য্য দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে নবকৃষ্ণকে একাদশ গোষ্ঠীপতি বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক বরণ করেন।

কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের "মহারাজা" উপাধি ছিল। কিন্তু বর্দ্ধমানের রাজার "মহারাজাধিরাজ বাহাদুর" উপাধি থাকায় তিনি

মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুন্ন ছিলেন। নবকৃষ্ণের অনুগ্রহে কৃষ্ণচন্দ্র "মহারাজা রাজেন্দ্র বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। এবং প্রত্যুপকার স্বরূপ তিনি নবকৃষ্ণকে শ্রীরামপুর ও মূলাজোড় গ্রাম প্রদান করেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। তিনি তাঁহার অগ্রজদ্বয়কে "রায়" এবং রাধাকান্ত তর্কবাগীশকে" "পণ্ডিত প্রধান" উপাধি দেওয়াইয়া ছিলেন। দিল্লীর বাদসাহ মির্জ্জাসি গুফ্‌তা বক্ত বাহাদুরের দ্বারা স্বীয় শিশুপুত্র রাজা রাজকৃষ্ণকে "রাজা বাহাদুর" উপাধি দেওয়ান। নবকৃষ্ণের স্বধর্ম্মে বিশেষ আস্থা ছিল এবং তিনি আত্মীয় স্বজনের শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। তিনি নিয়মিত পূজাদি করিতেন এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁহার বিশেষ ভক্তি ছিল। সাহায্যপ্রার্থী হইলে কেহ তাঁহার নিকট বিমুখ হইতেন না। নিজ সৌভাগ্যবলে তিনি মহারাজা হইলেও গুরুজনদিগের মান্য রক্ষার্থে নগ্নপদে তাঁহাদের সম্মুখীন হইতেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক নকুধর যত দিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি তাঁহার ভবনে পদব্রজে গমন করিতেন।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত নবকৃষ্ণের মধ্যে মধ্যে বেশ রহস্য চলিত। নবকৃষ্ণের প্রতিদিন ক্ষৌর কর্ম্মের জন্য দুইজন সুনিপুণ প্রামাণিক ছিল। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইহাদের নৈপুণ্যের কথা শুনিয়া নবকৃষ্ণের নিকট এক পত্রবাহক প্রেরণ করেন। পত্রের চতুষ্কোণে চারিটী "ক" এবং মধ্যস্থানে "অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠাইয়া দিবেন।" এই লেখা ছিল। এই লিপিখানির মর্ম্ম নবকৃষ্ণ বা তাঁহার সভার সভ্যেরা কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। তখন অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন জগন্নাথ তর্ক পঞ্চাননকে আনয়ন করিবার জন্য ত্রিবেণীতে ভাউলিয়া প্রেরিত হয়। তিনি উপস্থিত হইলে তাঁহার হস্তে কৃষ্ণচন্দ্রের লিপিখানি প্রদত্ত হয়। জগন্নাথ পত্র খুলিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। তিনি নবকৃষ্ণকে বলিলেন, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র আপনার নিকট

(ক+চারি=কচারি বা কচ+অরি) প্রামাণিক দ্বয়কে প্রেরণ করিবার কথা লিখিয়াছেন। তদনুসারে ক্ষৌরকারদ্বয় কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হইলে মহারাজা ইহাদের কার্য্যনৈপুণ্য দেখিয়া চমৎকৃত হন এবং প্রত্যাবর্ত্তন কালে তাহাদিগকে বিশেষরূপে পারিতোষিক প্রদান করেন।

মৃত্যু ও কীর্ত্তি।

১৭৯৭ খৃঃ অব্দে ২২ শে নবেম্বর নবকৃষ্ণ ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। কি রোগে তাঁহার মৃত্যু হয় তাহার স্থিরতা নাই। আহারাদির পর তিনি সুস্থ শরীরে বেলা দুইটার সময় শয়ন করেন। তৎপরে কখন কিরূপে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয় তাহা কেহ জানিতে পারেন নাই। শেষে তাঁহার পরিজনবর্গ সন্ধ্যাকালে তাঁহাকে শয্যাতে মহানিদ্রায় অভিভূত দেখিয়া শোক সাগরে নিমগ্ন হইলেন। নবকৃষ্ণ দেখিতে গৌরবর্ণ, নাতিখর্ব্ব, নাতিদীর্ঘ, নাতিস্থূল, নাতিক্ষীণ ছিলেন। তাঁহার মস্তক উড়িয়াদের মত কামান এবং একটী কেশ শিখা ছিল। তাঁহার পৌত্র রাধাকান্তদেবের অবয়বের সহিত তাঁহার প্রকৃতির অনেকটা সাদৃশ্য ছিল। তিনি সামান্য ধুতি পরিধান করিয়া স্কন্ধদেশে গাত্রমার্জ্জনী রাখিয়া পদব্রজে প্রতিদিন গঙ্গাস্নানে যাইতেন। কান্ত খানসামা নামে তাঁহার একজন পরিচারক ছিল। সে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া ছত্র ধারণ করিত। ইহাঁদের দুই জনের প্রতিমূর্ত্তি প্রদত্ত হইল। সেকালের সেই ক্রোরপতি নবকৃষ্ণ কত দয়ালু ও উদার প্রকৃতি ছিলেন, তাহা তাঁহার প্রতিকৃতি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি রাজকর্ম্মচারী, সুতরাং যখন রাজদ্বারে গমন করিতেন, তখন তিনি পাকড়ি বাঁধিয়া লপেটা পাদুকা পরিয়া, মেরজাই বা বেনিয়ানের উপর চাপকান পরিয়া, ঝালর যুক্ত শিবিকারোহণে আফিসে গমন করিতেন। আসাষরদার প্রভৃতি অগ্র পশ্চাৎ থাকিয়া গমন করিত। তৎকালে রাজাদেশ ব্যতীত

কাহারও ঝালরদার পাল্কী ব্যবহার করিবার হুকুম ছিল না। ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে ষ্টুয়ার্ট কোংর কারখানা হইতে তিনি প্রথমে একখানি শকট নির্ম্মাণ করান। যদিও সে গাড়ীখানি বর্ত্তমান সময়ের দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর অপেক্ষা উত্তম ছিল না, তথাপি অশ্বচালিত সেই অপরূপ নূতন জিনিষ দেখিবার জন্য রাজবর্ত্মে লোকারণ্য হইয়াছিল।

তিনি যেমন দেশের মধ্যে একজন ধনবান্ ও মান্যবান্ ব্যক্তি ছিলেন, তেমনি তিনি রাজোচিত অনেক গুলি কার্য্য করিয়া অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া যান। পূর্ব্বে অর্ণব পোত সকল চাঁদপাল ঘাট পর্য্যন্ত আসিতে পারিত না, ডায়মণ্ড হারবারের নিকট কলাগাছিতে নঙ্গর করিত। সেখান হইতে কলিকাতায় মাল আমদানী করিবার এবং লোকের গমনাগমন করিবার পথ না থাকায় বিশেষ অসুবিধা ছিল। সেই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য তিনি বেহালা হইতে কুল্পী (ডায়মণ্ড হারবার) পর্য্যন্ত ১৬ ক্রোশ দীর্ঘে "রাজার জাঙ্গাল" নামে রাজপথ প্রস্তুত করাইয়া দেন। ইহা তাঁহার একটী বদান্যতার কার্য্য।

তৎপরে ইংরাজদিগের একটীও ভজনাগার না থাকাতে উপাসনা করিবার বিশেষ অসুবিধা হইত। পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহা ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে সিরাজুদ্দৌলার অনুমত্যনুসারে ভগ্ন হইয়াছিল। এক্ষণে নূতন গির্জ্জার অত্যাবশ্যকতা বোধ হওয়ায় হেষ্টিংস বাহাদুর ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে একটী সভা করেন। তাহাতে ৩৬০০০৲ টাকা চাঁদা উঠে, নবকৃষ্ণ একা ৪৫০০০৲ টাকা দান করেন। উক্ত টাকাতে পুরাতন গোরস্থান ও মেগাজিনের ভূমি ক্রয় করা হয়। এই গির্জ্জাটীর নাম সেণ্টজন্সচর্চ্চ। গৌড় নগরের ভগ্নাবশেষ হইতে প্রস্তর আনাইয়া ইহার চূড়া নির্ম্মিত হয়, তজ্জন্য ইহাকে "পাথুরে গির্জ্জা" কহে। ইহারই প্রাঙ্গণে কলিকাতা স্থাপয়িতা জব চার্ণকের সমাধি আছে। এই গির্জ্জা নবকৃষ্ণের দ্বিতীয় বদান্যতার কাজ।

তিনি নিজ নামে নিজ ব্যয়ে একটী রাস্তা প্রস্তুত করেন। ইহা চিৎপুররোড হইতে অপার সারকুলার রোড পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তৎপরে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইবার পর ইহার পূর্ব্বাংশের নাম হাতী বাগান ষ্ট্রীট হয়। ইহার পর আবার গ্রেষ্ট্রীট হওয়াতে ইহার কিয়দংশ উক্ত রাস্তা ভুক্ত হইয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, আদিরাস্তার অর্দ্ধাংশ মাত্র। সেই সময় গঙ্গাস্নানের উপযুক্ত ঘাট না থাকা প্রযুক্ত তিনি বাগবাজার ও কুমারটুলির অধিবাসী বর্গের স্নানের সুবিধার জন্য দুইটি ঘাট প্রস্তুত করাইয়া দেন। শেষোক্ত স্থানে তাঁহার প্রথমা স্ত্রী মুমূর্ষু ব্যক্তিদিগের বাসের জন্ত একটী অট্টালিকা (গঙ্গাযাত্রীর বাটী) প্রস্তুত করাইয়া দেন।

হেষ্টিংস মুসলমানদিগের শিক্ষার জন্য কলিকাতায় মাদ্রাসা নামক একটী মুসলমান কলেজ স্থাপন করেন। এই মাদ্রাসা কলেজ প্রতিষ্ঠার অর্থও নবকৃষ্ণ দান করিয়া ছিলেন। এই কলেজ অদ্যাবধি কলিকাতায় বর্ত্তমান। যদিও নবকৃষ্ণের অর্থোপার্জ্জন প্রধানতঃ অসদুপায়ে হইয়াছিল, তথাপি এই সকল সদ্ব্যয়ে ও পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা তাঁহার সমস্ত দোষ প্রশমিত হইয়াছিল। এক ব্যক্তি যে কোন প্রকারেই অর্থোপার্জ্জন করুন না কেন, উপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যয় করিয়া দেশের উন্নতি সাধন করিলে সকলে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করেন। যে ধনলিপ্সা সভ্যতম ইংলণ্ডের সুশিক্ষিত ক্লাইভ, ভান্সিটার্ট, হেষ্টিংস প্রভৃতি সংযম করিতে পারেন নাই, তাহা যে অর্দ্ধশিক্ষিত নবকৃষ্ণ, রামচাঁদ (আন্দুলের রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ) গঙ্গাগোবিন্দ (পাইকপাড়া রাজবাটীর) গোকুলচন্দ্র (ভূকৈলাশ রাজবাটীর) প্রভৃতি সংবরণ করিতে সক্ষম হইবেন, তাহা কখনও আশা করিতে পারা যায় না। যাঁহারা সিরাজের টাকা বিভাগ করিয়া লইয়া ছিলেন, তন্মধ্যে নবকৃষ্ণই অর্থানুরূপ বদান্য ছিলেন। বিদ্যাবুদ্ধি এবং রাজনীতিজ্ঞতায় তৎকালে কেহই তাঁহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন না।

নবকৃষ্ণের সঙ্গীত বিদ্যাতেও বেশ অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদ ও বাদকদিগকে অতিশয় আদর করিতেন। মুরশীদাবাদ, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী প্রভৃতি স্থানের প্রসিদ্ধ গায়কগণ সর্ব্বদা তাঁহার নিকট নিমন্ত্রিত হইয়া আশাতিরিক্ত পারিতোষিক পাইতেন। এতদ্ভিন্ন এদেশীয় সঙ্গীতজ্ঞেরা সর্ব্বদা তাঁহার সভায় উপস্থিত থাকিয়া মাসিক সাহায্য পাইতেন। তাঁহার সাহায্যে রামনিধি গুপ্ত (নিধু বাবু) কবির দল, আখড়াই গান ইত্যাদি সৃষ্টি করেন। এই সময়ে হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী (হরু-ঠাকুর), নিতাই বৈষ্ণব প্রভৃতি কবিওয়ালারা তাঁহার সভায় প্রতিপালিত হইতেন। তিনি ইঁহাদের সঙ্গ বড় ভাল বাসিতেন।

নবকৃষ্ণ যেমন চতুর, কার্য্যদক্ষ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন, তেমনি বিদ্যানুরাগী, দয়াবান্ ও আশ্রিত-প্রতিপালক ছিলেন। আত্মীয় স্বজনের প্রতিও তাঁহার স্নেহ মমতা যথেষ্ট ছিল। অনেক দূর-সম্পর্কীয় কুটুম্বও তাঁহার বাটীতে গ্রাসাচ্ছাদন ও আশ্রয় পাইত। দেবদেবী ও ব্রাহ্মণগণকে তিনি প্রগাঢ় ভক্তি করিতেন। তিনি যেমন ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিলেন, তেমনি সকল লোকের নিকট বিনয়ীও ছিলেন। অহঙ্কার বা আত্মশ্লাঘা কখনও তাঁহার ছিল না। কিন্তু কোন গুরুজন বা মান্যবান্ ব্যক্তির নিকট যদি বৃথা তিরস্কৃত বা লাঞ্ছিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার আর অভিমান রাখিবার স্থান থাকিত না। এক সময়ে হেষ্টিংস বাহাদুর তাঁহাকে একখানি কাগজ সহি করাইবার জন্য রায় রায়াঁ রাজবল্লভের নিকট পাঠাইয়া দেন, কিন্তু অহঙ্কারী রাজবল্লভ তাঁহাকে বসিতে না বলিয়া কাগজখানি পাঠ করিতে বলিলেন। তিনি দণ্ডায়মান হইয়া সেই কাগজ পাঠ করেন, তৎপরে তাহা সহি করাইয়া হেষ্টিংসকে প্রত্যর্পণ করিলেন। এই অপমানের জন্য তিনি উক্ত স্বাক্ষরিত কাগজের সহিত নিজ পদত্যাগের দরখাস্ত পেশ করিলেন। হেষ্টিংস উহা পাইয়া চমকিত হইয়া তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহাকে আশ্বাস

প্রদান করেন। তৎপরে হেষ্টিংস এই নিয়ম প্রচারিত করিলেন যে, এদেশীয় কোন ব্যক্তি আর কাউন্সিলের সভ্য হইতে পারিবেন না। এই নিয়মে রাজবল্লভের পদত্যাগ হইল।

নবকৃষ্ণের প্রতি ষষ্ঠীদেবী প্রথমে যেমন প্রতিকূল ছিলেন, তেমনি শেষকালে তাঁহার পুত্রের সমন্ধ হইতে বিশেষ অনুকূল হইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি সাতটী স্ত্রী, দত্তক পুত্র গোপীমোহন, তদীয় পুত্র রাধাকান্ত দেব এবং নিজ পুত্র রাজকৃষ্ণ ও বধূমাতাগণকে রাখিয়া যান। শেষে তাঁহার একমাত্র পুত্র রাজকৃষ্ণের ঔরসে ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রীর গর্ভে শিবকৃষ্ণ, কালীকৃষ্ণ, দেবকৃষ্ণ, অপূর্ব্বকৃষ্ণ, মাধবকৃষ্ণ, কমলকৃষ্ণ, নরেন্দ্রকৃষ্ণ ও যাদবকৃষ্ণ নামে আটটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। ক্রমে উহাঁদের ঊনবিংশতি জন প্রপৌত্র, সপ্ত বিংশতি জন বৃদ্ধ প্রপৌত্র, অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র প্রভৃতি এবং রাধাকান্ত দেবের বংশধরগণের শাখা প্রশাখার দ্বারা রাজ প্রাসাদ ভিন্ন ভিন্ন অট্টালিকায় পরিপূর্ণ হইয়া সেই ক্ষণজন্মা মহাত্মা নবকৃষ্ণের নাম স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এক বাড়ীতে একজনের এত বংশধর খুব কম লোকের ভাগ্যে হইয়া থাকে। সুতরাং নবকৃষ্ণের ন্যায় ভাগ্যবান্ এ মর-জগতে অতি বিরল। তাঁহার যথার্থই ধনে ও পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হইয়াছিল।





সত্যনিষ্ঠ কৃষ্ণপান্তি।

যখন বঙ্গদেশ বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া নব প্রতিষ্ঠিত ইংরাজ আধিপত্যে শান্তিলাভ করিতে ছিল, তখন দুঃখ-দারিদ্র-পূর্ণ এক গৃহস্থের পর্ণকুটীরে এই ধর্ম্ম পরায়ণ মহাপুরুষের জন্ম হয়। ১৭৪৯ খৃঃ অব্দে অগ্রহায়ণ মাসে নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাট গ্রামে তিলিকুলে কৃষ্ণপান্তি জন্ম গ্রহণ করেন' ইহাঁর জীবনী পাঠ করিলে দেখা যায়, তাঁহার ন্যায় বিনয়ী, সত্যনিষ্ঠ ও ধর্ম্মভীরু লোক ইহ সংসারে অতি বিরল। অনেকের বিশ্বাস যে অধর্ম্ম ব্যতীত কেহ কখনও ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পারেন না, কিন্তু তিনি সত্য ও ন্যায়পথে থাকিয়া সামান্য ব্যবসা দ্বারা কিরূপে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। যথার্থই তিনি একজন প্রকৃত বিশ্বাসী, ধর্ম্মপ্রাণ, সরল ও সত্যবাদী ছিলেন। প্রবঞ্চনা বা কুটিলতা কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না। এই সত্যবাদিতা ও সরলতার গুণেই ইনি কালে প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণ পান্তির পিতার নাম সহস্ররাম পান্তি। তিনি অতি দরিদ্র ছিলেন, পান বিক্রয় করিয়া কোন রকমে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। ইহাঁদের উপাধি পাল, কিন্তু পান বিক্রয় করার জন্য পান্তি নামে অভিহিত হন। সহস্ররামের তিন পুত্র; কৃষ্ণচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র ও

নিধিরাম। ছেলেগুলি সব ছোট ছোট, কেবল কৃষ্ণপান্তিই একটু বড়। অর্থের অভাবে পিতা পুত্রগণকে বিদ্যাশিক্ষা দিতে পারেন নাই। সুতরাং বাল্যকালে কৃষ্ণপান্তির কিছুমাত্র লেখাপড়া শিক্ষা হয় নাই। রাণাঘাটের তিন ক্রোশ পূর্ব্বে গাংনাপুরের প্রতিহাটে সহস্ররাম নিজে মাথায় পানের মোট লইয়া বিক্রয় করিতে যাইতেন। একদিন বালক কৃষ্ণচন্দ্র পিতার নিকট আব্দার করিয়া বলিলেন "বাবা মুই হাটে যাব, মোরে একটা পানের মোট কোরে দাও, মুইও মাথায় কোরে নিয়েগে পান বেচবো।" কৃষ্ণ পান্তির কথা এইরূপই ছিল, বৃদ্ধবয়সেও তাঁহার জিহ্বার আড় ভাঙ্গে নাই। রাজাকে আজা, রামকে আম, ভাই শম্ভুকে শেম্বো বলিয়া ডাকিতেন। কেউ নাম জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন আমার নাম কেষ্ট পান্তি। যাহা হউক পুত্রের আব্দারে পিতা সহস্ররাম একটী ছোট মোট করিয়া দিলেন। এই দুই তিন ক্রোশ পথ দশ বৎসরের বালক কৃষ্ণ পান্তি মোট মাথায় করিয়া ভাই শম্ভুর হাত ধরিয়া অবলীলাক্রমে পিতার সঙ্গে হাটে চলিলেন। এই দিন হইতেই কৃষ্ণ পান্তির ব্যবসার প্রথম হাতে ঘড়ি হইল।

পিতা সহস্ররাম হাটে যাইয়া সর্ব্বপ্রথমে ছেলেদের কিছু জলযোগ করাইয়া, নিজেও কিছু খাইয়া শেষে পান বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। হাটের নিকটস্থ কোন এক ব্রাহ্মণ ইহাদের নিকট পান ক্রয় করিতে আসিয়া বালক কৃষ্ণ পান্তির পান বিক্রয় কালীন সাধুতা ও সরল ব্যবহার দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। এই ব্রাহ্মণের অনেকগুলি মোট ঘাট হওয়ায় কোমল প্রাণ বালক কৃষ্ণ পান্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে কয়েকটী মোট লইলেন। নিষেধ স্বত্বেও পান্তি মোট মাথায় করিয়া তাঁহার বাটীতে পৌছাইয়া দিতে চলিলেন। ব্রাহ্মণ পান্তির এইরূপ সরল ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া বালকের প্রতি বারংবার দেখিতে লাগিলেন—আহা! এই বালক রাণাঘাট হইতে তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া

আবার এতখানি পথ আমার বাটীতে মোট লইয়া আসিল। তপন-তাপে বদন শুষ্ক হইয়াছে, কিছু না খাইলে কি করিয়া আবার তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া রাণাঘাটে পৌছিবে। তজ্জন্য ব্রাহ্মণ বাড়ী পৌছিয়া কৃষ্ণ পান্তিকে আহার করাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই সেই কষ্ট সহিষ্ণু বালককে সম্মত করাইতে পারিলেন না। শেষে অনেক অনুরোধের পর বালক পান্তি বলিলেন, "হাট ভাঙ্গিলে বাড়ী যাইবার সময় খাইয়া যাইব।" এই বলিয়া পান্তি আবার হাটে পান বিক্রয় করিতে চলিয়া গেলেন। পান্তি মনে মনে ভাবিলেন ব্রাহ্মণের বাড়ী কি করিয়া অমনি প্রসাদ খাইব, তার পর ভাই শম্ভু সে এখনও খায় নাই, আর আমি দাদা হইয়া কি করিয়া ভাত খাইয়া বসি? এই সকল ভাবিয়া ক্ষুধার্ত্ত কৃষ্ণ পান্তি ক্ষুধা চাপিয়া রাখিয়া পিতাকে সকল কথা বলিলেন। এদিকে ব্রাহ্মণ দেখিলেন পান্তিরা তিনজন, একজন খাইবে আর বাকি দুইজন যে সতৃষ্ণ নয়নে বসিয়া থাকিবে, তাহাও ঠিক নহে। বিশেষ একটীত আরও ছেলে মানুষ। সুতরাং তিন জনেরই অন্নের যোগাড় করা যাক। এই ঠিক করিয়া ব্রাহ্মণ গৃহিণীকে তিনজনের আহারের বন্দোবস্ত করিতে বলিয়া আবার হাটে গিয়া তাহাদের বলিলেন, "ও পান্তি খুড়ো, তোমার ছেলে দুটী নিয়ে আমার ওখানে আজ পেসাদ পেতে যেও। তোমার ছেলেত পালিয়ে এল, কিছুতেই ভাত খেলে না, তা খুড় তুমি না গেলে হবে না, মুখের ভাত ফেলতে নেই।" হাট ভাঙ্গিলে সুহস্রারাম সেই ব্রাহ্মণের বাটী যাইয়া ছেলেদের লইয়া প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। সকলকারই অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছিল, সুতরাং তিনজনে পেট ভরিয়া খুব আহার করিলেন। ইহাদিগকে খাওয়াইয়া ব্রাহ্মণ যেন তৃপ্ত হইলেন। শেষে বলিলেন "পান্তিখুড়, যেদিন ছেলেদের লইয়া হাটে আসিবে সে দিন এখান থেকে পেসাদ পেয়ে যেও।" এই ব্রাহ্মণও শেষে একদিন কৃষ্ণপান্তির দ্বারা মহা উপকার পাইয়া ছিলেন, তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

কৃষ্ণপান্তি একটু বড় হইলে পিতা সহস্ররামের মৃত্যু হইল। পিতার মৃত্যুর পর সংসারের গুরুভার তাঁহার উপর সম্পূর্ণরূপে পড়িল। ছোট ভাই নিধিরাম বাল্যকালাবধি অক্ষম, সুতরাং কেবল মাত্র শম্ভুই তাঁহার দক্ষিণ হস্ত। তখন দুই ভ্রাতায় মিলিয়া গ্রামের নিকটবর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন হাটে যাইয়া পান, ছোলা, মটর, গম, সরিষা প্রভৃতি বিক্রয় করিতে লাগিলেন। তিন চারি ক্রোশের মধ্যে প্রত্যহ একটী না একটী হাট বসিত। সুতরাং তাঁহাদের প্রতিদিনই একটা না একটা হাটে যাইতে হইত। প্রত্যহ হাটে যাইয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন হইত, তাহাতে কোন রকমে জীবিকা নির্ব্বাহ হইত, কিছুই উদ্বৃত্ত হইত না। দেখিতে দেখিতে ত্রিশ বৎসর কাটিয়া গেল। সকলকার বিবাহ হইয়াছে, সংসার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, কাজেই কৃষ্ণপান্তির দুর্দ্দশা আর দূর হইল না। দরিদ্রতা রাক্ষসীর ভীষণ তাড়নে তিনি কেবল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন, আর একমনে ভগবান্‌কে ডাকিতেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ঈশ্বরানুরাগ, ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি এবং জপতপে নিষ্ঠা ছিল। একাগ্রতা ও মনের বল তাঁহার চিরকাল অক্ষুণ্ণ ছিল। জীবন সংগ্রামের দুর্জ্জয় ঘোর রোলে পড়িয়া এক দিনের জন্যও তিনি পূজা আহ্নিকের কার্য্য হইতে বিচলিত হন নাই। এই নিষ্ঠা ও একাগ্রতার ফলে ভগবানের অনুগ্রহ হইয়াছিল। ভাগ্যলক্ষ্মী ক্রমশঃ তাঁহার সম্মুখবর্ত্তিনী হইতে লাগিলেন।

অদৃষ্টের সূত্রপাত।

একদিন কৃষ্ণপান্তি চূর্ণি নদীতে স্নান করিতে গিয়া দেখিলেন যে, এক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ জলে দণ্ডায়মান হইয়া স্নানান্তে একমনে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছেন। তিনি তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া কিয়দ্দূরে স্নান করিতে লাগিলেন, তৎপরে তিনি নিজে জপ আহ্নিক সারিয়া উপরে উঠিয়া দেখেন যে, একটী পুঁটুলি পড়িয়া আছে। তিনি ভাবিলেন "এ

নিশ্চয় সেই ব্রাহ্মণের জিনিষ তাড়াতাড়িতে ফেলে গেছেন”। তিনি ব্রাহ্মণকে চারিদিকে খুঁজিলেন কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তখন অগত্যা সেই পুঁটলিটী লইয়া তিনি একটী বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইলেন। স্নান করিয়া আর বাটীতে আহার করিতে যাওয়া হইল না, পাছে ব্রাহ্মণ আসিয়া ফিরিয়া যান। পুঁটলি খুলিয়া দেখেন, তাহার মধ্যে ১৫০৲ টাকা, খানকতক রূপার গহনা আর দুই তিন খানি নূতন কাপড়। ইহা দেখিয়া সরল হৃদয় কৃষ্ণপান্তি কাঁদিয়া ফেলিলেন, ভাবিলেন—“আহা এ সব ব্রাহ্মণ মেয়ের বের জন্য যোগাড় করেছে এখুনি আসবে।” এই ভাবিয়া পুঁটলিটী বুকে করিয়া বসিয়া রহিলেন।

পান্তি বসিয়া ভাবিতেছেন, এমন সময় শম্ভু আসিয়া ডাকিল “দাদা বেলা হয়েচে ভাত খাবেনা, এখানে বসে কি করছ”?—শম্ভুকে দেখিয়া পান্তি বলিলেন “ওরে শেম্ব, আমার এখানে দরকার আছে, আমি যাব না, তুই ভাতটা নিয়ে আয়, মুই এখানে খেয়ে লি।” শম্ভু কিছু না বলিয়া ভাত আনিতে গেল, নিকটেই বাড়ী। কিছুক্ষণ পরে শম্ভু ভাত আনিয়া জল ছিটাইয়া অন্নপাত্র রাখিল। পান্তি আহারে বসিলেন, খাওয়ার পর শম্ভু পাথরখানি চূর্ণি নদীতে ধুইয়া বাটী চলিয়া গেল। পান্তি ব্রাহ্মণের আশায় সমস্ত দিন সেই বৃক্ষমূলে বসিয়া রহিলেন, তথাচ ব্রাহ্মণের দেখা নাই। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত, পান্তি চূর্ণিতে জপ সমাপন করিয়া ইতস্ততঃ পদচারণা করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! ব্রাহ্মণের কি এখনও পুঁটলির কথা মনে পড়ে নাই। ক্রমে গাঢ় নিশায় অন্ধকার ঘনীভূত হইল। ঝিল্লীর রবে বনস্থলী মুখরিত হইল। মধ্যে মধ্যে পেচকের কর্কশ স্বরে ও শিবারবে সুপ্ত প্রকৃতির চমক ভঙ্গ করিয়া দিতে লাগিল। সেই অন্ধকার মধ্যে মশকাদি কীট দংশন সহ্য করিয়া পান্তি বৃক্ষমূলে পুঁটলী ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন, কতক্ষণে ব্রাহ্মণ আসিবেন। কি কষ্ট সহিষ্ণুতা! কি স্বার্থত্যাগ! কি পরসেবা-

পরায়ণতা! জগতে এরূপ ধর্ম্মভীরু, নির্লোভী কয়জন দেখা যায়? রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, মধ্যে মধ্যে তন্দ্রা আসিতেছে, এমন সময় দ্রুতপদ-বিক্ষেপের শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। পান্তি দূর হইতে দেখিলেন কে যেন আসিতেছে। শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া পান্তি উঠিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন সেই ব্রাহ্মণই বটে। "আঃ বাঁচলাম, মুই খালাস পেলাম।" তৎপরে একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন "কি ঠাকুর এত রাত্রে এখানে কেন?" ব্রাহ্মণ বলিলেন আর বাবা আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমি টাকার পুঁটুলি ফেলে গেছি" এই বলিয়া তিনি নদীর কিনারায় ইতস্ততঃ খুঁজিতে লাগিলেন। শেষে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, নাঃ সে কি আর পাওয়া যায়, এ সেই কেলে ভূতটা নিয়ে গেছে।

পান্তি তখন একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন "এই যে মুই সে কেলে ভূত, তোমার পুঁটলিতে কি আছে বলতে পার ঠাকুর, তা হলে একবার চেষ্টা করে দেখি।" ব্রাহ্মণ শিরে করাঘাত করিয়া হতাশ স্বরে বলিলেন, "আর বাবা মিছে খোঁজা, তাতে ১৫০ টাকা ছিল, রূপার গহণা কাপড় চোপড় ছিল। সে যে পেয়েছে সে কি আর দেবে রে, আঃ ভগবান্!" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ কাতরনেত্রে চারিদিকে পুঁটলির অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তখন কোমল প্রাণ কৃষ্ণ পান্তি পুঁটলিটী বাহির করিয়া ব্রাহ্মণকে দেখাইয়া বলিলেন "এই দেখ দেখি ঠাকুর, এইটি সেই পুঁটলি কি না?" ব্রাহ্মণ দেখিয়াই "আঃ বাঁচালি বাবা" বলিয়া উঠিলেন। তখনই ব্রাহ্মণ পুঁটলি খুলিয়া দেখেন যে তাঁহার টাকা গহনা কাপড় সব ঠিক আছে। তখন ব্রাহ্মণ সব পাইয়া বলিলেন "বাবা আজ তুই আমার যে উপকার কল্লি তা তোকে আর কি আশীর্ব্বাদ করবো। আমার মান, মর্য্যাদা, জাত, কুল, সব রক্ষা হল। যদি ভগবান্ থাকেন তা হলে তিনি 'তোমাকে অতুল ঐশ্বর্য্য দেবেন।' এই

বলিয়া ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ করিয়া মনের আহ্লাদে দ্রুতপদে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। তখন পান্তি ব্রাহ্মণের পদানুসরণ করিয়া যাইতে যাইতে পশ্চাৎ হইতে বলিয়া উঠিলেন "সে কি বাবাঠাকুর, আমি পান্তি, পান বেচে একবেলা খাই, আমার ঈশ্বয্যি হবে কেমন ক'রে?" ব্রাহ্মণ পশ্চাৎদিকে ফিরিয়া আবেগ ভরে বলিলেন "বিশ্বাস ক'রো বাবা, ভগবান্ উপরে আছেন, তিনি তোমায় নিশ্চয় ঐশ্বর্য্য দিবেন। ব্রাহ্মণের বাক্য সত্য জেন।"

এই বলিয়া তিনি চলিতে চলিতে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন "ওঃ কি আশ্চর্য্য, গরিব পান্তি পান বেচে একবেলা খায়, আর এতটা টাকার লোভ সাম্‌লালে! আর সেই তখন থেকে এত রাত্রি পর্য্যন্ত আমার অপেক্ষায় বসে ছিল! ওঃ কি নির্লোভ, কি ধর্ম্ম পরায়ণ! মা জগদম্বা, পুঁটলিটা না পেলে কি ক'রতুম মা, এ তোর জানা লোক মা, তাই লোভ ক'ল্লেনা, পুঁটলিটী ফিরাইয়া দিলে। দেখিস মা, ব্রাহ্মণের মান রাখিস মা, যেন আশীর্ব্বাদটা ফলে। মা ব্রহ্মময়ী, দোহাই মা, এমন ধার্ম্মিকের যেন ভাল হয় মা।" এই রকম নানা আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে ব্রাহ্মণ দ্রুতগতিতে প্রস্থান করিলেন। পান্তিও ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া গৃহাভিমুখে মনের আনন্দে প্রস্থান করিলেন। পান্তি-জীবনের ইহা একটী প্রধান মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্বের কার্য্য। গরিব হইয়া এরূপভাবে আত্মসংযম কয়জন করিতে পারেন? পরের জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া স্বার্থশূন্য হইয়া কয়জন এরূপভাবে নির্লোভ চরিত্র দেখাইতে পারেন? ধন্য পান্তি, ধন্য তোমার হৃদয়! ব্রাহ্মণের এই মনের সহিত আশীর্ব্বাদ পান্তির সৌভাগ্যের মূলীভূত কারণ হইয়াছিল।

রাণাঘাটের দেড়ক্রোশ দক্ষিণে কায়েত পাড়া নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ঐ গ্রামে কতকগুলি "তুষকোটা" তিলি বাস করে। তাহারা বলদ চাল্মানের ব্যবসায় করিত। কৃষ্ণপান্তি তাহাদের সঙ্গে মিলিত

হইয়া ঐ কার্য্য আরম্ভ করিলেন। কোন স্থানে কোন জিনিষ সস্তা পাইলে তাহা বলদের পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া যেখানে সেই জিনিষ মহার্ঘ সেই স্থানে গমন করিয়া বিক্রয় করিতেন। এইরূপে তাঁহার আয় কিছু বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি প্রায়ই চাউল, ছোলা, মটর, গম, যব, সরিষা প্রভৃতি কেনা বেচা করিতেন। পান বিক্রয় ব্যতীত ঐ সকল কারবারে পূর্ব্বাপেক্ষা একটু অবস্থা ফিরিয়াছিল।

কিয়দ্দিবস পরে কৃষ্ণপান্তির গুরুঠাকুরের মাতৃবিয়োগ উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন আমি অতি গরিব, দিন আনি দিন খাই, এক্ষেত্রে কিরূপে আমার মান রক্ষা হইবে'। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে এক সরা লবণ অতি কষ্টে সংগ্রহ করিরা গুরুগৃহে চলিলেন। শ্রাদ্ধবাড়ী মহা ধুমধাম, এমন সময় তিনি নুনের সরাটি রাখিয়া গুরু দেবকে প্রণাম করিলেন। কেবল নুনের সরাটি দেখিয়া গুরুদেব রাগিয়া যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিয়া অজস্র গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পান্তি কোন কথা না বলিয়া এক পার্শ্বে বসিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে লাগিলেন, আর ভাবিতে লাগিলেন "আমি গরিব, কিছু দিতে পারিলাম না বলিয়া এত তিরস্কার খাইলাম। ঠাকুরের মার শ্রাদ্ধ, কতলোকে কত কি দিতেছে, আর আমি দিলাম কি না, এক সরা নুন। যদি কিছু দিতে পারিতাম তাহা হইলে আর গালাগালি খাইতে হইত না। হায় রে, গরিবের মৃত্যুই শ্রেয়।" এমন সময় গুরুদেব পান্তির সম্মুখে আসিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন শ্রাদ্ধের পানগুলিও দিতে পারিলে না, দূর হ পাজি বেটা। সকলের সম্মুখে উপর্য্যুপরি এইরূপ অপমান করিতে লাগিলেন। পান্তি গুরুদেবের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া পলায়নের অবসর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বাটীর ভিতর গুরু ঠাকুর গমন করিলে পান্তি অমনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। গুরুগৃহ হইতে পান্তি পলায়ন করিয়া ভাবিলেন,—অর্থ না থাকিলে এইরূপেই লাঞ্ছিত হইতে হয়।

সুতরাং উপার্জ্জন না করিয়া আর বাটী ফিরিব না। এখন কোথায় যাই। অনেকক্ষণ চিন্তার পর ঠিক করিলেন, আড়ংঘাটায় গোঁসাই ঠাকুরের কাছে যাই।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র আড়ংঘাটায় "যুগল কিশোর" নামে এক দেব বিগ্রহ স্থাপন করেন; সেখানে অতিথি সেবা ও বহু যোগী সন্ন্যাসীর নিত্য আগমন হইত। সেই দেবমন্দিরের মোহান্ত বা অধ্যক্ষ ছিলেন গঙ্গারাম মোহান্ত। তিনি গোঁসাই ঠাকুর বলিয়াই পরিচিত। ঠাকুরের নামে যে সকল বিষয় ছিল, তাহা হইতে দেব সেবা ও অতিথি সেবা হইয়াও অনেক অর্থ উদ্বৃত্ত হইত। সুতরাং গোঁসাই ঠাকুর উক্ত অর্থ হইতে মহাজনী ও তেজারতি করিয়া অনেক বিষয় বাড়াইয়া ছিলেন।

এই আড়ংঘাটা একটা মস্ত কারবারের স্থান, এখানে প্রতি সপ্তাহে একটা করিয়া বড় হাট হয়। সেখানে কৃষ্ণপান্তি প্রতি হাটবারে পান ক্রয় করিতে যাইতেন। পান্তি গোঁসাই ঠাকুরদের পান যোগান। এই সূত্রে তাঁহার সহিত পান্তির বেশ ঘনিষ্ঠতা ও আলাপ পরিচয় হয়। পান্তি অসময়ে ঠাকুর বাটীতে আসিলে, গোঁসাই ঠাকুর বলিলেন, "কি হে পান্তি, আজ এমন অসময়ে বেবারে এখানে যে? এমন মনমরা শুকনো চেহারা কেন? আহারাদি হয়েছে? পান্তি মোহান্তকে প্রণাম করিয়া বলিলেন "আজ্ঞা না এখনও আহার হয় নাই" এই বলিয়া তিনি গুরুদেব কৃত লাঞ্ছনার বৃত্তান্ত সমস্ত নিবেদন করিলেন। মোহান্ত আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা আমি একটা উপায় স্থির করিয়াছি; তুমি আহারাদি কর, তার পর তোমাকে বলিব।

মোহান্ত ঠাকুরের আদেশে তৎক্ষণাৎ ভোগ প্রসাদ তথায় আনীত হইল। হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিয়া পান্তি আহারে বসিলেন, গোঁসাই ঠাকুর কাছে বসিয়া বেশ করিয়া তাঁহাকে আহারাদি করাইলেন। পান্তি গুরুঠাকুরকৃত লাঞ্ছনা ও গোঁসাইজীর ব্যবহার তুলনা করিতে লাগিলেন।

তিনি যথাসাধ্য আহারাদি করিয়া একটু বিশ্রাম করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মোহান্তজী বলিলেন। "দেখ কেষ্ট, আমার দুই গোলা ছোলা পচিতে আরম্ভ হইয়াছে। তুমি ঐ ছোলা ঝাড়াই করিয়া বিক্রয় কর। ইহার মূল্য স্বরূপ তুমি গোবিন্দজীউর এক দিনের ভোগের খরচ দিবে। তার খরচ ৯৵৹ নয় টাকা তের আনা মাত্র।" এই বলিয়া উক্ত গোলা দুইটির চাবি আনিয়া পাস্তির হস্তে দিয়া বলিলেন, "কিছু ভেব না, গোলা ঝাড়াই করিবার বন্দোবস্ত কর।"

চাবি লইয়া পাস্তি প্রথম গোলাটী খুলিবা মাত্র একটা ভয়ানক দুর্গন্ধ পাইলেন। দ্বিতীয় গোলায়ও ঐরূপ দুর্গন্ধ পাইয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন। তৎপরে এক স্থানের কিছু ছোলা সরাইয়া দুই হস্ত পরিমিত গর্ত্ত খনন করিবামাত্র ভাল ছোলা দেখিতে পাইলেন। তখন হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হইল, মনে উৎসাহ বাড়িল। তখন সেই ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ মনে পড়িল। দেখিলেন নীচেকার ছোলা সব ভাল, উপরে হাত খানেক পচ ধরিয়াছে মাত্র। দুইটি গোলারই একরূপ অবস্থা। সেই সময় মহান্তের কর্ম্মচারিগণ ছুটিয়া আসিয়া কর্ত্তাকে সংবাদ দিয়া বলিলেন, "মহাশয়, নীচের সমস্ত ভাল ছোলা, উপরে হাত খানেক পচ ধরিয়াছে মাত্র। এত ছোলা অমনি দেওয়া উচিত হয় না, একটা দাম ধরিয়া লউন, নচেৎ লোকসান হইবে।" তখন গোঁসাই ঠাকুর বলিলেন "সে কিহে—তোমরাই ত বলিয়া ছিলে যে সব ছোলা পচিয়া গিয়াছে, এখন যদি কৃষ্টের অদৃষ্টে ভাল ছোলা বাহির হইয়া থাকে, তাহা গোবিনজীর দয়া। আমি শুনিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলাম যে পাস্তিকে ভোগের খরচ বাটী হইতে আনিয়া দিতে হইবে না। নারায়ণের কৃপায় সে কিছু পায় ইহাই আমার ইচ্ছা। আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম, যাও এখন ছোলা ঝাড়াই করবার চেষ্টা দেখ।" কর্ম্মচারিগণের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না, তাহারা নিরাশ হৃদয়ে ফিরিয়া আসিয়া ছোলা ঝাড়াই করিবার বন্দোবস্ত করিতে

লাগিল। তাহারা চলিয়া যাইলে গোঁসাইজী মনে মনে বলিতে লাগিলেন "সব বেটারা চোর। কেউ কারুর ভাল দেখিতে পারে না। পান্তির অদৃষ্টে ভাল ছোলা বেরিয়েচে তা আর প্রাণে সহ্য হইতেছে না।" মোহান্ত ঠাকুরের আদেশ মত সমস্ত ছোলা ঝাড়াই বাছাই হইয়া প্রায় সাত আট হাজার মন পাওয়া গেল। অতঃপর কৃষ্ণপান্তির ভাগ্যতরুতে আশার অতিরিক্ত ফল ফলিতে আরম্ভ হইল।

১১৮৬ সালে (১৭৮০ খৃঃ অব্দে) কলিকাতা সহরে ছোলা দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় বড় মহার্ঘ হইয়া উঠিল। সেই সময় ছোলার ব্যবসায়ে বিলক্ষণ লাভ দেখিয়া বিস্তর মহাজন ছোলার অনুসন্ধানে চতুর্দ্দিকে গিয়াছিল। যাহারা আড়ংঘাটায় আসিয়াছিল, কৃষ্ণপান্তি তাহাদিগকে ছোলার নমুনা দেখাইয়া তিন প্রকার মূল্য ধার্য্য করিলেন। উত্তম ছোলা প্রতিমণ ২৲ টাকা, মধ্যমের ১৷৹ টাকা এবং ভুসির দাম ৷৶৹ আনা মাত্র। বায়না পত্র লেখা হইল, তিনি বায়নার টাকা লইয়া মহাজন দিগকে সমস্ত ছোলা মাপাইয়া দিলেন। দুই তিন দিনে সমস্ত বিক্রয় করিয়া পান্তি ন্যূনাধিক সাড়ে সাত হাজার টাকা লাভ করিয়াছিলেন। তার পর পান্তি মোহান্ত ঠাকুরের নিকট গমন করিয়া বলিলেন, "দাদাঠাকুর পাইলাম ত অনেক, এখন কত পূজা দিতে হইবে এবং আমি এত টাকা লইয়া কি করিব বলিয়া দিন।" গোঁসাই ঠাকুর বলিলেন "আমি ত বলিয়া দিয়াছি এক দিনের ভোগ দিতে হইবে। যদি সব ছোলা পচিয়া যাইত তাহা হইলেত এত টাকা লাভ পাইতে না। তোমার অদৃষ্টে পচার মধ্যে ভাল ছোলা বাহির হইল, কিছু পাইলে। সুতরাং এ টাকা সমস্ত তোমার। তুমি ইহার দ্বারা ব্যবসায় করিয়া নিজের দুঃখ দূর কর। তবে একটা কথা বলিতেছি, ব্যবসা স্থানটা ধর্ম্মস্থান বলিয়া মানিও, আর সমস্ত কর্ম্মের প্রথমে গোবিন্দজীকে স্মরণ করিও; কোন বিপদ্ হইবে না।" পান্তি ষোড়শ উপচারে যুগল কিশোরের পূজা

দিলেন, কিছু ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ভোজন করাইলেন। মোহান্ত ঠাকুর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন "তোমার যেন চিরকাল ধর্ম্মে মতি থাকে। আর এই অর্থ হইতে তুমি যেন ক্রোরপতি হও।" পান্তির তখন সেই ব্রাহ্মণের কথা মনে পড়িল। তাঁহারই আশীর্ব্বাদে আজ এতটা টাকা পাইলাম, আবার মোহান্ত ঠাকুর ক্রোরপতি হইবার আশীর্ব্বাদ করিলেন। দেখা যাক গোবিনজী কি করেন। কাহারও কাহারও মতে এবং "রাণাঘাটের বিবরণ" নামক পুস্তকে দৃষ্ট হয় যে, মোট ছোলা বিক্রয় করিয়া ১৩৮৭৫ টাকা হইয়াছিল। তন্মধ্যে মোহান্ত ৬১২৫৲ টাকা লইয়াছিলেন, আর কৃষ্ণপান্তি ৭।৫০ টাকা পাইয়াছিলেন। মোহান্ত একেবারে বিনামূল্যে সমস্ত ছোলা দান করেন নাই। যাহা হউক পান্তি মোহান্তের কৃপায় যে সাত, আট হাজার টাকা পাইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতঃপর পান্তি গোবিনজী ও মোহান্তের চরণে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। তৎপরে তিনি উপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা নানাবিধ কারবার করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই তাঁহার ব্যবসায় বিস্তৃত হইয়া পড়িল, এবং নানাস্থানে ব্যবসার কেন্দ্র খুলিতে লাগিলেন।

এইরূপে বিলক্ষণ কিছু উপার্জ্জন হইলে তিনি কলিকাতায় আসিয়া হাটখোলায় একটু জমীর পাট্টা লইয়া গৃহনির্ম্মাণ পূর্ব্বক একটী আড়ৎ খুলিলেন। ক্রমে একজন ব্যবসায়ীর মুখে শুনিলেন যে কোম্পানির পোক্তানে লবণ ক্রয় করিয়া বিক্রয় করিতে পারিলে বিলক্ষণ লাভের সম্ভাবনা। এই সন্ধান পাইয়া তিনি লবণ খরিদ বিক্রয় করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান থাকাতে চারিদিকে মান সম্ভ্রম বাড়িয়া গেল। জলের ন্যায় অজস্র অর্থ উপার্জ্জন হইতে লাগিল। এই সময় দোকানী পসারী, মুটে গাড়োয়ান, ঘেটেল প্রভৃতি সকলেই কৃষ্ণ পান্তিকে বড় মহাজন বলিয়া মানিতে লাগিল। সল্ট বোর্ডের সাহেবের নিকট তাঁহার এত সম্ভ্রম হইল যে, তাঁহার অনুপস্থিতিতে নিলাম বন্ধ থাকিত।

ক্রমে এমন হইয়া উঠিল যে, নিলামের সময় কৃষ্ণপান্তির ন্যায় অধিক লাট আর কেহই কিনিয়া উঠিতে পারিত না। নিলাম ঘরে কেবল কৃষ্ণপান্তিই সেক্রেটারির সম্মুখে চেয়ার পাইতেন। কৃষ্ণপান্তি সল্ট বোর্ডে যেমন সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, রেভিনিউ বোর্ডেও সেইরূপ তাহার খ্যাতি ছিল। তাঁহার সরল ব্যবহারে ও ধর্ম্মনিষ্ঠায় কি বণিক সম্প্রদায়, কি পোক্তান, কি চৌকির কর্ম্মচারিগণ সকলেই তাঁহার বশীভূত হইয়াছিল। তিনি বণিকগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি যাহা করিবেন তাহাই হইবে, যাহা না করিবেন তাহা হইবে না। তিনি হাটখোলার প্রধান কর্ত্তা বাবু বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। সহরে এমন কোন লোক ছিল না যে তাঁহাকে জানিত না। সামান্য দোকানদার হইতে লাট সাহেব পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহাকে জানিতেন যে, কৃষ্ণপান্তি একজন সরল হৃদয়, সত্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মপরায়ণ ও প্রধান বণিক। সেই ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে আজ পান বিক্রেতা পান্তি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি।

কৃষ্ণপান্তি লাভের যেমন যেমন টাকা পাইতেন তাহা বাটীতে ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। শম্ভুচন্দ্র ভ্রাতার প্রেরিত অর্থ হইতে কুটীর ভঙ্গ করিয়া প্রাসাদসম এক বিস্তৃত অট্টালিকা করিলেন। পিতা সহস্ররামের সময়ের সাবেক বাটীর আর কোন চিহ্ন নাই। এক্ষণে আবাস-বাটী, উদ্যান-বাটী, গোলাবাটী, গো-মহিষশালা, অশ্বশালা প্রভৃতি সকলই অট্টালিকাময় হইয়াছে। এসব ব্যাপার কৃষ্ণপান্তি কিছুই জানেন না। তিনি প্রতিজ্ঞাপূর্ণ করিয়া ষোল বৎসর পরে বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। এখন আর সে পর্ণকুটীর নাই, সেস্থানে বৃহৎ অট্টালিকা, সুতরাং পান্তি মহাশয় বাড়ী আসিয়া আর ঘর খুঁজিয়া পান না। পল্লীস্থ লোক সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাগা বাবু, এখানে পান্তিদের বাড়ী কোথা?" পাড়ার লোকেরা সেই অট্টালিকা দেখাইয়া বলিল "এই যে পান্তিদের বাড়ী, এখন আর সে কুঁড়েঘর নেই, ভগবান্ ঐশ্বর্য্য দিয়েছেন।"

কৃষ্ণপান্তি বাড়ীর প্রবেশ দ্বারে দেখেন যে বিস্তর দ্বারবান্, লোক জন সব রহিয়াছে। তিনি তথায় যাইয়া বলিলেন "হ্যাগা শেম্ভো ঘরে আছে? কথার ধরণে সবাই বুঝিল ইনিই কর্ত্তা বাবু। তখনি শম্ভুর নিকট সংবাদ গেল যে কর্ত্তা আসিয়াছেন। শম্ভু তাড়াতাড়ি আসিয়া দাদাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "তুমি এমন হঠাৎ এলে যে, আগে সংবাদ দিতে হয়, সব মঙ্গল ত?" কৃষ্ণপান্তি বলিলেন "সব ভাল কিন্তু তুই এত বড় আজার মত বাড়ী কল্লি, তা আমাকে একবারও বল্লিনি। আমরা মহা দারিদ্দির ছিলুম, হঠাৎ এত বড় বাড়ী কল্লি, দেশের লোকজনদের কি কল্লি! খালি নিজেদের সুখ দেখলে হয় না, এতে মহা পাতক হয়। গাঁয়ের লোকেরা বুঝি কেউ আমাদের নয়? ভগবান্ ঈশ্বয্যি দেন লোকেদের দুঃখু ঘুচুবার জন্যে, তা তুই কার কি কল্লি?" শম্ভু কিছু না বলিয়া বাটীর চতুর্দ্দিক দেখাইতে লাগিল। সমস্ত দেখিয়া পান্তি বলিলেন "কৈ রে ঠাকুর ঘর কৈ? হিঁদুর ছেলে ঠাকুর ঘর কল্লিনি? ঠাকুর পিতিষ্ঠে না হলে বাড়ী শুদ্দ্ হয় না। যে বাড়ীতে শালগেরাম ঠাকুর, গাই গরু, আর তুলসী গাছ নেই, সে বাড়ী হিন্দুর বাড়ী নয়। তুই এ কি কল্লি, ঠাকুর পিতিষ্ঠে না হলে এ বাড়ীতে আমি জল গেরণ কর্‌তে পার্‌ব না।" এই বলিয়া তিনি বাড়ী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। শম্ভু মহা অপ্রস্তুতে পড়িল। তখন শম্ভু বলিল "দাদা কি হবে? আমি এখুনি ঠাকুর প্রতিষ্ঠার বন্দোবস্ত করিতেছি, তুমি যেও না," পান্তি বলিলেন, "তা হবে না।" এই বলিয়া কৃষ্ণপান্তি প্রতিবেশী এক ব্রাহ্মণের পর্ণকুটীরে চলিলেন। সেখানে কিছু বেশী রকম দ্রব্যসামগ্রী পাঠাইবার জন্য শম্ভুকে বলিয়া যাইলেন। ব্রাহ্মণ বহুদিবস পরে কৃষ্ণপান্তিকে পাইয়া মহা আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। পান্তি মহাশয় ব্রাহ্মণের পদধূলি লইয়া বলিলেন ঠাকুর! "আমি আপনার বাটীতে দুই চারিদিন পেসাদ পাইব।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "বেশ ত ভাঁই ইহা আমার সৌভাগ্য।"

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে শম্ভুচন্দ্রের প্রেরিত দশজন লোক বাঁকে করিয়া নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ এই সমস্ত দ্রব্যাদি দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন; এবং কৃষ্ণ-পান্তিকে পুনঃ পুনঃ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। তৎপরে যথাসময়ে তিনি পান্তিকে আহারাদি করাইলেন। পান্তি সুস্থ হইয়া ব্রাহ্মণকে পর্ণ-কুটীর ভঙ্গ করিয়া অট্টালিকা করিতে পরামর্শ দিলেন, এবং তিনি সমস্ত ব্যয়ভার নিজ স্কন্ধে লইতে স্বীকৃত হইলেন। ব্রাহ্মণ পান্তির এই অযাচিত দানে মুগ্ধ হইয়া বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে কম্পিত হস্তে দুর্গা-নামের ঝুলিটি তাঁহার মস্তকে দিয়া অজস্র আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। পান্তি এইরূপ প্রতিদিন এক এক প্রতিবেশীর বাটী যাইয়া প্রত্যেকের অভাব মোচন করিতে লাগিলেন। পান্তির অর্থ সাহায্যে অনেকে আলস্য ত্যাগ করিয়া নানাবিধ কার্য্য করিতে লাগিলেন। এদিকে সপ্তাহ মধ্যে শম্ভুচন্দ্র বাটীর সম্মুখে দুইটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া মহা সমারোহে নারায়ণ ও শিব প্রতিষ্ঠা করিলেন। এতদুপলক্ষে বহু ব্রাহ্মণ ও দরিদ্র-গণের সেবা ও প্রচুর অর্থ দান করা হইল; এবং পান্তি সেই গুরু ঠাকুরকে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে জমী ও অর্থ প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করিলেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যবসার দ্বারা কৃষ্ণপান্তির দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল। ক্রমে তিনি ভ্রাতার পরামর্শ মতে জমিদারীও খরিদ করিতে লাগিলেন। ইহাতে তিনি বঙ্গদেশের প্রায় প্রধান প্রধান জমীদারগণের সমকক্ষ হইয়া উঠিলেন। ১২০১ সালে তিনি মামজোয়ান পরগণা ইজারা লইলেন। ১২০২ সালে যশোহরের অন্তর্গত দোঁতো পরগণা খরিদ করিলেন। পরে তিনি চারি বৎসরের মধ্যে সাঁতর পরগণা, হলুদা পরগণা প্রভৃতি বহুসংখ্যক তালুক খরিদ করিয়াছিলেন। ১২০৬ সালে রাণাঘাট প্রায় সমস্ত ক্রয় করিলেন। পূর্ব্বে ইহা কৃষ্ণনগরের রাজাদিগের ছিল, কিন্তু চঞ্চলা লক্ষ্মী এখন পান্তি-গৃহে আসিলেন।

এইরূপে তিনি ক্রমে ক্রমে বহু জমিদারী খরিদ করাতে সণ্টবোর্ডের মত রেভিনিউবোর্ডেও তাহার অপরিসীম সম্মান লাভ হইতে লাগিল। ইহাতে তিনি অনেক জমীদারের চক্ষুঃশূল হইয়াছিলেন। তিনি দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, তদুপরি ছোট ময়লা কাপড় পরা থাকাতে তাঁহাকে অসভ্য কৃপণ বলিয়া জমীদারগণ বিদ্রূপ করিতেন। একবার তাঁহাকে অপদস্থ করিবার মানসে জমীদারগণ নিলামের সময় অনেক দর বাড়াইয়াদিলেন, ইহাতে কৃষ্ণপান্তি রেভিনিউ বোর্ডের অধ্যক্ষকে বলিলেন, "যে যত ডাকিবে, তাহার উপর আমার হাজার টাকা ডাক রহিল।" ইহাতে সকলেই বিস্মিত হইলেন। ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, সেই সময়ে তিনি কতদূর ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিলেন, এবং তৎকালবর্ত্তী বড়লোকদের অবস্থাই বা কিরূপ হইয়াছিল। তাঁহার উন্নতির চরম অবস্থা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

ব্যবসার উন্নতির স্রোতে পড়িয়া তাঁহার বাটী গমন বৎসরে দুই তিন-বার মাত্র হইত। একবার দুর্গাপূজার ষষ্ঠীর দিন, তিনি বাটী না আসিয়া সপ্তমীর দিন উপস্থিত হইলেন, ইহাতে তাঁহার স্ত্রী বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর করিলেন—"একদিন দেরিতে এলাম বটে, কিন্তু এক লক্ষ টাকা রোজগার করে নিয়ে এলাম।" তাঁহার অর্থাগম এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, যে টাকাগুলি লবণের গদি হইতে হস্তী ও বলদের পৃষ্ঠে ছালা বোঝাই করিয়া একটা ঘরে ধানের গাদার মত স্তুপাকৃতি করিয়া ঢালিয়া রাখা হইত। বাটীর বৌ, ঝি, পুত্র পরিবারবর্গ সকলে আপন আপন বার্ষিক টাকা গণিয়া না লইয়া কাটা পালী করিয়া মাপিয়া লইত। তাঁহার বিস্তৃত কারবার ও জমিদারীর আয়ে তিনি এরূপ ধন কুবের হইয়া উঠিয়াছিলেন, যে তৎকালে বঙ্গদেশে তাঁহার সমকক্ষ ঐশ্বর্য্য-শালী ও ভাগ্যবান্ অতি অল্প লোকই ছিলেন। ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে জগদম্বার কৃপায় যথার্থই তিনি ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন।

দান শক্তি।

১। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, যে তিনি অনেক প্রতিবেশীর গৃহাদি নির্ম্মাণ ও কর্ম্মপ্রদান করিয়া স্বগ্রামের বিস্তর উন্নতি করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পরের জন্য কিরূপ মুক্ত-হস্ত ছিলেন তাহা নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি হইতে জানা যায়। একবার লবণের দর কিছু সুবিধা বুঝিয়া বহুপরিমাণে খরিদ করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত টাকার উপর আরও তিন লক্ষ টাকা কর্জ্জের প্রয়োজন হইল। এই সময়ে কলিকাতার ধন কুবের রামদুলাল সরকারের তেজারতি অসীম বিস্তৃত ছিল। তাঁহার বাটীতে প্রত্যহ বহু-টাকার কারবার হইত। কৃষ্ণ পান্তি কর্জ্জ করিবার মানসে রামদুলাল সরকার মহাশয়ের বাটীতে গমন করিলেন। বেলা ২টার সময় তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, এক ব্রাহ্মণ দালানের সোপানের উপর বসিয়া তাম্রকুট সেবন করিতেছেন। তিনি প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণের পরিচয় লইয়া জ্ঞাত হইলেন যে, তিনি সরকার মহাশয়ের বাড়ীর পাচক। পরে তাঁহাকে বলিলেন "ঠাকুর, সরকার মশায় কি বাড়ীতে আছেন?" পাচক উত্তর করিলেন—"এখন কর্ত্তামহাশয় আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিতে-ছেন।" পান্তি বলিলেন, "ঠাকুর তুমি একবার দেখে এস, যদি জেগে থাকেন ত বোলো যে কেষ্টপান্তি এসেছে, একবার দেখা করবে।" পরি-ধানে সামান্য একখানি ছোট ধুতি ও স্কন্ধে একখানি চাদর মাত্র দেখিয়া ব্রাহ্মণ প্রথমে সামান্য লোক মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু নাম শুনিয়া তাড়াতাড়ি উপরে গিয়া কর্ত্তাকে সংবাদ দিলেন। কর্ত্তা মহাশয়ও তৎক্ষণাৎ নিম্নে আসিয়া বলিলেন—"নমস্কার পান্তি মহাশয়, সমস্ত মঙ্গল ত?" এই বলিয়া তিনি কৃষ্ণপান্তিকে বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন। উভয়ে নানা কথাবার্ত্তার পর পান্তি বলিলেন—"সরকার মশাই, আমার তিন লক্ষি টাকার দরকার হয়েছে, তাই মশায়ের কাছে এলাম।" রাম দুলাল

বলিলেন—তা বেশ ত কবে চাই? পান্তি বলিলেন কাল সকালে দরকার। রামদুলাল বলিলেন আচ্ছা ভাই, কাল একজন লোক পাঠিয়ে দিবেন, যখনই আসবে তখনি টাকা দিব। তখন পান্তি সরকার মহাশয়ের কাছ হইতে বিদায় লইলেন। যাইবার সময় সেই পাচক ব্রাহ্মণকে তাঁহার বাটীতে পায়ের ধূলা দিতে বলিয়া গেলেন।

সেই টাকা লইয়া লবণের কারবারে দুই চারি দিবসের মধ্যে কৃষ্ণ-পান্তির প্রায় চারিলক্ষ টাকা লাভ হইল। তিনি কর্ম্মচারীর দ্বারা রামদুলাল সরকারের ঋণের তিন লক্ষ টাকা সুদ শুদ্ধ পাঠাইয়া দিলেন। এবং কর্ম্মচারীকে বলিয়া দিলেন দেখ—"দুলোল সরকারের বাটীর আঁধুনি বামুনকে এখানে আস্‌তে বলেছিলাম। কৈ, আজও ত এলনা, তুমি আসবার সময় তাকে সঙ্গে করে এন।" কর্ম্মচারী চলিয়া গেলে পান্তি মনে মনে চিন্তাপ্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন—"বামুনের ছেলেটার মুখ দেখলেই মনে হয় ভাল ঘরের ছেলে, বড়ই গরিব ব'লে আঁধুনি বামুনের কাজ করে। যা'হোক ছেলেটা বড় পয়মন্ত, ওর মুখ দেখেইত দুলোলের কাছ থেকে টাকাটা পেলাম, আর তাইতে প্রায় চার লক্ষি টাকা লাভ হ'ল। ওকে কুড়িটে হাজার টাকা দেব।"

হাটখোলা হইতে শিমুলিয়া বেশীদূর নয়, সুতরাং কর্ম্মচারী সেই পাচক ব্রাহ্মণের সহিত বাক্যালাপ করিতে করিতে কর্ত্তার সম্মুখে উপনীত হইল। পান্তি ব্রাহ্মণকে দেখিয়া আহ্লাদে ব্যস্ততার সহিত কুশল প্রশ্নাদি করিয়া স্বহস্তে তাঁহার পদ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন। তৎপরে একখানি গরদের নূতন বস্ত্র পরিধান করাইয়া কিছু জলযোগ করিবার জন্য আসনে উপবেশন করিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ পান্তির ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া জলযোগ করিতেছেন, এমন সময় কর্ম্মচারীগণ তোড়া তোড়া টাকা সেই স্থানে উপস্থিত করিল। পান্তি ব্রাহ্মণের বাটীর সমস্ত অনুসন্ধান লইয়া বলিলেন ঠাকুর, এই কুড়িটে হাজার টাকা নিয়ে গিয়ে দেশে জমি টমি

করগে, ঠাকুর দেবতার সেবা করগে, আর চাকরি কোরো না। হঠাৎ এতটা টাকা দেখিয়া ব্রাহ্মণের মুখে কোন কথা বাহির হইল না। রুদ্ধকণ্ঠশ্বাসে কেবল টাকার দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণকে তদবস্থায় থাকিতে দেখিয়া পান্তি বলিলেন—"ভাবচ কি ঠাকুর! ব্রাহ্মণের যা করা উচিত তাই করগে, আর রাঁধুনি বৃত্তি ক'রো না। এই টাকা কয়টা নিয়ে দেশে গিয়ে সংসার ধর্ম্ম করগে।" ব্রাহ্মণ দেখিয়া শুনিয়া একেবারে অবাক্। একবার টাকার তোড়াগুলির প্রতি, আর একবার পান্তির সরল সহাস্য মুখের প্রতি দেখিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, ইনি কি দেবতা? মানব হৃদয়ে কখনও কি এত দয়া হইতে পারে? কৈ আপনার লোক ত কখনও কোন উপকার করে নাই! পিতার শ্রাদ্ধের জন্য দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বেড়াইয়াছি, কৈ কেহত দয়া করে নাই! আত্মীয়েরা কেহ ত আহাও করে নাই, চক্ষের জলে তর্পণ করিয়াছি। আর ইনি দয়ার দেবতা, আমায় একেবারে এত টাকা দিলেন। ধন্য ইঁহার হৃদয়, না জানি ইঁহার কত টাকা। তখন তিনি বলিলেন মহাশয় এতটা টাকা কিরূপে রক্ষা করিব?

উত্তরে পান্তি বলিলেন "তার আর ভাবনা কি? মুনিব বাড়ী গচ্ছিত রাখগে, আর দেশে গিয়ে সুবিধামত যখন যেমন জমি কিনতে পাবে তখন ঐ টাকা থেকে কিনবে।" ব্রাহ্মণ বলিলেন যে আজ্ঞা তাই করব, আর মধ্যে মধ্যে আপনার নিকট আসিয়া পরামর্শ লইয়া যাইব। পান্তি বলিলেন, ভয় কি নারায়ণ ঠিক পরামর্শ দিবেন। তবে ইচ্ছা হয় এখানে পায়ের ধূলা দিও। হৃদয়ের উদ্বেগে ব্রাহ্মণের আর জলযোগ করা হইল না। সমগ্র পৃথিবী যেন ঘূর্ণায়মান, তিনি একপ্রকার অসুস্থতা অনুভব করিতে লাগিলেন, সুতরাং পান্তির অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি উপেক্ষা করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। তখন পান্তি মহাশয় তাঁহাকে একজন কর্ম্মচারীর সঙ্গে শকটারোহণে বাটী পাঠাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ পান্তির

নিকট হইতে বিদায় লইয়া কর্ম্মচারীকে বলিতে লাগিলেন ইনি যথার্থই দেবতা, আমি ব্রাহ্মণ না হইলে তাঁহার পায়ের ধূলা লইতাম।

২। একবার তিনি নৌকাযোগে রাণাঘাটে যাইতেছিলেন, এমন সময় একদল ডাকাত তাঁহার বজরা আক্রমণ করিল। বজরায় অন্যান্য লোক ভয়ে কৃষ্ণপান্তির শরণাগত হইলে, তিনি ডাকাতের সর্দ্দারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ওরে আমি কেষ্ট পান্তি, আমার ঠাঁই এখন কিছুই নাই, পরশু হাটখোলার গদিতে যাস তোদের খুসী করবো। তখন সর্দ্দার পান্তির মুখখানি উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন "কর্ত্তা মশাই আমাদের ধরিয়ে দেবে না ত? পান্তি বলিলেন "নারায়ণ, ওরে কেষ্ট পান্তি লেমখ হারাণ লয় রে।" তখন দস্যুগণ দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেল।

তৎপরে যথাদিনে দশজন দস্যু দিবা দ্বিপ্রহরের সময় হাটখোলার গদিতে আসিয়া উপস্থিত। তখন পান্তি তাঁহার ভ্রাতা শম্ভুকে ডাকিয়া বলিলেন, উহাদের প্রত্যেককে এক এক হাজার টাকা দাও। শম্ভু চটিয়া লাল, বলিল, ডাকাতদের সব পুলিসে দাও, ওরা ডাকাত, খুনে, ওদের আবার টাকা দেবে! তখন পান্তি বলিলেন "সে কিরে শেম্ব, ওদের যে কথা দিয়েচি রে! ওরা আমার কথায় বিশ্বাস ক'রে সে দিন ছেড়ে দিয়েছিল, আর আজ আমি ওদের পুলিসে ধরিয়ে দোব, এ তোর কেমন বিচার রে!" তখন শম্ভু আরও রাগিয়া বলিল, দাদা, ওরা যে ডাকাত, বদমায়েস—ওদের আবার দয়া করতে আছে? কোম্পানি টের পেলে আমাদের শুদ্ধ বেঁধে নিয়ে যাবে।" তখন পান্তি রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন—"নিয়ে যায় যাবে, তোর এত ভাবনা কেন? দে ওদের টাকা এনে দে। আমি তোর কোন কথা শুনতে চাই না। ওরা খাতি পেলে আর কোন উপদ্রব করবে না।" তখন তিনি ডাকাতদের টাকা দিয়া বলিলেন—এমন কাজ আর করিও না, এই টাকাতে এক একটা কারবার করগে। দস্যুগণ হৃষ্টচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিল।

৩। একদিন তাঁহার কর্ম্মচারী মহাদেব মুখোপাধ্যায়কে বলিলেন—"দেখ ঠাকুর, সকলকার কিছু রকম বন্দোবস্ত হয়েছে। তোমার কিছুই হয় নি, একটু ভাল রকম করে দেব তাই দেরী হচ্চে। কাল প্রথম লাটে যে জমিদারী উঠবে সেইটা তোমায় কিনে দেব। ব্রাহ্মণ শুনিয়া অবাক্, বলিলেন আমি আর কি বলিব, আপনি মনিব যাহা ভাল বিবেচনা হয় তাহাই করিবেন। পরদিন নিলামে প্রথম লাটটি চারি লক্ষ টাকা দামে উঠিল, তাহাই কর্ম্মচারীর নামে ডাকা হইল। তৎপরে সেদিন তিনি অনেক ছোট বড় জমিদারী নিজনামে খরিদ করিলেন। তাহার পর তিনি কর্ম্মচারীকে সেই চারি লক্ষ টাকার জমিদারী দিতে আসিলে, শম্ভু আসিয়া আপত্তি করিল, পুত্রেরা বলিল, এ তালুকে অনেক আয়, ইহা পরকে দেওয়া উচিত নহে।

তখন সেই সত্যবাদী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নির্ভীক কৃষ্ণপান্তি বিরক্তিভাবে উত্তর করিলেন, "আমি যে তাঁকে প্রথম লাট দিব বলিয়াছি, আমি কি তোদের জন্যে মিথ্যাবাদী হব? নরকে যাবার বেশ পরামর্শ দিতে এসেছ!" তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না, সেই চারি লক্ষ টাকার জমিদারী আনন্দের সহিত তাঁহার কর্ম্মচারীকে প্রদান করিলেন। তিনি জানিতেন যে পরের দুঃখ দুর করাই প্রধান ধর্ম্ম; তিনি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেন যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া কেবল নিজের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিলে মহাপাপ হয়, তজ্জন্য তিনি দান করিয়া এত আনন্দ লাভ করিতেন। এই ব্রাহ্মণ বীর নগরের প্রসিদ্ধ জমীদার বামন দাস বাবুর পিতামহ। অদ্যাপি সেই ব্রাহ্মণের বংশধরেরা পান্তি বাড়ী কোন ক্রিয়া কর্ম্ম উপস্থিত হইলে তথাকার ভাণ্ডারী হন।

৪। একবার তিনি এক রাজার সম্পত্তি নিলামে খরিদ করেন। রাজা লোক পরম্পরায় শুনিলেন যে কৃষ্ণপান্তি বড় দয়ালু। সেই বিশ্বাসে তিনি একদিন লোকজন সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণপান্তির বাড়ীতে উপস্থিত

হইলেন। রাজার পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়া তিনি ভয়ে বাড়ীর মধ্যে প্রস্থান করিলেন। শম্ভুকে বলিলেন "ওরে আজার সঙ্গে কেমন ক'রে কথা কবরে, আমি সামান্যি লোক। তোরা যা আমি কথা কইতে পারব না।" শম্ভু জোর করিয়া একখানি ভাল কাপড় পরাইয়া, চাদর গলায় দিয়া রাজার সম্মুখে আনয়ন করিলেন। রাজা উঠিয়া হাত যোড় করিয়া বলিলেন, মহাশয়! বুদ্ধির দোষে আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, বিষয় আশায় সব গিয়াছে, বসতবাটী পর্য্যন্ত এক লাটে আপনি খরিদ করিয়াছেন। যখন সর্ব্বস্ব আপনার হইল, তখন আমিও আপনার সংসারভুক্ত হইলাম। নচেৎ কোথায় যাই, তাই মহাশয়ের নিকটে আসিলাম। রাজার কথা শুনিয়া তিনি ফ্যাল ফ্যাল করিয়া এক দৃষ্টে তাঁহার প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। ভাবিলেন আহা! রাজার বিষয় সব গিয়াছে, তাঁহার মনে কত কষ্ট হইতেছে। তাঁহার মার্জ্জিত ভাষা শুনিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কি করিয়া আমার এই চাষাড়ে কথায় জবাব দি। তাঁহার চক্ষে জল আসিল, তিনি দুই হাত জোড় করিয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বিনয় ও সৌজন্যের সহিত বলিলেন—"আপনি আজা, আপনার বিষয় কিনে আমি বড়ই অপরাধ করেছি। আপনার বিষয় নিলে আমার ভাল হবে না, আপনি এখনি লেখাপড়া করে নিন।" রাজা তাঁহার কথা শুনিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কত টাকায় নিলাম ডাকিয়াছেন, আর আমাকে কত টাকাই বা দিতে হইবে? পাল্তি বলিলেন, আজ্ঞে মশাইকে কিছুই দিতে হবে না। মুই এক পয়সাও নিতি পারবো না।" ইহা শুনিয়া রাজা আর অশ্রুবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি বসনে বদনাবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভগ্নস্বরে বলিলেন—"আপনি দেবতা, আপনিই রাজা, এ ত্যাগ স্বীকার জগতে কয় জন করিতে পারেন? ধন্য আপনার হৃদয়! ধন্য আপনি! ভগবান্ আপনাকে কি ধাতুতে গড়িয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না।

আপনি রাজ রাজ্যেশ্বর! এই বলিয়া তিনি কৃষ্ণপান্তির চরণতলে পড়িয়া গেলেন। তখনি সকলে রাজাকে বসাইয়া সুস্থ করিলেন। পান্তির আদেশে তৎক্ষণাৎ লেখাপড়া হইল। তিনি রাজাকে তাঁহার সমস্ত জমিদারী প্রত্যর্পণ করিলেন; এবং উত্তমরূপে তাঁহার অতিথি সৎকার করিয়া বিদায় দিলেন। পান্তির মনোমধ্যে প্রথম যে আবেগ উঠিত, তাহাতে তিনি ত্যাগ স্বীকার করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইলেও পরের দুঃখমোচনে কখনও পরাঙ্মুখ হইতেন না।

সত্যবাদিতা।

মধুসূদন রায় নামক এক ব্রাহ্মণ কৃষ্ণপান্তির নিকট অনেক টাকার লবণ খরিদ করিবে বলিয়া কিছু বায়না করেন। অবস্থা বিপর্য্যয়ে টাকার সঙ্গতি না হওয়াতে তিনি আর কৃষ্ণপান্তির সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলেন না। কিয়দ্দিবস পরে লবণের দর বৃদ্ধি হওয়াতে তিনি সমস্ত লবণ বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। মধুসূদন যত লবণ খরিদ করিবেন বলিয়া বায়না করিয়াছিলেন, সেই লবণের মুনফা তাঁহার নামে জমা রাখিয়া তাঁহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়দ্দিবস পরে একদিন পান্তির সহিত সেই ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন "মশাই আপনি কি রকম লোক! আপনাকে কত খোঁজ তল্লাস কর্‌লাম তা আপনার আর দেখা নাই।" মধুসূদন তখন বেদনা-ব্যঞ্জক-স্বরে বলিলেন "মহাশয় বাকি টাকার সংগ্রহ করিতে পারি নাই তাই লজ্জায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই নাই। আমায় মাপ করুন। পান্তি বলিলেন—"তা হলেই বা একবার দেখা ত ক'র্‌তে হয়। আপনার মুনফার টাকা আমার খাতায় আমানৎ আছে, গিয়া আনিবেন। মধুসূদন শুনিয়া বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন সে কি! আপনি এ কি বলিতেছেন! আমি টাকা দিতে পারিলাম না, আমার আবার

লাভ কি প্রকারে হইবে? দেবতাতেও এত দয়া নাই, মনুষ্য কি কখন মনুষ্যের দুঃখ ভাবে! যদি মনুষ্যের দুঃখ মনুষ্য বুঝিত তাহা হইলে কি অনাহারে এত লোক মরিত? পান্তি বলিলেন "অত কথা আমি জানি না বাপু, পরের টাকা নিলে মোর অধর্ম্ম হবে। আপনার প্রায় এক লক্ষি টাকা লাভ হয়েচে গদিতে গেলেই পাবেন।" চিন্তা-মেঘ-সংঘর্ষে মধুসূদনের চিদাকাশে যেন ঘূর্ণীবায়ুর মত্ততা আসিল, তিনি মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণপান্তি তাঁহার শুশ্রূষা করিয়া, গদিতে লইয়া গেলেন। তৎপরে তাঁহার লাভের টাকা তাঁহাকে সমস্ত বুঝাইয়া দিয়া তাঁহাকে বাটী পাঠাইয়া দিলেন।

২। একবার একজন ইংরাজ বণিক তাঁহার নিকট হইতে অনেক টাকার আতপ চাউল লইবে বলিয়া দর স্থির করেন, কিন্তু বায়না পত্র কিছুই দেন নাই। তখন চাউলের দর নরম ছিল। কিছুদিন পরে চাউলের দর প্রায় দ্বিগুণ হইল। সাহেব চাউল লইতে আসিলে, তিনি পূর্ব্বের দরেই চাউল দিতে চাহিলেন। সাহেব কৃষ্ণ পান্তির ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন এরূপ সত্যবাদী ধর্ম্মভীরু লোক আর কোথাও দেখি নাই। পান্তির গোলা হইতে যখন জাহাজে চাউল উঠিতে লাগিল তখন সাহেব তাঁহার সরকার ও লোকজনদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—"ওরে এমন লোকের জিনিষ আর তুলিস না, জাহাজ ডুবে যাবে।"

গুণগ্রাহিতা।

কৃষ্ণপান্তি যদিচ লেখাপড়া জানিতেন না, তথাপি মেধা ও স্মৃতিশক্তির বলে সমস্ত হিসাব তাঁহার মুখে মুখে থাকিত। নিরন্তর অভ্যাস ও স্মরণ শক্তির প্রভাবে তিনি কর্ম্মচারিগণের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিতেন। একদিন তিনি রাণাঘাটের দুইক্রোশ দক্ষিণে বৈদ্যপুর

গ্রামে একটী পুষ্করিণী কাটাইবার জন্য গিয়াছিলেন। পুষ্করিণী কাটাইবার পূর্ব্বে এক কোদাল মাটী কর্ত্তাকে কাটিতে হয়। তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া, তাঁহাকে দেখিবার জন্য অনেক লোক তথায় আসিয়া জুটিল। এমন সময় পুষ্করিণীর কালী কসিবার প্রয়োজন হওয়াতে তাঁহার নিয়োজিত কর্ম্মচারীরা বা উপস্থিত লোকেরা কেহই তাহা কসিতে পারিল না। তখন একটী ব্রাহ্মণ ঘটী হস্তে স্নান করিতে যাইতেছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ অঙ্ক মুখে মুখে কসিয়া দিলেন। কৃষ্ণপান্তি ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পরিচয় লইয়া তাঁহাকে রাণাঘাট যাইতে অনুরোধ করিয়া প্রত্যাগত হইলেন। উক্ত ব্রাহ্মণ পান্তিভবনে একদিন উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি ৪৲ টাকা বেতনে খাতার মোহরের ছিলেন। কৃষ্ণপান্তি এমনি গুণগ্রাহক ছিলেন যে উক্ত ব্রাহ্মণকে তাঁহার বাটীর দেওয়ানি পদ দিলেন। ইঁহারই নাম দেওয়ান রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাণাঘাটের দেওয়ান বাঁড়ুযো বলিয়া ইনি বিখ্যাত ছিলেন। জমিদারী সেরেস্তার হিসাব ও কাজকর্ম্মের প্রণালী যাহা অদ্যাপি প্রচলিত, ইনিই তাহার প্রবর্ত্তক। ইঁহার তুল্য বিচক্ষণ ও উপযুক্ত লোক প্রায় দেখা যায় না। পান্তির বাল্যবন্ধু আন্দিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় ইঁহার পিতা।

কৃতজ্ঞতা।

কৃষ্ণপান্তি বড় কৃতজ্ঞ ছিলেন। বাল্যকালে হাটে যাইবার সময় যে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে ইঁহারা মধ্যে মধ্যে প্রসাদ পাইতেন, সেই ব্রাহ্মণের পুত্র একবার বিপন্ন হইয়া পান্তির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি ব্রাহ্মণের মুখে শুনিলেন যে তাঁহার কতকগুলি জমী সরকারে ক্রোক হইয়াছে। তিনি ব্রাহ্মণের পরিচয় লইয়া বলিলেন—"মোর সঙ্গে এস" বলিয়া সদর কাছারীতে গমন করিলেন। কর্ত্তা স্বয়ং আসিতেছেন দেখিয়া ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র ও কর্ম্মচারিগণ সকলে তটস্থ হইল এবং সকলে হাতের

কাজ ফেলিয়া দাঁড়াইলেন। কৃষ্ণপান্তি অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিলেন—"হ্যাঁরে শেম্ব! সেই আমানি পান্তাভাত, মুড়কী, মোয়া, সব ভুলে গেছিস? ধিক তোরে! এই বলিয়া তিনি প্রত্যাগত হইলেন। শম্ভুচন্দ্র এক্ষণে অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, যে এই ব্রাহ্মণের পিতার নিকট অসময়ে আমারা ক্ষুধার জ্বালায় অনেক উৎপাত করিয়াছি। এ ব্যক্তি তাঁহারই পুত্র। তৎক্ষণাৎ তিনি ব্রাহ্মণের জমী ছাড় পত্র করিয়া দিলেন।

নিতান্ত দারিদ্রের পর বড় মানুষ হইলে অনেকে অহঙ্কারী হইয়া থাকেন। কিন্তু কৃষ্ণপান্তি বাল্যকালের অবস্থা কখনও বিস্মৃত হন নাই। তিনি উন্নতির উন্নত শিখরে অধিরোহন করিয়া, অর্থের গদির উপর বসিয়াও সামান্যভাবে জীবন অতিবাহিত করিতেন। পরিধানে সামান্য বস্ত্র, আহারাদিও সামান্য রকম, যেখানে সেখানে সামান্যভাবে অবস্থিতি ও শয়ন। সামান্য কোন কার্য্যের জন্য দাস দাসীর অপেক্ষা করিতেন না। নিজে গাড়ু লইয়া যাইতেছেন দেখিয়া শম্ভুচন্দ্র খানসামা পাঠাইলে তিনি বিরক্ত হইয়া বলিতেন, আমি বাবু নই, ঐ শেম্বোর কাছে যা। তিনি তাঁহার নাম ও সম্ভ্রমের উপযুক্ত পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন না। তিনি জানিতেন যে এ সব সম্পদ সেই তাঁহার, আমি কেবল ভাণ্ডারী মাত্র। তজ্জন্য তিনি কখনও বিলাসের কুহকে মুগ্ধ হন নাই, কখনও কাহারও নিকটে অহঙ্কার বা ক্ষমতা প্রকাশ করেন নাই। সর্ব্বদাই সামান্যভাবে জীবন অতিবাহিত করিতেন। তিনি দেখিতে দীর্ঘাকার, কৃশ ও কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন। ছোট কাপড় পরিতেন ও গলায় দানা ব্যবহার করিতেন। এই বেশে তিনি সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

একদিন তিনি সামান্য বেশে গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় কিস্তি লাগিল। তিনি একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয় এই জিনিসের কি দর! মহাজন কৌতুক করিয়া সামান্য লোক ভ্রমে

অনেক কম দর বলিল। কৃষ্ণপান্তি বলিলেন সে কি মহাশয়! ইহার বাজার দর এই, আর আপনি এত কম দর বলিতেছেন। ইহাতে আপনার অনেক লোকসান হইবে। মহাজন তথাপি বলিল আমি যদি কম দরে বিক্রয় করি ইহাতে আপনার কি? তখন তিনি বায়না করিয়া গদিতে প্রত্যাগমন করিলেন। মহাজন বায়না হাতে লইয়া মনে করিল ইহাই আমার লাভ, ওটা পাগল। কিন্তু যখন শুনিল যে তিনিই হাট-খোলার কর্ত্তাবাবু, তখন মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে বসিল। পরে সকল মহাজন মিলিয়া তাঁহার গদীতে যাইয়া কাঁদাকাঁটি করাতে তিনি দয়াপরবশ হইয়া বায়নার টাকা ফেরৎ দিলেন। তৎসঙ্গে বলিয়া দিলেন, এটা ব্যবসার স্থান, ধর্ম্মস্থানে কখনও এরূপ অন্যায় আচরণ করিও না। সর্ব্বদা সত্য পথে থাকিবে, মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিলে শীঘ্র উৎসন্ন যাইবে।

১৮০৩ খৃঃঅব্দে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের ছোটরাণীর পুত্র শম্ভুচন্দ্রের মাসহারা লইয়া মহারাজা শিবচন্দ্রের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের সহিত এক মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। শম্ভুচন্দ্রের টাকার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় তিনি প্রস্তাব করেন যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে কিছু টাকা দেওয়া হউক, যদি দায়ী না হইতে হয় তাহা হইলে টাকা ফেরৎ পাইবেন। ইহাতে ঈশ্বরচন্দ্র একজন ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোক জামিন চাহিলেন। তখন শম্ভুচন্দ্র কৃষ্ণপান্তির নিকট এই প্রস্তাব করায় তিনি স্বীকার করিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র কৃষ্ণপান্তিকে জামিন হইতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। ইহাতে পান্তি বলিল—"আমি ছ্যাপ ফেলিয়াছি, এখন আর তাহা কিরূপে গ্রহণ করিব?" তাঁহার বিশ্বাস, থুতু ফেলিয়া যেমন আর তাহা গ্রহণ করা যায় না, তদ্রূপ একবার কথা দিয়া পুনর্ব্বার তাহা পাণ্টান যায় না। তিনি এইরূপ সত্যবাদী ও বিশ্বাসী ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র কৃষ্ণপান্তির এই উত্তরে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু কি করিবেন তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করা অসম্ভব।

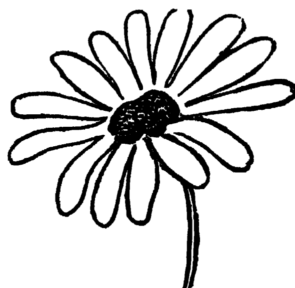
তিনি কখনও মিথ্যা কথা কহিতেন না এবং আপন ধর্ম্মের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি করিতেন। কোন সময়ে এক ব্যক্তি টাকা পাইবে বলিয়া একজনের নামে নালিশ করে এবং কৃষ্ণপান্তিকে সাক্ষী মানে। আদালতে হলফ্ করিতে হইবে বলিয়া তিনি নিজ হইতে টাকা দিয়া জজ বাহাদুরের নিকট বলিলেন, "ফরিয়াদী টাকা পাইবেন সত্য, আমি সেই টাকা দিতেছি, কিন্তু হলফ্ করিতে পারিব না।" ইহাতে বিচারকর্ত্তা বিস্মিত হইয়া সেই অবধি প্রচার করিয়া দিলেন যে, অতঃপর আর তাঁহাকে কেহ সাক্ষী মানিতে পারিবে না।

কৃষ্ণপান্তির উন্নতির সময়ে কৃষ্ণনগরের রাজারা মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করিতেন। এই উপকারের জন্য মহারাজ শিবচন্দ্র তাঁহাকে "চৌধুরী" উপাধি প্রদান করেন। তৎকালে এই উপাধি অতি সম্মানসূচক পদবী ছিল। কথিত আছে এক সময়ে লর্ড ময়রা মফঃস্বল ভ্রমণের সময় রাণাঘাটে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত করেন। সেই সময় কৃষ্ণপান্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। গভর্ণর বাহাদুর তাঁহার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে বিশেষরূপে সম্বর্দ্ধনা করেন। তিনি কৃষ্ণপান্তিকে "রাজা" উপাধি দিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু পান্তি রাজপ্রদত্ত "চৌধুরী" উপাধি অপেক্ষা "রাজা" উপাধি অধিক সম্মানসূচক মনে করিলেন না। যেহেতু তৎকালে দেশীয় রাজগণ অপেক্ষা ইংরাজগণের তাদৃশ সম্মান বৃদ্ধি হয় নাই। ইহাতে লাট সাহেব "চৌধুরীর" পূর্ব্বে জাতীয় উপাধি "পাল" শব্দ যোগ করিয়া "পাল চৌধুরী" এবং রাজোচিত আশাসোটা ও নহবৎ বাজাইবার আদেশ দিলেন।

তখনকার সময়ে কৃষ্ণপান্তি অনাথের নাথ, বিপন্নের শরণ ও ব্যবসায়িগণের ভূষণস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার উন্নতি হইবার প্রধান কারণ—তিনি সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি কখন মিথ্যা কথা কহিতেন না এবং আপন ধর্ম্মের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি করিতেন। তিনি সামান্য লোক হইয়া

আপনার বুদ্ধি, পরিশ্রম, যত্ন ও সদাচার দ্বারাই এত উন্নতি করিয়া শেষে নৃপতিতুল্য সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি লেখাপড়া জানিতেন না বটে, কিন্তু বুদ্ধিতে তিনি বৃহস্পতি তুল্য ছিলেন। এইরূপে তিনি জীবনযাত্রা অতিবাহিত করিয়া নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য শাসনের নিয়মে ১২১৬ সালে (১৮০৯ খৃঃ অব্দে) ৬০ বৎসর বয়সে ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করেন।

তাহার দুই স্ত্রীর গর্ভে প্রেমচাঁদ, ঈশ্বর, উমেশ ও রামরত্ন এই চারি পুত্র হয় এবং শম্ভুচন্দ্রের বৈকুণ্ঠ ও কাশীনাথ নামে দুই পুত্র হয়। কেবল রামরত্ন অপুত্রক ছিলেন, অবশিষ্ট পাঁচজন হইতে বহুগোষ্ঠী পাল চৌধুরী বংশের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং ভাগ্যবান কৃষ্ণপান্তি অদৃষ্টগুণে ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করিয়াছিলেন এবং সৎপথে থাকিয়া ব্যবসার দ্বারা কিরূপে উন্নতিলাভ করা যায়, তাহার তিনি উদাহরণ স্বরূপ ছিলেন।





ধনকুবের রামদুলাল সরকার।

এক সময়ে প্রাণভয়ে পলায়নপর দিল্লীর সম্রাট হুমায়ুন, মহিষীর সহিত অমরকোট দুর্গমধ্যে উপস্থিত হইয়া যেমন বিশ্ব বিশ্রুত মহামতি আকবর নামক পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছিলেন, তেমনি বর্গীর উৎপীড়নে পলায়নপর বলরাম সরকার নামক জনৈক গ্রাম্য গুরুমহাশয় গর্ভবতী স্ত্রীর সহিত এক প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া এক পুত্ররত্ন লাভ করেন। এই পুত্রের নামই রামদুলাল। দুঃখ, ক্লেশ ও বিপদের মধ্যে যেমন মহাত্মা দিল্লীশ্বর আকবর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনি দুঃখ দারিদ্র্যের ঘোর ঘূর্ণীপাকের মধ্যে এই রামদুলালের জন্ম হয়। কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবনে ইঁহারা দুই জনেই কস্তুরীর সৌরভের ন্যায় মর্য্যাদা ও যশঃসৌরভে দিগন্ত আচ্ছন্ন করিয়াছিলেন।

দমদমার নিকটবর্ত্তী রেকজানি নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে উক্ত বলরাম সরকার বাস করিতেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। একটী ক্ষুদ্র পাঠশালার সামান্য আয়ের উপর নির্ভর করিয়া তিনি অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। এতাদৃশ যন্ত্রণাদায়ক দারিদ্র্য ক্লেশের মধ্যে আবার তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে বর্গীর অত্যাচার সহ্য করিতে হইত। সেই উৎপাতে ১৭৫২ খৃঃ অব্দে বলরাম গ্রামবাসিগণের সহিত গর্ভবতী স্ত্রীকে লইয়া তিনি প্রাণরক্ষার্থ পলায়ন করেন। অত্যাচারিগণের অধিকার হইতে বহুদূরে অবস্থিত এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে তাঁহার স্ত্রীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়, এবং অনতিকাল মধ্যে সেই আশ্রয়শূন্য বিশাল বক্ষে তিনি এই রামদুলালকে প্রসব করেন।



ধনকুবের রামদুলাল সরকার। (৮০ পৃঃ)

বাল্যজীবন।

রামদুলালের পর বলরাম সরকারের আর একটী পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ইহার কয়েক বৎসর পরে বাল্যকালেই রামদুলাল পিতৃ মাতৃহীন হইলেন। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া শিশু ভ্রাতা ও ভগিনীর হস্তধারণ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে কলিকাতায় তাঁহার মাতামহ রামসুন্দর বিশ্বাসের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। মাতামহের অবস্থা এমন শোচনীয় ছিল যে, তিনি মুষ্টি ভিক্ষা করিয়া দিনাতিপাত করিতেন। মাতামহ সাহায্যার্থী অপোগণ্ডদের এরূপ হীনাবস্থা দেখিয়া কাতর হইয়া কি করিবেন তাহা আর ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহ ও ক্লেশের সহিত ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। রামদুলালের মাতামহীও ভানানীর (ধানভানা) কর্ম্ম দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিয়া স্বামীর সাহায্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে ইঁহাদের যত্নে সকলে প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর পরে ইঁহাদের ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তিত হইল। রামদুলালের মাতামহী কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ও বিখ্যাত ধনী মদনমোহন দত্তের অন্তঃপুরে পাচিকার কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। মাতামহীর সহিত রামদুলালও তথায় আশ্রয় পাইলেন। এতদিন তাঁহার শিক্ষার সুযোগ হয় নাই, এইবার অন্নদাতার আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি শিক্ষা সাধন করিতে লাগিলেন। শিক্ষা বিষয়ক অনুরাগ ও উৎসাহ নিবন্ধন তিনি অতি সুন্দররূপে লিখিতে শিখিলেন। ইহাতে মদনমোহন দত্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পুত্রগণের সহিত রামদুলালকে শিক্ষা দিবার জন্য গৃহশিক্ষককে আদেশ করিয়াছিলেন। তখন লিখিবার জন্য কাগজ বা শ্লেট পাওয়া যাইত না, কলাপাতা বা তালপাতাতেই বিদ্যাশিক্ষা হইত। রামদুলাল তালপাত সারিয়া কলাপাত ধরিলেন; কিন্তু তাঁহার মাতামহীর প্রত্যহ কদলীপত্র কিনিবার সঙ্গতি ছিল না। তজ্জন্য রামদুলাল সংধ্যায়ী

বালকগণের পরিত্যক্ত পাতাগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রত্যহ গঙ্গা হইতে ধৌত করিয়া তাহাতে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ প্রগাঢ় যত্ন ও অধ্যবসায়ের ফলে ইনি অল্প দিবসের মধ্যেই উৎকৃষ্টরূপে বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে ও অঙ্ক কসিতে শিখিলেন। ক্রমে একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি মোহরের হইলেন। গৃহ শিক্ষকের গুণে তিনি কাপ্তেন ও কর্ম্মচারিগণের সহিত কার্য্যোপযোগী ইংরাজী কথোপকথনেও সমর্থ হইয়াছিলেন।

রামদুলাল যোড়শবর্ষে উপনীত হইলে তাঁহার ভ্রাতা, ভগিনী ও বৃদ্ধ মাতামহের ভিক্ষাক্লেশ নিবারণার্থ এইবার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। প্রথমে মদনমোহন দত্ত তাঁহাকে এবং নন্দকুমার বসু নামক একজন সমবয়স্ককে নিজ আফিসে কার্য্য-শিক্ষার্থিরূপে গ্রহণ করিলেন। একদিন তাঁহারা ঝড়বৃষ্টির প্রাবল্যে আফিসে যাইতে না পারিয়া পথ হইতে বাটী ফিরিয়া আসিলেন, এবং ক্লেশে অবসন্ন হইয়া প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। মদনমোহন আফিস হইতে প্রত্যাগত হইয়া যুবকদ্বয়কে নিদ্রাভিভূত দেখিয়া মনে করিলেন, হয়ত ইহাদের কোনরূপ পীড়া হইয়াছে। গাত্রে হস্তক্ষেপ করাতে তাঁহার সে ভ্রম দূর হইল, পরে তাহাদের ডাকিলেন। রামদুলাল চকিত হইয়া একবারে কম্পিত কলেবরে দণ্ডায়মান হইলেন। মদনমোহন অফিসে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কোনরূপ মিথ্যাকথা না বলিয়া অনুপস্থিতি ও নিদ্রিত হইবার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিলেন। ইহাতে মদনমোহন বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, যখন তোমরা রৌদ্র, বৃষ্টি, ধূলা বা কাদাকে ভয় করিয়া আলস্যের আশ্রয় গ্রহণ কর, তখন তোমরা কখনও উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না। এই শাসনে রামদুলালের চিরদিনের মত শিক্ষালাভ হইয়াছিল। তিনি প্রাণপণ খাটিয়া প্রভুর মনস্তুষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন মদনমোহন তাঁহার কার্য্যদক্ষতা ও শ্রমসহিষ্ণুতা দেখিয়া তাঁহাকে পাঁচ টাকা বেতনের একটী বিল সাধার কর্ম্ম দিলেন।

মদনমোহনের কার্য্য বিস্তৃতিতে কলিকাতা, বারাকপুর, টিটাগড় প্রভৃতি নানাস্থানে তাঁহার দেনা পাওনা ছিল। তজ্জন্য রামদুলালকে প্রতিদিনই ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র সহ্য করিয়া বারাকপুর প্রভৃতি স্থানে তাগাদা করিতে যাইতে হইত। এই কার্য্য অতিশয় কষ্টসাধ্য হইলেও, তিনি প্রাণপণ যত্নে প্রভুর কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি দমদমার জনৈক সৈনিক পুরুষের নিকট তাগাদা করিতে গিয়াছিলেন। সাহেবেরা প্রায়ই গরীবের দুঃখ বোঝেন না; সুতরাং টাকা দিতে বিলম্ব করিলেন। তখন কলিকাতার চারি পার্শ্বে অত্যন্ত দস্যুভয় ছিল। সুতরাং এত টাকা লইয়া রাত্রিকালে গমন করা বিপজ্জনক। ক্রমে রজনী ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইলে, তিনি প্রথমে কাহারও বাড়ীতে আশ্রয় লইতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু পরক্ষণে ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন কাহারও বাড়ীতে গমন করা উচিত নহে; কারণ যদি তাহারা টাকার কথা জানিতে পারিয়া জীবন সংহার করে, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! অনেক বিবেচনা করিয়া বিচক্ষণ রামদুলাল সেই দস্যু তস্করাদি ভয়পূর্ণ এক বৃক্ষতলে ফকিরের বেশে টাকার থলি মাথায় দিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। চক্ষে নিদ্রা নাই— শৃগাল ও পেচকের ভীষণ কর্কশস্বরে উদ্বেজিত হৃদয়ে নিশা অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। প্রভাতে বাটী আসিয়া প্রভুকে টাকা বুঝাইয়া দিয়া রাত্রির ঘটনা সমস্ত নিবেদন করিলেন। এইরূপ কার্য্যে তাঁহার উপর প্রভু মদনমোহনের দৃঢ় বিশ্বাস হইল। তখন তিনি তাঁহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দশ টাকা বেতনে সিপ সরকারের পদে নিযুক্ত করিলেন। রামদুলাল এতাবৎকাল কেবলমাত্র পাঁচ টাকা বেতন পাইতেন; এবং এই সামান্য বেতন হইতেও অসাধারণ মিতব্যয়িতা দ্বারা এক শত টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। উক্ত টাকা বাগবাজারের কোন কাষ্ঠের গোলাতে জমা রাখিয়া, প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে তথায় কার্য্যাদি দেখিতেন এবং লভ্যাংশ অর্থের দ্বারা তাঁহার বৃদ্ধ মাতামহকে সাহায্য করিতেন।

এক্ষণে রামদুলালের ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তিত হইল। পাঁচ টাকার পরিবর্ত্তে দশটাকা বেতন হইল। সুতরাং সংসারের অনেকটা স্বচ্ছন্দতা লাভ হইল। সিপ সরকারের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বদা জাহাজে যাতায়াত করিতে হইত, তজ্জন্য তিনি জাহাজ সম্বন্ধীয় অনেক বিষয় অবগত হইতে লাগিলেন ; এবং জলমগ্ন জাহাজের মূল্যাদি নির্দ্ধারণে সমর্থ হইলেন। তিনি কষ্ট সহিষ্ণু হইয়া তাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভার ক্রমশঃ পরিচয় দিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি একজন অদ্বিতীয় সিপ সবকার হইয়া উঠিলেন। মদনমোহন দত্ত তাঁহার এইরূপ সুন্দর বুদ্ধি ও নির্ম্মল চরিত্র দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার মেধা ও শ্রমশক্তির যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন।

কষ্টসহিষ্ণুতা, সাহস, সূক্ষ্মদর্শন ও উপস্থিত বুদ্ধি নিবন্ধন, অধিকন্তু তিনি পরিষ্কৃতরূপে ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা কহিতে পারিতেন বলিয়া, মদন-মোহন তাঁহাকে ডায়মণ্ডহারবারে সাহেবদের নিকট পাঠাইতেন। নদী-মুখে গমনোপলক্ষে তিনি মধ্যেমধ্যে বিপদে পড়িতেন। একদিন তিনি নৌকা ডুবিয়া গঙ্গার জলে পড়েন, এবং বহুকষ্টে ৭ ক্রোশ সন্তরণ পূর্ব্বক খিদিরপুরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐরূপ আর একদিন তিনি এবং তাঁহার বন্ধু নন্দকুমার বসু, ডায়মণ্ডহারবারে বিপদাপন্ন হইয়া ঝড়বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কোন এক ধীবর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ধীবর তাঁহাদিগের শয়নের নিমিত্ত একটি ঝাতলা প্রদান করে। তাঁহারা ইহাতে শয়ন করিয়া সে রাত্রিতে এত সুখানুভব করিয়াছিলেন যে, সুখ সমৃদ্ধির সময়েও সেই ঘটনা স্মরণ রাখিবার জন্য উভয়েই নিজ নিজ সুখ শয্যাতলে একখানি ঝাঁতলা ব্যবহার করিতেন। যাহা হউক তিনি সর্ব্বদা জাহাজে গমনাগমন করিয়া অতি প্রয়োজনীয় গুণ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, যদ্দারা তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন অতি সুখময় হইয়াছিল। এই কার্য্যের দ্বারাই তিনি জলমগ্ন জাহাজের মূল্যাদি নির্দ্ধারণে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সাধুতা।

একদিন তিনি ভাগীরথীর মুখে একখানি জলমগ্ন জাহাজ দেখিয়া, সে জাহাজে কত মাল আছে, কিরূপে জাহাজকে উদ্ধার করা যাইবে, তাহার কত অংশ পাওয়া যাইবে, এবং তাহার মূল্যই বা কত, ইত্যাদি সমস্ত বিষয় অনুমানে স্থির করিয়া লইলেন। ইহার কিছুদিন পরে মদন মোহন দত্ত ১৪,০০০, টাকা দিয়া তাঁহাকে টালা কোম্পানীর অফিসে কোন একটী নিলামী মাল ক্রয় করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। রামদুলাল তথায় গমন করিবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে সে নীলাম হইয়া গিয়াছিল। পরক্ষণেই তিনি শুনিলেন যে ভাগীরথী মুখে সেই পূর্ব্বদৃষ্ট জলমগ্ন জাহাজখানি বোঝাই দ্রব্য সহিত নীলাম হইতেছে। তখন তিনি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া নীলাম ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অনুমিত মূল্য অপেক্ষা অতি অল্প ডাক হইতেছে দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইলেন। শেষে তিনি প্রভু মদন মোহনের নামে ১৪,০০০ টাকায় সেই নীলাম ডাকিয়া লইলেন। নীলাম ডাকার পর তিনি অন্য গৃহে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় জনৈক সাহেব অতিশয় ব্যগ্রভাবে তথায় নীলাম ডাকিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে অল্পক্ষণ পূর্ব্বে সে নীলাম রামদুলাল ডাকিয়া লইয়াছে। তখন তিনি রামদুলালের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রথমে অনেক ভয় প্রদর্শন করিলেন। রামদুলাল তাহাতে ভীত বা বিচলিত হইলেন না। তখন সাহেব তাঁহাকে নীলামটী বিক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া দর কসাকসির পর সাহেব তাঁহাকে একলক্ষ টাকা লাভ দিয়া জাহাজ ক্রয় করিয়া লইলেন। রামদুলাল ১,১৪,০০০ টাকা লইয়া প্রভু সমীপে চলিলেন।

লাভের এই একলক্ষ টাকা তিনি অনায়াসেই আত্মসাৎ করিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মনীতি এতাদৃশ বলবতী ছিল যে, তিনি সকল প্রকার প্রবঞ্চনাকেই আন্তরিক ঘৃণা করিতেন। তাঁহার অন্তঃকরণ ধর্ম্ম ও বিশ্বাসের লীলাক্ষেত্র। দশটাকা বেতনের সামান্য কর্ম্মচারীর পক্ষে অনায়াস-লভ্য এরূপ প্রচুর অর্থের প্রলোভন পরিত্যাগ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। আজকাল এরূপ নির্লোভ চরিত্র কয়জন দেখাইতে পারেন? তিনি এরূপ সরল ও নির্ব্বিকার ছিলেন, যে সমস্ত টাকা লইয়া প্রভু সমীপে উপস্থিত হইয়া অপরাধীর মত কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। প্রভুর অজ্ঞাতসারে তাঁহার অর্থ অন্যকার্য্যে নিয়োজিত করায়, আপনাকে অপরাধী ভাবিয়া, ভয়ে ভয়ে প্রভুকে সকল কথা বলিয়া স্বকীয় অবাধ্যতা প্রযুক্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; এবং এক তাড়া (Bank note) নোট সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। মদন মোহন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে এই সরল বিশ্বাসী যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। দশটাকা বেতনভোগী ভৃত্যের এই অসামান্য নির্লোভতা দর্শনে তিনি স্তম্ভিত প্রায় হইয়া বলিলেন—"রামদুলাল! তোমার সাধুতা ও মহত্ত্ব অসাধারণ, তোমার হৃদয় না জানি কি উপাদানে গঠিত, আমি এ টাকা লইতে পারিব না। এটাকা ভগবান্ তোমায় দিয়াছেন। তোমার সাধুতা ও বিশ্বাসের পুরস্কার স্বরূপ বিধাতা তোমাকে এই সৌভাগ্য প্রেরণ করিয়াছেন।" এই বলিয়া তিনি নিজের চৌদ্দহাজার টাকা লইয়া অবশিষ্ট লক্ষমুদ্রা রামদুলালকে প্রদান করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। রামদুলাল আহ্লাদের সহিত এ পুরস্কার গ্রহণ করিয়া প্রভুর চরণতলে অনেকক্ষণ পতিত রহিলেন। যাহা হউক দরিদ্র রামদুলালের এইরূপে হঠাৎ ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইল। যেন ভগবান্ তাঁহার সাধুতা, অধ্যবসায়, কষ্টসহিষ্ণুতা ও ধর্ম্ম-প্রাণতার পুরস্কার প্রদান করিলেন।

সৌভাগ্য।

এই একলক্ষ টাকাই রামদুলালের সকল সৌভাগ্যের মূল। এই টাকা লইয়া তিনি সাধুতার সহিত নানাবিধ ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায় ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ হইতে লাগিল, এবং অচিরকাল মধ্যে তিনি একজন প্রধান বণিক হইয়া উঠিলেন। ক্রমে আমেরিকার সহিত বাণিজ্য করিতে লাগিলেন। সুবিবেচনা পূর্ব্বক বাণিজ্য দ্রব্য সকল নির্দ্ধারণ করিয়া তাহাদের জাহাজপূর্ণ করিয়া দিতেন, এবং তাহাদের আনীত দ্রব্যসকল এখানে অধিকতর লাভে বিক্রয় করিতেন। এইরূপ আমদানী ও রপ্তানি কার্য্যে এত লাভ হইতে লাগিল, যে তিনি শীঘ্রই ঋদ্ধিমান্ হইয়া উঠিলেন। আমেরিকায় তাঁহার এতাদৃশ সম্মান হইয়াছিল, যে একজন জাহাজের সত্বাধিকারী তাঁহাকে লক্ষ্মীমন্ত পুরুষ দেখিয়া তাঁহার নামে একটী জাহাজের নাম রাখিয়া ছিলেন। সেই জাহাজখানি রামদুলালের জীবিত কালের মধ্যে তিনবার কলিকাতায় আসিয়াছিল। আমেরিকার ন্যায় ইংলণ্ড, ফিলিপাইন, চীন প্রভৃতি বহুতর প্রদেশীয় বণিক সম্প্রদায়ের মাননীয় প্রতিনিধি হইয়াছিলেন। কোন ইংরাজ বণিকও ইঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। পোতাধ্যক্ষগণ সসম্ভ্রমে তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিত। এতদ্ব্যতীত তিনি তৎকালীন সর্ব্বপ্রধান অফিস ফারলি ফরগুসন নামক কোম্পানির মুচ্ছুদ্দি হইয়া ছিলেন। উৎকৃষ্ট চরিত্র, বিনয় এবং সূক্ষ্মতর দূর-দর্শন প্রভাবে তিনি অচিরকাল মধ্যে সকলের নিকট অনুরাগ ও সম্মান প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি বণিক সমাজে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। সুকৌশলে তিনি নানাবিধ জিনিষের একচেটিয়া ব্যবসায়ে প্রচুর লাভবান্ হইতে লাগিলেন। আমেরিকার বণিক সম্প্রদায় তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তত্রত্য প্রধান সেনাপতি ওয়াসিংটনের শরীর পরিমিত একচিত্র তাঁহাকে সম্মান ও স্নেহের চিহ্নস্বরূপ উপহার দিয়াছিলেন।

বিবাহ ও কর্ম্ম জীবন।

জলমগ্ন জাহাজ ক্রয় করিবার কয়েক মাস পূর্ব্বে মূলাযোড় গ্রামের কোন এক সর্ব্ব সুলক্ষণা পরম-সুন্দরী কন্যার সহিত রামদুলালের বিবাহ হয়। একটা প্রবাদ আছে যে "স্ত্রীভাগ্যে ধন"। বিবাহের পর হইতেই রামদুলালের ক্রমিক উন্নতি ও ঐশ্বর্য্য লাভ হইতে দেখিয়া, উক্ত প্রবাদের সত্যতায় লোকের সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। ইঁহার পত্নী দেখিতে যেমন লক্ষ্মীরূপিণী, তেমনি দয়া দাক্ষিণ্যাদি বিবিধ গুণে বিভূষিতা ছিলেন। রামদুলাল যেমন অপরিমিত অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন, গৃহিণীও তেমনি অপরিমিত দান করিতে আরম্ভ করিলেন। রামদুলালেরও দানের সীমা ছিল না। কখন কোন অর্থী ইঁহার নিকট হইতে রিক্ত হস্তে ফিরিয়া যায় নাই। ইনি প্রত্যহ নিজ অফিসে ৭০ টাকা দান করিতেন। হিন্দু-কলেজ প্রতিষ্ঠাকালে তিনি ৩০০০ টাকা দান করিয়াছিলেন। তাঁহার দানের কোন আড়ম্বর ছিল না। একবার ইনি মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষে লক্ষ-টাকা দান করিয়াছিলেন। দরিদ্র হইতে প্রভূত অধ্যবসায় ও সাধুতার প্রভাবে যেমন প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, তেমনি তিনি দরিদ্রের দুঃখ অনুভব করিয়া তাহা মোচনের নিমিত্ত সর্ব্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন। তজ্জন্য তিনি নানাস্থানে নানা কারণে প্রচুর দান করিয়া অনেকের অভাব মোচন করিয়াছিলেন।

তাঁহার গৃহিণীর দান শক্তি আরও চমৎকার, তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। একবার রামদুলাল অনেক বস্তা উৎকৃষ্ট দোরখা বনাত ক্রয় করিয়াছিলেন। উক্ত বনাতের দুই পৃষ্ঠে দুই রকম বর্ণ থাকায় উহা একচেটিয়া করিবার মানসে বাজারের সমস্ত দোরখা বনাত ক্রয় করিয়া কোষজাত করিলেন। তিন চারি মাস পরে যখন ঐ বনাত বাজারে আর পাওয়া যায় না, তখন তিনি এক চেটিয়া করিয়াছেন ভাবিয়া, এইবার

অধিক মূল্যে বিক্রয় করিবেন এই স্থির করিয়া, বারাণ্ডায় বসিয়া মুখ প্রক্ষালন করিতেছেন, এমন সময় দেখেন যে অনেক ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নান করিয়া, উক্ত বনাতে গাত্র আবরণ করিয়া, শীত নিবারণ করিতে করিতে সম্মুখবর্ত্তী পথ দিয়া গমন করিতেছেন। ইহাতে তিনি আশ্চর্য্য হইয়া অফিসে গমনপূর্ব্বক দালালগণকে তিরস্কার করিয়া উক্ত বনাত বাজারে যত অবশিষ্ট আছে, তৎ সমস্ত ক্রয় করিতে পাঠাইলেন। দালালগণ সমস্তদিন বৃথা ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যাকালে প্রত্যাগত হইয়া নিবেদন করিল, যে বাজারে কোন স্থানে এক গজও উক্ত বনাত পাওয়া গেল না। তখন তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, উক্ত ব্রাহ্মণগণ তবে কোথা হইতে ঐ বনাত প্রাপ্ত হইল ? রামদুলাল অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এই বিষয়ে প্রগাঢ় চিন্তা করিয়া শেষে গৃহে গমনপূর্ব্বক কোষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সমস্ত তথ্য অবগত হইলেন। তাঁহার ধর্ম্মশীলা গৃহিণী মাঘ মাসের শীতার্ত্ত ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া তাঁহাদের শীতক্লেশ নিবারণ করিয়াছেন। রামদুলালের বনাত বিক্রয়ের এক চেটিয়া লাভ, তাঁহার গৃহিণী কর্ত্তৃক পর্য্যবসিত হইল। পরদিন প্রাতে রামদুলাল উক্ত উৎকৃষ্ট বনাতের অবশিষ্টগুলি প্রতিবেশী ও বন্ধুগণের মধ্যে বিতরণ করিলেন।

আর একবার রামদুলাল ৬০০ বস্তা উৎকৃষ্ট চিনি ক্রয় করিয়া কোষজাত করিলেন। কিয়দ্দিবস পরে তাঁহার স্ত্রী বাটীতে তিনমাসকাল পুরাণ পাঠ করান। কথা শুনিবার জন্য তাঁহার বাটীতে প্রত্যহ অনেক রমণীর আগমন হইত। তিনি এই বহুসংখ্যক শ্রোত্রী রমণীকে তিন মাস কাল যাবৎ উক্ত চিনির সরবৎ পান করাইয়া তাহাদের পিপাসা দূর করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপারে ৫৬০ বস্তা চিনি জলসাৎ হইল। কেবলমাত্র ৪০ বস্তা অবশিষ্ট ছিল। এদিকে রামদুলাল চিনির দর খুব বৃদ্ধি হইয়াছে দেখিয়া উক্ত সমস্ত বস্তা চিনি এক সাহেবকে অধিক লাভে বিক্রয় করিলেন। মাল ওজন দিবার সময় দেখেন যে কেবলমাত্র ৪০ বস্তা

আছে। তখন তিনি অনুসন্ধানে জানিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী প্রতিবেশী রমণীগণের প্রত্যহ পিপাসা নিবারণার্থ সমস্ত খরচ করিয়াছেন। তিনি ভয়ানক বিরক্ত হইলেন। বিরক্ত হইবার প্রধান কারণ যে, তিনি অন্য লোকের নিকট উক্ত মাল বিক্রয় করিয়াছেন, অথচ মাল নাই, এক্ষণে কিরূপে ক্রেতার ক্ষতিপূরণ করিবেন? তখন তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহার স্ত্রীকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, তুমিই আমার "সৌভাগ্যের শনি"। তাঁহার স্ত্রী সমস্ত তিরস্কার সহ্য করিতেছিলেন, কিন্তু "সৌভাগ্যের শনি" একথা বলাতে আর তাঁহার সহ্য হইল না। একথা যেন তাঁহার হৃদয়ে শেল সম বিদ্ধ হইতে লাগিল। তখন তিনিও বাষ্পাকুলনেত্রে বলিতে লাগিলেন,—"আমাকে বিবাহ করিয়া সিপ-সরকারের কর্ম্ম হইতে ঐশ্বর্য্যের উন্নত শিখরে অধিরোহণ করিয়াছ, সুতরাং ঠিক—আমিই তোমার সৌভাগ্যের শনি! এই কথা বলিয়া তিনি ক্রোধোন্মত্তার ন্যায় শয়ন গৃহে গমনপূর্ব্বক অর্গল বদ্ধ করিলেন।

প্রাগুক্ত ঘটনায় রামদুলাল যেরূপ ক্রোধান্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার দীর্ঘ জীবনের মধ্যে একদিনও সেরূপ ক্রোধান্ধ হন নাই। তিনি সর্ব্বদাই বিনয়ী, কোমল ও মধুর স্বভাব ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলে "মহাপাত্র" বলিয়া গালি দিতেন। দুর্ব্বাক্য দ্বারা তাঁহার স্ত্রীর মনে কষ্ট দিয়া শেষে স্বয়ং ক্ষুব্ধ ও অনুতাপিত হইলেন; এবং অনেক সাধ্য সাধনার পর ১,০০০০০ এক লক্ষ টাকা জরিমানা দিয়া মানিনীর ক্রোধের উপশম করিয়া, উভয়ের হৃদয়ে শান্তি স্থাপনা করিলেন। তাঁহার গুণবতী স্ত্রীর হৃদয় এমনি কোমল ও দয়ার্দ্র ছিল, যে কোন সময়ে এক চোর তাঁহার রত্নাভরণ চুরি করিয়া ধৃত হয়। অভাব না পড়িলে কেহ চুরি করে না, এই বিশ্বাসে তিনি সেই সমস্ত স্তেয় দ্রব্যাদির সহিত তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। রমণী সমাজে এরূপ স্ত্রী চরিত্র অতি দুর্লভ।

এমন গুণবতী স্ত্রী সত্ত্বেও রামদুলালকে বাধ্য হইয়া দারান্তর গ্রহণ

করিতে হইয়াছিল। কারণ প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে একটি কন্যা ও একটী অন্ধ পুত্র জন্মিয়াছিল। পুত্রটীর সাত বৎসর পরে লোকান্তর হয়। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, যে প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে পুনর্ব্বার পুত্র সন্তান জন্মিয়' তাঁহার বিষয় আশয় সমস্ত রক্ষা করিবে, কিন্তু সে আশা বিফল হওয়াতে তিনি বন্ধুগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্ত্রীর অজ্ঞাতসারে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়া স্বতন্ত্র গৃহে রাখিয়া দিলেন। দ্বিতীয়ার গর্ভে পাঁচটী কন্যা এবং আশুতোষ ও প্রমথনাথ নামে দুইটী পুত্র হয়। ইঁহারা ছাতুবাবু ও লাটুবাবু নামে বিখ্যাত ছিলেন। প্রথমা স্ত্রী এই সমস্ত অবগত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিশয় মনের দুঃখে যাপন করিয়াছিলেন।

রামদুলাল তাঁহার পুত্রকন্যাদিগকে নানা শিক্ষার মধ্যে বিশেষরূপে বিনয় গুণের শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার একটী কন্যা কোন দরিদ্র কুলীন পাত্র কর্তৃক পরিণীতা হইয়াছিলেন। তিনি শ্বশুরালয়ে স্বহস্তে সমস্ত কার্য্য করিতেন। ধনীর কন্যা বলিয়া তিনি বসিয়া থাকিতেন না। তাঁহার যাতৃগণের স্বর্ণাভরণ না থাকাতে তিনি পিতৃদত্ত স্বর্ণালঙ্কারগুলি খুলিয়া রাখিতেন। রামদুলাল ইহা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া নিজ কন্যার ন্যায়, কন্যার যাতৃগণেরও অলঙ্কার প্রদান করিয়াছিলেন।

ঐশ্বর্য্য।

রামদুলাল মধ্যে মধ্যে মরিচ, লবণ, চিনি, কাচের বাসন প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করিয়া প্রায় এক চেটিয়া করিয়া ইচ্ছানুরূপ লাভে বিক্রয় করিতেন। ইহাতেই তিনি ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিলেন। তাঁহার নিজের চারিখানি বাণিজ্য জাহাজ ছিল। প্রথমখানি জ্যেষ্ঠা কন্যা বিমলার নামে, দ্বিতীয়খানি ফারগুসন কোম্পানির নামে, তৃতীয়খানি ডেভিড ক্লার্কের নামে এবং চতুর্থখানির নাম অজ্ঞাত ছিল। এই জাহাজ চতুষ্টয়

আমেরিকা, ইংলণ্ড, চীন, জাপান, মাণ্টা প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য দ্রব্য সম্ভার লইয়া গমনাগমন করিত। তিনি এতদূর ধনকুবের হইয়াছিলেন যে, আমেরিকার বণিকগণ তাঁহাকে বাঙ্গালার রথচাইল্ড আখ্যায় অভিহিত করিতেন। তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না। একবার তিনি একজন ইংরাজ বণিককে ৩৩,০০,০০০ তেত্রিশ লক্ষ টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলেন এবং তাঁহার অন্তঃকরণ এত প্রশস্ত ছিল যে, উক্ত টাকার অধিকাংশ আদায় না হইলেও তিনি কখন পীড়াপীড়ি বা বল প্রয়োগ করেন নাই।

এত উন্নতিতেও গর্ব্ব কখন রামদুলালকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি ক্রোরপতি হইলেও মদনমোহন দত্ত যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন ইনি সামান্য বেশে পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে মাসান্তে দশ টাকা বেতন লইয়া আসিতেন। তিনি কখনও আপনার সেই পূর্ব্বাবস্থা বিস্মৃত হন নাই। মহতের ইহাই প্রধান লক্ষণ।

দানশীলতা।

রামদুলালের বিনয় গুণই সমস্ত সৌভাগ্যের মূলীভূত কারণ। এই সদগুণের দ্বারাই তিনি সকলকার ভক্তিভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃতিতে অহঙ্কারের লেশমাত্র ছিল না। বদান্যতা, সহৃদয়তা, মিষ্টালাপ, অতিথি-সেবা ও ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতি গুণে তিনি সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন প্রায় চারিশত দরিদ্র প্রতিবেশীকে আহার দিতেন। প্রার্থিগণের অভাব তিনি সতর্কতার সহিত গুপ্তভাবে অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের বাসায় ব্যাঙ্কনোট প্রেরণ করিতেন। এই নোট কোথা হইতে আসিল, তাহারা তাহার কিছুই জানিতে পারিত না। কখন বা কাহার প্রতি একখানি পত্র দিয়া বলিতেন, বাটী গিয়া এই চিঠিখানি পড়িবে। তাহারা পত্র খুলিবা মাত্র নোট প্রাপ্ত হইত। তাঁহার দানের কোন আড়ম্বর ছিল না। এইরূপে গুপ্তভাবে তিনি অনেকের অভাব

মোচন কারতেন। পরদুঃখ মোচনেচ্ছা তাঁহার এত বলবতী ছিল যে, তিনি পরের দুঃখ অনুসন্ধানের জন্য বেতনভুক্‌ ভৃত্য রাখিয়াছিলেন; এবং তিনি স্বয়ং প্রতি রবিবারে সহচরগণের সহিত প্রতিবেশী ও ভৃত্যগণের গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিয়া সকলকার অভাব ও দুঃখ মোচন করিতেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার ব্যয়ে পীড়িতগণের চিকিৎসা ও ঔষধের নিমিত্ত তিনজন উপযুক্ত দেশীয় চিকিৎসক সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিত।

কোন সময়ে এক বাতুল, পিপীলিকা-ধৃত একটা মৃত কপোত আনিয়া রামদুলালকে দেখাইয়া বলিল "বলুন দেখি এটা কি?" তিনি বলিলেন এ মৃত পারাবতটী কোথা হইতে আনিলে?" তখন সেই বাতুল গম্ভীর-স্বরে বলিল—কি, এটা মৃত? যে লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত্তের মুখে আত্ম শরীর দান করিতেছে সে মৃত! আর আপনি নিশ্চিন্ত ভাবে অর্থের গদির উপর বসিয়া আছেন তাই জীবিত, ধিক আপনাকে!" এই বলিয়া বাতুল চলিয়া গেল। তখন তিনি যেন পাগলের মত হইলেন। তিনি সেই দিনই বেলগেছিয়ার বাগানে এক অতিথিশালা স্থাপন করিলেন। ঐ স্থানে প্রতিদিন সহস্র সহস্র ব্যক্তি আহার পাইতেন। এতদ্ভিন্ন তিনি নিজ বাটীতে প্রত্যহ প্রায় পাঁচশত দুঃখী কাঙ্গালী ও অতিথির সেবা করিতেন। ভৃত্যগণের প্রতি এই আদেশ ছিল যে, ভিক্ষুক উপস্থিত হইলে তাহার ভিক্ষাপাত্র যেন পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়।

কোন সময়ে রামদুলালের জমিদারী হইতে কতকগুলি প্রজা রাজস্ব দানে অসমর্থ হইয়া তাঁহার নিকট আসিয়াছিল। তিনি তাহাদের অবয়ব ও দরিদ্রতাপূর্ণ পরিচ্ছদ দেখিয়া মনে বড় কষ্ট পাইলেন। ভাবিলেন ইহারা এত গরীব, ইহাদের পীড়ন করিয়া অর্থ শোষণ করিলে আমার কখনও ভাল হইবে না। তিনি তাহাদিগকে উত্তমরূপে আহার করাইয়া এক একখানি নূতন বস্ত্র দিয়া, দেওয়ানের প্রতি আদেশ করিলেন, কল্য যে কোন মূল্যে এই জমিদারী বিক্রয় করিয়া ফেলিবে। ইহাতে যতই

লোকসান হউক, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। তিনি পুত্রগণকে শপথ করাইলেন, যেন কস্মিন্ কালে তাহারা জমিদারী ক্রয় না করে। আমরা বণিক, ব্যবসায় অর্থ উপার্জ্জন করিব, প্রজার শোণিত শোষণ করিয়া লাভবান হইবার প্রয়োজন নাই। এই জমিদারী হইতেই অনেকে সর্ব্ব-স্বান্ত হন। তাঁহার পুত্রেরা মেদিনীপুরের নাড়াজোল নামক জমিদারী বন্ধকসূত্রে ক্রয় করিয়াছিলেন; উহা রক্ষা করিতে তাঁহাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল।

কৃষ্ণপান্তির মত হলফ করিবার ভয়ে তিনিও কখন আদালতে উপস্থিত হইতেন না। তাঁহার এই মত জানিয়া অনেক প্রবঞ্চক তাঁহার নামে বৃথা নালিশ করিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট হইতে অর্থ আদায় করিত। এক ব্রাহ্মণ টাকা পাইবে বলিয়া তাঁহার নামে ২৪,০০০ টাকা নালিশ করে। তিনি কখনও কাহার এক কপর্দ্দকও ধারিতেন না। বরং তিনিই ব্রাহ্মণের নিকট কিছু টাকা পাইতেন। মোকর্দ্দমা চালাইলে পাছে ব্রাহ্মণ জালিয়াতে পড়ে এবং তাঁহাকে হলপ করিতে হয়, সেই ভয়ে তিনি উক্ত টাকা প্রদান করিয়াছিলেন।

তাঁহার উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় আর কত প্রদান করিব? তিনি প্রাচীন আমলাদিগের জন্য প্রতি মাসে ১৫০০ টাকা বৃত্তি দান করিতেন। ২২০০০ টাকা ব্যয় করিয়া তিনি কাশীতে ত্রয়োদশটী শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। এই উপলক্ষে তাঁহার গৃহিণী স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু দ্রব্যের সহিত তুলিত হইয়া তৎসমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে দান করিয়াছিলেন। এবং পঞ্চ দিবস পর্য্যন্ত কাঙ্গালীদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া অর্থ দান করিয়াছিলেন। পুত্রদের বিবাহ উপলক্ষে তিনি, তিন তিন লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। ইহা আড়ম্বর বা ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনার্থ নহে। তিনি প্রত্যেক অধ্যাপককে ১০০ টাকা দান করিয়াছিলেন। ভূরি ভোজ্যের আয়োজনে প্রতিবেশিগণ একপক্ষ কাল রন্ধন করিতেন না।

শেষ জীবন।

ভগবৎ কৃপায় রামদুলাল যেমন ভাগ্যবান্ ছিলেন, তেমনি চরিত্রগুণে তিনি দয়াবান্, সরল হৃদয়, সত্যনিষ্ঠ, পরোপকারক ও বিনয়ী ছিলেন। তৎকালে তাঁহার ন্যায় দেবতুল্য, সাধু প্রকৃতি, আদর্শ পুরুষ অতি অল্পই ছিল। তিনি দরিদ্রাবস্থা হইতে প্রভূত অধ্যবসায় ও সাধুতা প্রভাবে যেমন প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তেমনি দান ধ্যানে প্রচুর ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আহার্য্য অতি সামান্য মাত্র ছিল। দিবাভাগে সামান্য তরকারি ও অন্ন, কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও মিষ্ট এবং রাত্রে খানকতক রুটি মাত্র। তাঁহার পরিধানও সামান্য—ধুতি, ফ্লানেলের বেনিয়ান, লংক্লথের ছোট চাপকান ও একটী পাগড়ী। অফিসে যাইবার জন্য একখানি পালকী ছিল। পরিজনবর্গের অনুরোধে শেষ জীবনে একখানি গাড়ী ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি জীবন-ব্রত উদ্যাপন করিয়া ৭১ বৎসর বয়সে বাত ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। একদিন লিখিতে লিখিতে হঠাৎ ঐ পীড়া উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মূর্চ্ছিত করিল। তাঁহার বাক্য রুদ্ধ হইল, ক্রমে ক্রমে যাবতীয় মৃত্যু লক্ষণ প্রকাশিত হইল। চতুর্দ্দিকে হাহাকার পড়িল, পুত্র-কন্যাগণ রোদন রোলে গগণ বিদীর্ণ করিল। চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁহাকে তীরস্থ করা হইল। চতুর্দ্দিকে এই সংবাদ বিক্ষিপ্ত হইলে ফারলি-ফারগুসন্ কোম্পানীর অংশীদার মেলভিল সাহেব, নিকলসন নামক তৎকালীন প্রধান ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া সেই ক্রোরপতির নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের চেষ্টা ও ঔষধের গুণে তিনি এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন; কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল, তিনি কাজকর্ম্ম কিছুই করিতে পারিতেন না। সুতরাং তাঁহার উপযুক্ত পুত্র আশুতোষকে কাজকর্ম্ম ও বিষয় আশয় সমস্ত বুঝাইয়া দিলেন। পীড়া বৃদ্ধি হওয়ায় ও ক্রমশঃ মৃত্যু লক্ষণ প্রকাশ পাওয়াতে চিকিৎসকগণের পরামর্শে তাঁহাকে পুনরায় গঙ্গায়

তীরস্থ করা হয়। কিন্তু ভগবৎ কৃপায় সে যাত্রাও রক্ষা পাইলেন। তিনি দুইবার তীরস্থ হইয়া বাটী প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু ১৮২৫ খৃঃ অব্দের ১লা এপ্রেল তিনি মৃত্যুর নৃশংস কবল হইতে আর নিস্কৃতি পাইলেন না। পুত্রপৌত্রাদি আত্মীয় স্বজনকে গভীর শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া ৭৩ বৎসর বয়সে জাহ্নবী সলিলে এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিলেন।

মৃত্যুকালে তিনি এক কোটী ২৩ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া যান। তাঁহার দুটী পুত্র আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেব, পাঁচটী কন্যা এবং পৌত্র গিরিশচন্দ্র শ্রাদ্ধকালীন উপস্থিত ছিলেন। এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ৫ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। হস্তী, অশ্ব, পালকী প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে দান করা হয়। কাঙ্গালী বিদায়েই প্রায় তিন লক্ষ মুদ্রা দান করা হইয়াছিল। এক টাকার ন্যূন কাহাকেও দান করা হয় নাই। যে সকল দুঃখিনী গর্ভাবস্থায় আসিয়াছিল তাহাদের গর্ভস্থ শিশুকেও এক টাকা হিসাবে দেওয়া হইয়াছিল। যাহারা পক্ষী লইয়া আসিয়াছিল তাহারাও ঐরূপ হিসাবে দান পাইয়াছিল। বীডন ষ্ট্রীটের বসৎবাটী এখনও সেই-ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের নাম ও কীর্ত্তি স্মরণ করাইয়া দিতেছে, এবং যতদিন বঙ্গসমাজ থাকিবে, ততদিন তাঁহার যশঃসৌরভ কখনও বিনষ্ট হইবে না। তিনি দীন হীনের পিতা এবং বিপন্নের সহায় ছিলেন।





মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়।

প্রকৃত শক্তিশালী এবং অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি মানব-সমাজের আদর্শ। যিনি প্রতিভা ও ধর্ম্মবলে প্রকৃতির উচ্চস্তরে দণ্ডায়মান হইয়া ইঙ্গিতে উন্নতির সহস্রপথের প্রধান পথ দেখাইয়া থাকেন, তিনি যে একজন প্রকৃত মহাপুরুষ সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম-বিপ্লব, সমাজ বিপ্লব ও রাষ্ট্রবিপ্লবে জন সমাজ যখন আর অত্যাচার ও অবিচার সহ্য করিতে পারে না, তখন ভগবানের কোন মহদুদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ও সাধারণ লোক শিক্ষার জন্য, ইহ জগতে এক একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়া থাকে। যে সময়ে এ দেশের লোকের ধর্ম্মভাব শিথিল হইতেছিল, বেদের কর্ম্মকাণ্ড, উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান, তন্ত্রের গূঢ়রহস্য, কেবল তামসিক কুসংস্কারে পর্য্যবসিত হইতেছিল, যখন শ্মশানের জ্বলন্ত চিতানল নিঃসহায় বিধবাদিগের জীবন্ত দেহ ভস্মসাৎ করিয়া সমাজের অমানুষিক নিষ্ঠুরতার পরিচয় প্রদান করিতেছিল, তখন সেই ধর্ম্মবিপ্লবের সময়ে সমাজের হিতের নিমিত্ত, করুণাময় পরমেশ্বরের পবিত্র বিধানে, যুগপ্রবর্ত্তক এই মহাপুরুষ রামমোহন রায়, তিমিরাচ্ছন্ন অনল রাশির ন্যায় আবির্ভূত হইলেন।

বংশ পরিচয়।

রামমোহন রায় সম্বন্ধে প্রবন্ধ অবতারণার পূর্ব্বে পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত সংক্ষেপে তাঁহার বংশ পরিচয় ও জন্ম বিবরণ প্রদান করিব।

গলী জেলার অন্তর্গত থানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী রাধানগর গ্রামে ১১৮১ সালে (ইং ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে) রামমোহন রায় জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের আদি নিবাস মুর্শিদাবাদের অন্তঃপাতী শাঁকাসা গ্রামে ছিল। রামমোহন রায়ের প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নবাব সরকারে কর্ম্ম করিয়া "রায়" উপাধি প্রাপ্ত হন। তদবধি বংশ পরম্পরায় "রায়" উপাধি চলিয়া আসিতেছে। তিনি রাঢ়ী শ্রেণীর মধ্যে বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ উত্তম স্বভাব-কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাব কর্ত্তৃক তিনি হুগলী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি কয়েকটী জেলার রাজস্ব আদায়ের তহশীলদার নিযুক্ত ছিলেন। রাজস্ব আদায়ের কার্য্যোপলক্ষে কৃষ্ণচন্দ্রকে থানাকুল কৃষ্ণনগরে প্রায়ই গমনাগমন করিতে হইত। পরম বৈষ্ণব কৃষ্ণচন্দ্র এই স্থানের রমণীয়তা সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া এবং সুবিখ্যাত অভিরাম গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ গোপীনাথের শ্রীপাট দর্শন করিয়া, তৎসন্নিহিত রাধানগরে কিছু ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া, শেষ জীবন এই স্থানে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ইঁহার তিন পুত্র—অমরচন্দ্র, হরিপ্রসাদ ও ব্রজবিনোদ। কনিষ্ঠ ব্রজবিনোদের পঞ্চম পুত্র রামকান্তই রামমোহন রায়ের পিতা। ব্রজবিনোদ সম্পত্তিশালী পরম বৈষ্ণব ও পরোপকারক ছিলেন। তিনিও নবাব সিরাজুদ্দৌলার অধীনে মুর্শিদাবাদে কোন প্রধান পদের কর্ম্ম করিতেন। রামমোহন রায়ের পিতা রামকান্ত রায় নবাব সরকারে নয় লক্ষ টাকার ইজারাদার ছিলেন, কিন্তু তিনি দুর্ব্বৃত্ত নবাবের উপদ্রবে মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া পৈতৃক বাসভূমি রাধানগরে আসিয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

রামমোহন রায়ের পিতৃকুল বৈষ্ণব ও স্বভাব কুলীন, কিন্তু মাতামহ কুল শাক্ত ও ভঙ্গকুলীন। এই ভঙ্গ ও নিকষ কুলীনের বিবাহ সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা আছে। রামমোহন রায়ের পিতামহ ব্রজবিনোদ অন্তিমকালে ভাগীরথী তীরস্থ হইলে, শ্রীরামপুরের নিকটস্থ চাতরা



মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়।   (৯৮ পৃঃ)

Queen Press.

গ্রামনিবাসী শ্যাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়, তাঁহার বদান্যতা ও কৌলীন্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহার মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হন, এবং তাঁহার একটী প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাকে প্রতিশ্রুত করান। ব্রজবিনোদ শ্যাম ভট্টাচার্য্যের অভিসন্ধির মর্ম্মভেদ করিতে সমর্থ হন নাই। ভট্টাচার্য্য অবসর বুঝিয়া বিনীতভাবে ব্রজবিনোদের এক পুত্রের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব করিলেন। ব্রজবিনোদের সাতটী পুত্র ছিল। তিনি সকলকে সম্মুখে আনয়ন করাইয়া ভঙ্গকুলীন শাক্ত শ্যাম ভট্টাচার্য্যের নিকট তাঁহার প্রতিশ্রুতির বিষয় সকলকে অবগত করাইলেন। একে একে ছয় পুত্রই পিত্রাজ্ঞা পালনার্থ কুলধর্ম্মে জন্মের মত জলাঞ্জলি দিতে অস্বীকৃত হইলেন। পরিশেষে পঞ্চম পুত্র রামকান্ত পিতৃসত্য পালনে আগ্রহ সহকারে স্বীকৃত হন। ব্রজবিনোদ পরমানন্দে আশীর্ব্বাদ করিলেন—"ভগবান্ তোমায় সর্ব্বসুখে সুখী করিবেন, এবং তোমার সন্ততিগণ স্বচ্ছন্দে সর্ব্বত্র প্রতিপত্তি লাভ করিবে।" যথাসময়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয় রামকান্তকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। এই রমাকান্তের ঔরসে এবং শ্যাম ভট্টাচার্য্যের কন্যা তারিণী দেবীর গর্ভে তিনটী সন্তান জন্মে। প্রথমটী কন্যা, দ্বিতীয়টী পুত্র—নাম জগন্মোহন, তৃতীয় বা কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহন। রামলোচন নামে ইঁহাদের এক বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। রামমোহন রায়ের জননী তারিণী দেবী, ফুল ঠাকুরাণী নামে খ্যাত ছিলেন।

ফুল ঠাকুরাণী শাক্তের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিলেও পতিগৃহে আসিয়া বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিতা হন। একদা তারিণী দেবী কোন উৎসব উপলক্ষে কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহনের সমভিব্যাহারে পিত্রালয়ে গমন করেন। পিত্রালয়ে অবস্থানকালে একদিবস তাঁহার পিতা শ্যাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেবীপূজা সমাপনান্তে বিল্বপত্র গ্রহণপূর্ব্বক দৌহিত্র রামমোহনকে প্রদান করিলেন। শিশু রামমোহন বালক স্বভাববশতঃ নির্ব্বিকারে সেই বিল্বপত্র চর্ব্বণ

করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে তারিণী দেবী তৎক্ষণাৎ বিল্বপত্র ফেলিয়া দিয়া পুত্রের মুখ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন, এবং কুপিতা হইয়া পিতাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ইহাতে পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া কন্যাকে এই অভিসম্পাত করিলেন, যে, তুই যেমন গর্ব্ব করিয়া আমার মন্ত্রপূত বিল্বপত্র ফেলিয়া দিলি, তেমনি এই পুত্র লইয়া তুই কখনও সুখী হইতে পারিবি না, তোর এই পুত্র কালে বিধর্ম্মী হইবে। অভিসম্পাত শুনিয়া ফুল-ঠাকুরাণী কাতর হইয়া পুত্রের শাপ বিমোচনের জন্য পিতৃপদে লুণ্ঠিতা হইয়া মিনতি করিতে লাগিলেন। তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "আমার বাক্য অব্যর্থ, কিন্তু ভবিষ্যতে তোমার পুত্র দেশপূজ্য ও অসাধারণ লোক হইবে।" কথিত আছে, শ্যাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় রামমোহনকে বহু অর্থব্যয়পূর্ব্বক দ্বাবিংশতিবার পুরশ্চরণ করাইয়া ছিলেন। সম্ভবতঃ তাহারই ফলে ভবিষ্যতে তিনি দেশপূজ্য অসাধারণ লোক হইয়াছিলেন। যাহা হউক ফুল ঠাকুরাণী পতির নিকট অভিসম্পাতের কথা যথাযথ জ্ঞাপন করাইয়া বালক রামমোহনের ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন।

বিদ্যাশিক্ষা।

রামমোহন রায় বাল্যকালে গ্রামস্থ পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ করেন। পাঠশালার গুরুমহাশয় তাঁহাকে মেধাবী বালক দেখিয়া অতিশয় যত্ন করিয়া লেখাপড়া শিখাইতেন ও সাতিশয় স্নেহ করিতেন। যে সকল সদ্গুণের জন্য প্রতিভাশালী মহাপুরুষগণ দেশ-বরেণ্য হইয়া থাকেন, শৈশবেই সেই সকল সদ্গুণের বীজ তাঁহাদের হৃদয়ে পরিলক্ষিত হয়। শৈশবকালেই রামমোহনের অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধিশক্তির পরিচয় পাইয়া গ্রামবাসিগণ বিস্মিত হইয়াছিল। তিনি পাঠশালার সমপাঠী বালক-দিগের মধ্যে বয়সে সর্ব্ব কনিষ্ঠ হইলেও বিদ্যাবুদ্ধিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।

তাঁহার পিতা তাঁহার বিদ্যানুশীলনে প্রগাঢ় যত্ন ও অনুরাগ দেখিয়া বাঙ্গালা শিক্ষার সহিত তাঁহাকে তৎকাল প্রচলিত আরবী ও পারসীক ভাষা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিন্তু উক্ত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার জন্য নবম বৎসর বয়সে রামকান্ত তাঁহাকে পাটনায় প্রেরণ করিলেন। আজকাল যেমন ইংরাজী না শিখিলে কোন কাজের লোক হয় না, তদ্রূপ তৎকালে আরবী ও পারসীক ভাষা না জানিলে কাহারও নিকট আদর পাওয়া যাইত না এবং রাজপুরুষদের নিকট কোন কর্ম্ম পাইবারও সুবিধা হইত না। তৎকালে পাটনায় আরবী ও পারসীক ভাষা শিক্ষা করিবার সুবন্দোবস্ত ছিল। রামমোহন তথায় তিন বৎসর কাল মৌলবীদের নিকট অধ্যয়ন করিয়া ঐ দুইটী ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। পারস্য ভাষায় অনুবাদিত গ্রীকদিগের ভাল ভাল গ্রন্থ, বিশেষতঃ ইয়ুক্লিডের ক্ষেত্রতত্ত্ব ও অরিষ্টটলের তর্কশাস্ত্র পাঠ করিয়া তিনি বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণতর ও সুমার্জ্জিত করিয়াছিলেন। তৎপরে কোরাণ পাঠ করিয়া ও মৌলবীদিগের সংস্রবে থাকিয়া তাঁহার হৃদয়ে ক্রমশঃ পৌত্তলিকতায় বিদ্বেষ জন্মে ও একেশ্বরে বিশ্বাস হয়।

রামমোহন প্রথমে অত্যন্ত বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ ছিলেন। গৃহদেবতা রাধাগোবিন্দের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তি ছিল। কথিত আছে যে তিনি প্রতিদিন ভাগবতের এক অধ্যায় পাঠ না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। তাঁহার পুস্তক অধ্যয়নে এতদূর অনুরাগ ছিল যে, তিনি একদিন প্রাতঃকালে রামায়ণ পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কিছুমাত্র আহার না করিয়া সপ্তকাণ্ড রামায়ণ শেষ করিয়াছিলেন। ধন্য তাঁহার অধ্যবসায়! তাঁহার বাল্যকালের এমন ধর্ম্মময়জীবন পাটনায় পড়িতে গিয়াই ভিন্ন পথে প্রধাবিত হইয়াছিল। তথায় কোরাণ পাঠ করিয়া তাঁহার চিত্তের চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। ইহা দেখিয়া তাঁহার মাতা ফুলঠাকুরাণী পিতার অভিসম্পাত বিষয়ে অনুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি স্বামীকে

সর্ব্বদাই রামমোহনের ধর্ম্মশিক্ষা বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল হইতে বলিতেন। রামকান্ত রামমোহনকে হিন্দুধর্ম্ম বিশেষরূপে মর্ম্মজ্ঞ করিবার আশায় সংস্কৃত অধ্যয়নার্থ দ্বাদশবর্ষ বয়সের সময় কাশীতে প্রেরণ করিলেন। তিনি তথায় প্রথমে অল্পকালের মধ্যে সংস্কৃত ব্যাকরণ সমাপ্ত করিয়া নানাবিধ সাহিত্য পাঠ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহার বিচিত্র মেধা প্রভাবে তিনি অভিনিবিষ্ট চিত্তে প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্র সকল পাঠ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি বেদ উপনিষদ্ বেদান্ত প্রভৃতি গ্রন্থ সকল গভীর গবেষণার সহিত অধ্যয়ন করিয়া বুঝিলেন যে এক পরব্রহ্মই সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। হিন্দুশাস্ত্রে দেবতাগণের স্তুতি ও উপাসনা প্রণালী, ভিন্নপ্রকারে লিখিত হইলেও সকলই সেই এক ঈশ্বরের উদ্দেশে বর্ণিত। উপনিষদে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" লিখিত দেখিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তখন তিনি আপনার মত দৃঢ় করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রথমতঃ কোরাণের একেশ্বরবাদ তৎপরে প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের ব্রহ্মজ্ঞান, এই উভয় কারণই তাঁহার মত পরিবর্ত্তনের পক্ষে সহায়তা করিয়াছিল।

কাশী হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পিতার সহিত ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার মতভেদ হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে উভয়ের মধ্যে তর্ক বিতর্ক হইত। ইহা দেখিয়া ফুলঠাকুরাণী কেবল অভিশাপ বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্রমে রামমোহন হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া এক গ্রন্থ রচনা করিলেন। ইহার নাম "হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রণালী"। ১৭৯০ খ্রীঃ অব্দে ষোড়শ বৎসর বয়সে এই পুস্তকখানি প্রথম লিখিত হয়। তখন পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবার সুবিধা ছিল না। তিনি এই পুস্তক লেখাতে তাঁহার পিতা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। রামমোহন রায়ের সত্যানুরাগ ও সাহস কি বিস্ময়কর! ষোড়শ বৎসর বয়স্ক বালকের পক্ষে মূর্ত্তি পূজার

বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া কি সাধারণ ক্ষমতা? পিতা পুত্রের ব্যবহারে দুঃখিত হইলেন, মাতা অভিসম্পাতের বিষয়ে চিন্তিত হইলেন। রামমোহন ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিলে রামকান্ত অমনি তাঁহার উপর খড়্গ হস্ত হইতেন। ক্রমে বিরক্তির কারণ উভয়ের মধ্যে অনেক গুণে বৃদ্ধি হইল। ইহাতে পিতা পুত্রের মধ্যে আর সদ্ভাবের কোন সম্ভাবনা থাকিল না। রামকান্ত আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি অবিলম্বে পুত্রকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। রামমোহন পিতার দ্বেষ ও অবজ্ঞায় গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিঃসহায় অবস্থায় ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণরূপ সহায় সম্বল বিহীন অবস্থায় তিনি উত্তর পশ্চিম পরিভ্রমণ করিয়া শেষে হিমালয়ের কঠিন দুর্গম পথ উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক তিব্বতদেশে উপনীত হইলেন। তিব্বতে অবস্থিতির সময় তিনি ঐ দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া তদ্দেশীয় ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহার তিব্বত যাত্রার প্রধান কারণ—বৌদ্ধধর্ম্মের বিষয় অনুসন্ধান। তিনি উক্ত ধর্ম্মশাস্ত্র সকল পাঠ করিতে করিতে তথায় মহানির্ব্বাণ তন্ত্র দেখিতে পাইলেন। যে হিন্দুগণ তন্ত্রের দোহাই দিয়া থাকেন, সেই তন্ত্রে পর ব্রহ্মের বিষয় লিখিত রহিয়াছে দেখিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইলেন। অতি আগ্রহের সহিত তিনি ইহা সংগ্রহ করিয়া এদেশে আনিয়া ছিলেন। ভবিষ্যতে তিনি ইহার উপর নির্ভর করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপনা করিয়াছিলেন; এবং ধর্ম্মযুদ্ধের সময় নানা তর্ক বিতর্কে অনেককে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রামমোহন তিব্বতেও ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিজমত প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি নির্ভয়চিত্তে বৌদ্ধধর্ম্মের দোষ দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে তিব্বতবাসিগণ তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়া নানা অত্যাচার করিতে লাগিলেন। শেষে অনেকে তাঁহার জীবন নাশ করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি তিব্বতে যে বাড়ীতে বাস করিতেন, সেই

বাড়ীর স্ত্রীলোকগণ তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়া উক্ত বিপদ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করেন, এবং তাঁহাদের করুণ হৃদয়ের গুণে নানা বিঘ্ন সত্বেও প্রাণ পাইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মহাত্মা রামমোহন তদবধি নারীজাতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। তিনি আমরণ এই মহৎভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন, এবং নারীজাতির কল্যাণের নিমিত্ত চিরজীবন প্রাণপাত করিয়াছিলেন। সেই আত্মীয় বন্ধু বিহীন দেশে, অকুতোভয়ে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া এক-জন ষোড়শ বর্ষীয় বালকের পক্ষে কতদূর দুঃসাহসের কার্য্য তাহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে। রামমোহন বলিতেন যে জগতে সত্য ও সৎসাহসই মনুষ্যের সুদৃঢ় বর্ম্ম। এইরূপে তিনি চারি বৎসর কাল দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া ১২০১ সালে বিংশতি বৎসর বয়সে পিতৃ প্রেরিত লোকের সহিত গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। বহুদিবস পরে পিতা রামকান্ত পুত্রকে পাইয়া আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। সন্তান বৎসলা ফুলঠাকুরাণী হারানিধি প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ সলিলে নিমগ্ন হইলেন। কিয়দ্দিবস পরে রায় বংশ বহু বিস্তৃত হওয়াতে রামকান্ত সপরিবারে লাঙ্গলপাড়া গ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

পিতা কর্ত্তৃক পুনর্বর্জ্জন।

রামমোহন পিতা কর্ত্তৃক গৃহে আনীত হইবার পর নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত একাগ্রচিত্তে হিন্দুশাস্ত্র পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি হিন্দু-শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানরূপ যে কৌস্তুভ মণি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বক্ষে ধারণ করিলেন। তাঁহার চিত্ত প্রসারিত এবং হৃদয় বলিষ্ঠ হইল। তিনি শাস্ত্র পাঠে যে সত্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পিতার সহিত তাহা লইয়া আলোচনা করিতেন। আলোচনা প্রায়ই ঘোরতর তর্ক বিতর্কে পরিণত হইত। রামকান্ত কিছুতেই আর পুত্রকে আপন

অভীষ্টপথে আনয়ন করিতে পারিলেন না। তাঁহার সকল কৌশলই ব্যর্থ হইল। মাতাও ইহাতে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। রামমোহন তথাপি সাহসের সহিত সকল প্রকার কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। ইহাতে রামকান্তের ক্রোধাগ্নি প্রবলতর হইয়া উঠিল। তিনি পুনর্ব্বার পুত্রকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। কিন্তু এই সময়ে তিনি রামমোহনকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিতে লাগিলেন।

বিবাহ।

রামমোহনের তিন বিবাহ। প্রথমে তিনি বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী কুড়মন পলাশী নামক গ্রামে নবম বৎসর বয়সে বিবাহ করেন। অতি অল্প বয়সেই তাঁহার জ্যেষ্ঠা স্ত্রী ইহলোক ত্যাগ করেন। তৎপরে পিতার আদেশানুসারে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। শেষবিবাহ রামমোহন স্বেচ্ছায় * করিয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠা স্ত্রী উমা দেবীর পিত্রালয় কলিকাতার অন্তর্গত ভবানীপুরে ছিল। মধ্যমা স্ত্রীর গর্ভে রাধাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদ নামে দুই পুত্র জন্মে।

পিতৃবিয়োগ ও কর্ম্মগ্রহণ।

১৮০৩ খ্রীঃঅব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তিনি পৈতৃক সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ লইয়া সংসারী হইলেন। কথিত আছে রামকান্ত রায় মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে আপনার সমুদয় সম্পত্তি তিন পুত্রের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেন। বিষয়ের আয় হইতে রামমোহনের সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান না হওয়াতে তিনি অনন্যোপায় হইয়া অগত্যা রাজসরকারে কোন কর্ম্মের প্রার্থী হইলেন, এবং রাজস্ব সংক্রান্ত কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রঙ্গপুরে গমন করিলেন। প্রথমে তিনি রঙ্গপুরের কলেক্টর জন ডিগবীর অধীনে কেরাণীগিরি কর্ম্ম গ্রহণ করেন। তৎপরে কার্য্য দক্ষতার গুণে ক্রমে তিনি

দেওয়ানি পদে উন্নীত হন। তৎকালে বাঙ্গালীর পক্ষে ইহাই সর্ব্বোচ্চ পদ ছিল: এই সময়ে তিনি অনেক জমিদারী ক্রয় করিয়া একজন সম্পত্তি-শালী ব্যক্তি হইয়াছিলেন। তাঁহার আত্ম সম্মানবোধ এত প্রবল ছিল যে, তিনি কর্ম্ম গ্রহণের সময় কলেক্টর ডিগবী সাহেবের সহিত এরূপভাবে একটা চুক্তি করেন যে, তিনি কলেক্টরের সম্মুখে কখন দণ্ডায়মান থাকিবেন না, বা সামান্য কোন আমলার ন্যায় হুকুম তামিল করিবেন না। ডিগবী সাহেব রামমোহনের কার্য্য দক্ষতা, বিদ্যাবুদ্ধি ও কর্ত্তব্য শীলতায় এতাদৃক মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে ক্রমে উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুতা জন্মিয়াছিল এবং সেই বন্ধুতা স্থায়ী হইয়াছিল। তিনি ডিগবী সাহেবের অধীনে রামগড়, ভাগলপুর ও রঙ্গপুর এই তিন স্থানে প্রায় ১০ বৎসর কাল কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

রামমোহন ২২ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ইংরাজী ভাষা কিছুই জানিতেন না। এক্ষণে কার্য্যোপলক্ষে সদা সর্ব্বদা ইংরাজদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে হইত। তজ্জন্য কার্য্যকুশল রামমোহন এই সুযোগে ইংরাজী ভাষা এক প্রকার আয়ত্ত করিয়া লইলেন। ক্রমে তিনি ইহাতে এতদূর পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন, যে তৎকালীন ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ ডিরোজিও সাহেব পর্য্যন্ত তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। রামমোহন রায় সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী, আরবী, পারসী, উর্দ্দু, গ্রীক, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ ও হিব্রু এই দশ ভাষায় সম্যক ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ডাক্তার কার্পেণ্টার প্রভৃতি বিলাতের প্রধান প্রধান ব্যক্তি তাঁহার ইংরাজী ভাষার পাণ্ডিত্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।

পুত্রের বিবাহ।

রামমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদের বিবাহের সময় হিন্দু সমাজে তাঁহার জাতি লইয়া এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। ইহাতে প্রথম সম্বন্ধ

ভাঙ্গিয়া যায়। তৎপরে মেদিনীপুরে ইড়পালা গ্রামে, মহাসমারোহে তাঁহার উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আন্দোলনকারী বিপক্ষগণ ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া হিংসা ও বিদ্বেষ প্রযুক্ত রামমোহনের নামে "সুরাই মেলের কুল, তার বাড়ী খানাকুল, ওঁ তৎসৎ দ্বারে দিয়ে কচ্চে হুলস্থুল।" ইত্যাদি রূপ গীত রচনা করিয়া গাত্রদাহ নিবারণ করিল। এই সময়ে ঘরে বাহিরে রামমোহনের প্রতি নির্য্যাতন আরম্ভ হইল। চতুর্দ্দিকে উত্তাল তরঙ্গ, তাহার মধ্যে রামমোহন আপনার সাধন তরী ধীরে ধীরে গন্তব্য পথে লইয়া যাইতে লাগিলেন। কিছুতেই তাঁহার অটলভাব তিরোহিত হইল না।

সহিষ্ণুতা।

এই সময়ে কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রামনগর গ্রামে রামজয় বটব্যাল নামক একব্যক্তি রামমোহনের বিরুদ্ধে চারি পাঁচ সহস্র লোকবল লইয়া রণোদ্যত হইল। রামমোহন পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ ও ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করেন বলিয়া ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে নানাপ্রকারে কষ্ট দিয়া উৎপাত আরম্ভ করিল। তাহারা অতি প্রত্যুষে রামমোহনের বাটীর দ্বারদেশে কুক্কুটধ্বনি করিত এবং রাত্রে অন্তঃপুরে গোহাড় পর্য্যন্ত নিক্ষেপ করিত। ইহাতেও সেই ধৈর্য্যশীল মহাপুরুষের ধৈর্য্যচ্যুতি হয় নাই। তিনি সকল নির্য্যাতন সহ্য করিয়া মিষ্ট কথায় ও সদুপদেশে সকলকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। শেষে আপনা আপনি সকল গণ্ডগোল থামিয়া গেল।

বাহিরের উৎপাত থামিল বটে, কিন্তু কুলঠাকুরাণীর নির্য্যাতন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি পুত্রকে সম্পত্তিচ্যুত করিবার মানসে বিধর্ম্মী বলিয়া তাঁহার নামে সুপ্রীম কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। এই মোকদ্দমায় রামমোহনের জয়লাভ হইল। কিন্তু তাঁহার মাতৃভক্তি ও সহিষ্ণুতা এত প্রবল ছিল যে, ইহাতে তিনি কিছুমাত্র ক্ষুন্ন না হইয়া বরং তাঁহার বিষয় সম্পত্তির সমুদয় ভার জননীর উপর দিয়া তিনি একাগ্রচিত্তে

আবার শাস্ত্র পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। বিধাতা যাঁহাকে অমূল্য ধর্ম্মধনে ধনী করিয়াছেন, তিনি সামান্য পার্থিব বিষয়ে মুগ্ধ হইবেন কেন ? তখন তিনি অপূর্ব্ব ব্রহ্মানন্দরসে আপ্লুত হইয়া সত্যের পবিত্র জ্যোতি নিরীক্ষণ করিতেছেন, আর কি তিনি নিবিড় তমোময় পথে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারেন ? কথিত আছে ফুলঠাকুরাণী গৃহদেবতা রাধাগোবিন্দ ও কতকগুলি শালগ্রাম সম্মুখে রাখিয়া জমিদারী কার্য্য সকল পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

রামমোহন হিন্দুধর্ম্মের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে নানারূপ গ্রন্থ রচনা করাতে এবং মাতার সহিত এই বিষয় লইয়া নানা তর্কবিতর্ক করাতে তাঁহার ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি পুত্রকে পত্নীদ্বয় ও নব-বধূসহ বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। রামমোহন জননীর এপ্রকার আচরণে কিছুমাত্র ক্ষুন্ন না হইয়া নিকটবর্ত্তী রঘুনাথপুরে শ্মশান ভূমির উপর বাটী প্রস্তুত করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বাড়ীর সম্মুখে মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া, উহার চতুর্দ্দিকে "ওঁ তৎসৎ" এবং "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই বাক্য দুইটি খোদিত করিলেন। ঐ মঞ্চটি তাঁহার উপাসনার স্থান ছিল। কোথাও যাইতে হইলে তিনি শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে এই মঞ্চটি প্রদক্ষিণ করিতেন। এই মঞ্চটি দেখিয়া একদা তাঁহার কনিষ্ঠা স্ত্রী উমা দেবী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে কোন্ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ? ইহাতে রামমোহন উত্তর দেন, "গাভীসকল নানাবর্ণের কিন্তু সকলের দুগ্ধ একবর্ণ—নানা মুনির নানা মত, অতএব সত্য পথই সকল ধর্ম্মের সার পদার্থ।" রাম মোহনের এই নব নির্ম্মিত বাটীতে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠের বয়স তখন আঠার বৎসর।

কলিকাতায় আগমন ও আত্মীয় সভা।

কিছুকাল পরে রামমোহনের অগ্রজদ্বয়ের মৃত্যু হওয়ায় এবং তাঁহাদের সন্তানাদি না থাকায় তিনি সমস্ত পৈতৃক বিষয়ের অধিকারী হইলেন।

এইরূপে বিপুল বিভব হস্তগত হওয়ায় ইনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন এবং কিঞ্চিৎকাল মুর্শিদাবাদে অবস্থিতি করার পর ১৮১৪ খৃঃ অব্দে ৪০ বৎসর বয়সে কলিকাতায় আসিয়া, মাণিক তলায় একখানি বাড়ী ক্রয় করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এখন হইতে তাঁহার জীবনের কার্য্য প্রকৃতরূপে আরম্ভ হইল। তিনি অনন্যচিত্ত ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। যে সত্যের জন্য তাঁহাকে দুইবার পিতৃগৃহ হইতে তাড়িত হইতে হইয়াছিল, যাহার জন্য তিনি নীরব সাধনা করিতেছিলেন, এখন সেই যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তনরূপ হিত-সাধন ব্রতে তিনি অবতীর্ণ হইলেন। সেই ব্রহ্ম-জ্ঞানরূপ সত্য প্রচারে, তাঁহার সমুদয় অবকাশ, অর্থ, দেহ, মন, প্রাণ সমর্পণ করিলেন। শাস্ত্রজ্ঞানরূপ অস্ত্র, শস্ত্র ও বর্ম্মে সজ্জিত হইয়া তিনি পণ্ডিতগণকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টায় প্রথমে ১৮১৫ খৃঃ অব্দে মাণিক তলার ভবনে "আত্মীয় সভা" নামে একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। সপ্তাহে একদিন এই সভার কার্য্য হইত। শিবপ্রসাদ মিশ্র নামক জনৈক পণ্ডিত বেদ পাঠ করিতেন ও গোবিন্দ মালাকর নামক এক ব্যক্তি সঙ্গীত করিতেন। এতদিনে তাঁহার আশা অঙ্কুরিত হইল। কিন্তু সভা স্থাপনের পর চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার প্রতি অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি হইল। জয় কৃষ্ণ সিংহ নামক একব্যক্তি সর্ব্বত্র প্রচার করিলেন যে আত্মীয় সভায় গোবধ হয়। ইহাতে কলিকাতায় হুলুস্থূল পড়িয়া গেল; হাটে, মাঠে, চতুষ্পাঠীতে, চণ্ডীমণ্ডপে, বৈঠকখানায়, এমন কি অন্তঃপুর মধ্যেও আন্দোলনের স্রোত প্রধাবিত হইতে লাগিল। এইরূপ প্রতিকুল অবস্থায়ও রামমোহনকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে নাই। সমবেত বিরুদ্ধশক্তি নিচয়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ং" পর ব্রহ্মের রণ ভেরী বাজাইয়া এই স্থানে জয় পতাকা উড্ডীন করিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যা সমাগমে তিনি গম্ভীরভাবে ব্রহ্মোপসনা করিতে লাগিলেন। ধন্য তাঁহার সঙ্কল্প! ধন্য তাঁহার ধৈর্য্য!

তর্ক যুদ্ধ।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় এক মহাসভা আহূত হয়। আত্মীয় সভার লোকদিগকে পরাস্ত করিবার জন্য তৎকালের হিন্দু সমাজের অধিপতি রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর বড় বড় পণ্ডিতগণকে লইয়া এই সভায় আগমন করিলেন। এই সভায় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বিপক্ষ পক্ষের প্রধান পণ্ডিত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী প্রথমে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। রাম মোহনের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, অব্যর্থ যুক্তি কৌশল ও অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান, শাস্ত্রী মহাশয়কে পরাস্ত করিল। তৎপরে অন্যান্য সকল পণ্ডিতই রাম মোহনের নিকট পরাভব স্বীকার করিলেন। আত্মীয় সভার নিকট পণ্ডিতগণের পরাজয় বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইলে, বিপক্ষগণ ক্ষোভে ও অপমানে মর্ম্মাহত হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ইহার পর হইতেই কতকগুলি সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার গভীর বিদ্যা, মধুর ব্যবহার ও অদ্ভুত প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইলেন। এই বাদ প্রতিবাদের সময়ে সকলেই তাঁহার সুশীলতা, নম্রতা ও বিনয়গুণে মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। ইঁহাদের মধ্যে দ্বারকনাথ ঠাকুর, সুপ্রসিদ্ধ প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের পিতা গোপী মোহন ঠাকুর, রাজ নারায়ণ বসুর পিতা নন্দ কিশোর বসু, জষ্টিস অনুকুল মুখোপাধ্যায়ের পিতা বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ রাজেন্দ্র লাল মিত্রের পিতামহ বৃন্দাবন মিত্র, যোড়াসাঁকোর ব্রজ মোহন মজুমদার, গড়পারের নিমাই চরণ মিত্র, টাকীর কালী নাথ রায়, আন্দুলের কাশীনাথ মল্লিক, তেলিনীপাড়ার অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপীনাথ মুন্সী, দ্বারকা নাথ মুন্সী, রাজা বদন চন্দ্র রায়, ভূকৈলাসের রাজা কালী শঙ্কর ঘোষাল, তারা চাঁদ চক্রবর্ত্তী, চন্দ্র শেখর দেব, হলধর বসু, রাম নৃসিংহ মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত রঘুরাম শিরোমণি, হরনাথ তর্কভূষণ, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি অনেক পদস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের জন্য রাজার সহিত বন্ধুতাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

ব্রাহ্ম সমাজ।

রাম মোহন প্রথমতঃ এডাম সাহেবের "ইউনিটেরিয়াল সোসাইটিতে" যাইয়া উপসনায় যোগদান করিতেন। সেখানে একেশ্বর বাদী খৃষ্টান-দিগের নিয়মানুসারে উপাসনা হইত। একদিন উপাসনান্তে তিনি সদলে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময়ে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী এবং চন্দ্রশেখর দেব প্রস্তাব করিলেন যে, আমাদের ঐরূপ একটি উপাসনা গৃহ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। রাম মোহন এই প্রস্তাবটী শিরোধার্য্য করিলেন। তৎপরে দ্বারকা নাথ প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া জোড়া-সাঁকো চিৎপুর রোডের উপর কমল বসুর বাটী ভাড়া লইয়া ১৮২৮ খৃঃ অব্দের ৬ই ভাদ্র তারিখে প্রকৃতরূপে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হইল। ঐদিন ব্রাহ্ম-গণের স্মরণীয় দিন। ঐস্থানে প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত বেদ, উপনিষদ্ পাঠ, ব্যাখ্যা ও সঙ্গীত হইত। এইরূপে এদেশে ব্রাহ্ম সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার কিছুদিন পরে অর্থ সংগৃহীত হইলে চিৎপুর রোডের পার্শ্বে বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হয়। এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া রাম মোহন ঘোষনা করিলেন—"এখানে নিরাকার পূর্ণ ব্রহ্মের উপাসনা হইবে, কোন প্রকার মূর্ত্তি পূজা হইবে না। কোন জীব-হিংসা হইবে না। অন্য কোন ধর্ম্মকে ঘৃণা বা অবজ্ঞা করা হইবে না। এক মাত্র পরমেশ্বরের ধ্যান ধারণার জন্য উপদেশ, বক্তৃতা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইবে।"

ধর্ম্ম প্রচারের জন্য রাম মোহন চতুর্ব্বিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রথম—উপদেশ তর্ক ও বিতর্ক, দ্বিতীয়—বিদ্যালয় স্থাপন দ্বারা ও নানা উপায়ে শিক্ষা দান, তৃতীয়—পুস্তক প্রচার ও চতুর্থ—সভা সংস্থাপন। এখন হইতে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কেবল ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারেই নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে এদেশের অজ্ঞ লোক সকল খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণের

বক্তৃতার কুহকে মুগ্ধ হইয়া প্রায়ই খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিত। কিন্তু মহাত্মা রাম মোহনের অধ্যবসায়ের ফলে এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হওয়াতে অনেকে খৃষ্টান না হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। ইহাতে খৃষ্টানগণ রাম মোহনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। শ্রীরামপুরের "সমাচার চন্দ্রিকায়" ১৮২১ খৃষ্টাব্দে ১০ই জুলাই তারিখে হিন্দু শাস্ত্রের বিরুদ্ধে খৃষ্টানগণ এক পত্র প্রকাশ করেন। রাম মোহন তাহার যে উত্তর দেন, পত্রিকায় তাহা প্রকাশিত হয় নাই। তজ্জন্য তিনি 'ব্রাহ্মণ সেবধি' নামক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া শিব প্রসাদ শর্ম্মা নাম দিয়া প্রতিবাদ করিলেন। এইরূপে পাদ্রী-গণের সহিত বিবাদের সূত্রপাত হয়। বাইবেলে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তিনি হিব্রু ও গ্রীক্ ভাষা শিক্ষা করিয়া "খৃষ্টের উপদেশ—সুখ ও শান্তিপথের নেতা" এই নামে একখানি বঙ্গ ভাষায় পুস্তক প্রচার করিলেন। ইহাতে যীশুর রক্তে পাপীর ত্রাণ ইত্যাদি কুসংস্কার মূলক মত বর্জ্জন করিলেন। পাদ্রীরা বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। মার্সম্যান সাহেব প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু রাম মোহনের সুযুক্তি পূর্ণ অপূর্ব্ব তর্ক কৌশলে সকলে পরাস্ত হইলেন। একদিকে যেমন পাদ্রীগণ, অন্যদিকে তেমনি পণ্ডিতগণ তাঁহার সহিত তর্ক যুদ্ধ করিতেন। গৌরী কান্ত ভট্টাচার্য্য, দিগম্বর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণের সহিত তাঁহার প্রায়ই বাদানুবাদ হইত। এইরূপে ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও খ্রীষ্টানদিগকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তিনি বিজয় দুন্দুভি নিনাদিত করিলেন। ইহাতে তাঁহার কত বিদ্যা বুদ্ধি ও শাস্ত্রজ্ঞান, কত পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার, কত চিন্তা ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন হইয়াছিল, চিন্তা করিলে তাঁহাকে অবতার ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? এদেশে তখন এমন কোন পণ্ডিত ছিলেন না, যিনি তাঁহাকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যখন দেশশুদ্ধ লোক তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, তখন তদীয় ভাগিনা গুরুদাস মুখোপাধ্যায় প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তৎপ্রতিশোধ গ্রহণে দৃঢ় সঙ্কল্প হইলেন। ইহাতে রামমোহন

ক্রোধপরায়ণ গুরুদাসকে শান্ত করিয়া বলিয়াছিলেন "যন্ত্রণা সুখের পথ প্রদর্শক, বিপদ সম্পদের মূল। আলোকময় পথে সহজে যাওয়া যায়, কিন্তু অন্ধকারময় পথ উত্তীর্ণ হওয়াই মহৎ নামের উপযুক্ত। যাহার যাহা ইচ্ছা করুক, তাহাতে দৃকপাত না করিয়া পবিত্র অভীষ্ট পথে চলিলেই হইল।" এইরূপে পুরুষ-সিংহ রামমোহন সেই সকল অত্যাচার ও বিপদের মধ্যে অচলবৎ দণ্ডায়মান থাকিয়া সাহস ও ধৈর্য্যের সহিত নিজ ব্রত পালন করিতে লাগিলেন।

পুস্তক প্রচার।

রামমোহন রায় প্রথমে বেদান্তসূত্রের ভাষ্য বাঙ্গালায় প্রচার করেন। এই পুস্তকখানি তাঁহার সমস্ত তর্ক ও যুক্তির ভিত্তিস্বরূপ ছিল। বেদান্ত ভাষ্য ১৮১৫ অব্দে মুদ্রিত হয়। ইহাতে বেদব্যাস প্রণীত বেদান্তের সূত্র এবং শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্য থাকায় ইহা কাহারও অগ্রাহ্য করিবার উপায় ছিল না। ইহার ভূমিকায় তিনি বিপক্ষগণের আপত্তি সকল খণ্ডন করেন। তাঁহার ব্রহ্মবাদ প্রচারের জন্য এই পুস্তকখানিতে তিনি বেদান্ত ভাষ্যের হিন্দী ও ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিলেন। তিনি নিজ ব্যয়ে এই সকল পুস্তক মুদ্রিত করিয়া জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিতে লাগিলেন। বেদান্তসার—বেদান্তসূত্র বৃহৎ গ্রন্থ, তজ্জন্য তিনি ইহার সারসঙ্কলন পূর্ব্বক "বেদান্তসার" নামক গ্রন্থ বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষায় প্রকাশ করেন। পাদরিগণ ইহা পাঠ করিয়া বিস্মিত হন, এবং ইহার দ্বারা তিনি ইউরোপেও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮১৬ খৃঃ অব্দে কেন ও ঈশোপনিষদের অনুবাদ, এবং ১৮১৭ অব্দে কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্যোপনিষদের অনুবাদ, এই পাঁচখানি উপনিষদ এবং হিন্দু একেশ্বরবাদ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ইংরাজী ও বাঙ্গালাতে প্রকাশ করেন। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে "গায়ত্রীর অর্থ" প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি দেখান যে ব্রাহ্মণগণ প্রতিদিন যে গায়ত্রী জপ করেন, তাহা সেই পরব্রহ্মেরই

উপাসনা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ইহারই বিশদ ও বিস্তৃত ভাবে প্রমাণাদি দিয়া ১৮২৭ খৃঃ অব্দে তিনি "গায়ত্র্যাঃপরমোপাসনবিধানং" নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে সতীদাহ সম্বন্ধে প্রথম বিচার পুস্তক, বৈষ্ণব গোস্বামীর সহিত বিচার পুস্তক, সতীদাহ পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮১৯ খৃঃ অব্দে সতীদাহ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তক, মুণ্ডক ও কঠোপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ প্রভৃতি গ্রন্থের পর গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া স্বীয় প্রতিভা বিস্তার করিতে লাগিলেন।

এই সকল গ্রন্থ খৃষ্টানদিগের মিসন প্রেসে মুদ্রিত হইত। কিন্তু ১৮২০ খৃঃ অব্দে "খ্রীষ্টের উপদেশ—সুখ ও শান্তি পথের নেতা" নামক পুস্তক প্রকাশ করাতে, পাদরীগণ বিরক্ত হইয়া তাঁহার ছাপার কার্য্য বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া অক্ষরাদি প্রস্তুত করাইয়া এক মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিলেন। এখন হইতে তাঁহার সকল পুস্তকই ঐ ছাপাখানা হইতে প্রকাশিত হইতে লাগিল। এখনকার ডেলিনিউস পত্রিকার তদানীন্তন নাম ছিল "ইণ্ডিয়ান হরকরা"। উক্ত পত্রিকায় মিঃ টাইলার সাহেব এই সময়ে রামমোহনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। রামমোহন "রামদাস" নাম দিয়া এই উত্তর প্রদান করেন যে, হিন্দুগণ যেমন অবতার ও বহুদেবতার পূজা করেন, খৃষ্টানগণও তেমনি দেবতা ও ত্রিত্ববাদী। মূলে উভয় সম্প্রদায়ই এক। ইহাতে খৃষ্টানগণ ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন; কত বাদ প্রতিবাদ হইল। এডাম নামক একজন ত্রিত্ববাদী খ্রীষ্টান রামমোহনকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে প্রয়াস পান, ফলে সেই সাহেবই ১৮২১ খৃষ্টাব্দে একেশ্বর বাদে দীক্ষিত হইলেন। ১৮২১ খৃঃ অব্দে তিনি "ব্রাহ্মণ সেবধি" নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই সময়ে তিনি খৃষ্টানদিগের জন্য চারিখানি সুসমাচার পুস্তকের অনুবাদ ও "পৌত্তলিক মুখ চপেটিকা" নামে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সুযুক্তিপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি রংপুরে অবস্থান কালে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

আরব্য ভাষায় তিনি "তোহপ তুল মা আহিদিন" নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর তিনি "সংবাদ কৌমুদী" নামক একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। রাজনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ক প্রস্তাবে ইহার কলেবর পূর্ণ থাকিত। মুর্শিদাবাদে অবস্থান কালে তিনি "পৌত্তলিকতা সকল ধর্ম্মের বিরুদ্ধ" এই নাম দিয়া একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। পারস্য ভাষায় আকবরী নামে এক খানি পত্রিকা ও ১৮২৩ খৃঃ অব্দে "প্রার্থনা পত্র" প্রকাশিত হয়। শঙ্করাচার্য্য প্রণীত "আত্মানাত্ম বিবেক" বাঙ্গালা অনুবাদসহ মূলগ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৮২৮ খৃঃ অব্দে "ব্রহ্মোপাসনা" প্রকাশিত হয়। ১৮২৯ খৃঃ অব্দে "অনুষ্ঠান" নামে আর একখানি গ্রন্থ এবং অনেকগুলি ব্রহ্ম সঙ্গীত রচনা করেন। তাঁহার সঙ্গীত গুলি সংসারের অনিত্যতা ও ইন্দ্রিয় দমনের আবশ্যকতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। শুদ্ধ যে গীতগুলি একেশ্বরবাদ প্রতিপাদক তাহা নহে। ইহাতে পাষণ্ডকেও পরমেশ্বরের প্রতি অনুরাগী করে ও বিষয়-নিমগ্ন মনকে উদাসীন করিয়া তুলে।

রামমোহন রায়ের সময়ে বা পূর্ব্বে এদেশের ভাল গদ্য গ্রন্থের প্রচলন ছিল না। প্রায় সমস্ত গ্রন্থই পদ্যে লেখা হইত। কবি কঙ্কন, চণ্ডিদাস, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবিগণের কাব্য লোকে পাঠ করিত। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে উৎকৃষ্ট গদ্য রচনা আরম্ভ করেন। তখন বাঙ্গালা ব্যাকরণ ছিল না, তিনি সর্ব্বপ্রথমে এদেশে "গৌড়ীয় ব্যাকরণ" লিখিয়া সে অভাব মোচন করেন। ভূগোল ছিলনা, তিনিই সর্ব্ব প্রথমে ভূগোল প্রণয়ন করেন। এইরূপে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি করিয়া যান। বালকদিগের সুশিক্ষার জন্য সেই সময়ে কলিকাতায় কোন বিদ্যালয় না থাকাতে তিনিই গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়া কৃতকার্য্য হন। তাঁহারই চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হয়। তিনি অনেক গুলি ইংরাজী গ্রন্থ এবং বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতি কল্পে

নানাবিধ বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া দেশের লোকের জ্ঞান চক্ষু খুলিয়া দেন। এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের জন্য তিনি যোদ্ধার ন্যায় অকুতোভয়ে প্রাণপণে আজীবন খাটিয়া গিয়াছেন। তিনি যথার্থই অসাধারণ প্রতিভা লইয়া ইহ জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন।

সতীদাহ।

রামমোহন রায়ের জীবনের প্রধান কার্য্য সতীদাহ নিবারণ। সেই ঘোর কুসংস্কারাপন্ন অজ্ঞযুগে দুর্ভাগিনী বঙ্গ বিধবাগণকে জ্বলন্ত হুতাশনের ভীষণ জ্বালা হইতে রক্ষা করিতে তিনিই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ মহা-পুরুষ ছিলেন; এবং তিনিই সতীদাহের দারুণ ব্যাপার চিরদিনের জন্য উচ্ছেদ করিয়া গিয়াছেন। নচেৎ সেই নিষ্ঠুর প্রথার শাসনে আজও পর্য্যন্ত অভাগিনী বঙ্গ বিধবাগণের জীবন্ত দেহ প্রতিদিনই ভস্মসাৎ হইত। সমগ্র ভারতের এত জনসঙ্ঘের মধ্যে দীনা বিধবাগণের জীবনদান করিতে যথার্থই তিনি অসাধারণ মহত্ত্ব ও দেবত্ব লইয়া অবতার-রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রামমোহন রায় যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই সতীদাহের ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ব্যাপার দেখিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত না উক্ত প্রথা রহিত হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তিনি তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন। তিনি সেই প্রতিজ্ঞা কখন বিস্মৃত হন নাই তিনি এই সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিলেন; এবং ইহা যে শাস্ত্র সম্মত নহে তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য উপর্য্যুপরি পুস্তক ও পুস্তিকা প্রচার, গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দান প্রভৃতি বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই তমসাচ্ছন্ন হিন্দুসমাজ হইতে নারীহত্যা-রূপ মহাপাতক বিদূরিত করিবার জন্য তিনি যে কিরূপ অধ্যবসায়, পরিশ্রম, যত্ন ও মনঃ প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

১৮১১ খৃঃ অব্দে রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃপত্নী সহমৃতা হইবার জন্য প্রস্তুত হইলে, তিনি তাঁহাকে অনেক নিবারণ করিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না। তৎপরে যখন তিনি চিতায় উঠিলেন এবং চতুর্দ্দিক হইতে অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল, তখন তিনি হুতাশনের ভীষণ জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া চিতা হইতে লম্ফ প্রদান করিলেন। তখন তাঁহার আত্মীয় স্বজন এবং পুরোহিত সেই পলায়ণ-পরায়ণা রমণীকে ধৃত করিয়া চিতায় আরোহণ করাইয়া বৃহৎ বংশদণ্ড দ্বারা তাঁহাকে চাপিয়া ধরিলেন। তিনি চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পাছে তাঁহার আর্ত্তনাদে কাহারও মন বিগলিত হয়, তজ্জন্য ঢাক ঢোলের উচ্চ বাদ্যরোলে কর্ণ বধির করিয়া তুলিল। ইহা দেখিয়া রামমোহন দুঃখে ও ক্রোধে হুতাশনবৎ জ্বলিতে লাগিলেন এবং সেই শ্মশানে বজ্রসম দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"যতদিন পর্য্যন্ত এই নৃশংস প্রথা এদেশ হইতে দূর করিতে না পারি ততদিন আমি নিরস্ত থাকিব না।"

সতীদাহের পূর্ব্বাবস্থা।

সতীদাহের ইতিহাসের বিষয় আলেচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, যে, পূর্ব্বে যখন মুসলমান সম্রাটগণ এদেশ শাসন করিতেন, তখন তাঁহারাও এই নৃশংস ব্যাপার নিবারণ করিতে বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। তৎপরে এদেশে ইংরাজ রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সময়ে রাজপুরুষগণের দৃষ্টি এই নিষ্ঠুর প্রথার উপর পতিত হইয়াছিল। পাছে এদেশের লোকের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা হয়, এই ভয়ে তাঁহারা সর্ব্বদা সঙ্কুচিত থাকিতেন। তাঁহাদের সমক্ষে শতশত বিধবাকে মৃতপতির চিতানলে দগ্ধ করা হইত, তাহা তাঁহারা দেখিয়াও দেখিতেন না। লর্ড ওয়েলেসলির শাসনকালের শেষ ভাগে প্রথম সতীদাহ নিবারণের চেষ্টা হইয়াছিল। ১৮০৫ খৃঃ অব্দের ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে নিজামত আদালতের পণ্ডিত ঘনশ্যাম শর্ম্মা এ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টকে যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম্ম এই—"যাঁহারা

সহমরণের জন্য প্রস্তুত হন, তাঁহাদের শিশু সন্তান থাকিলে, গর্ভবতী হইলে, ঋতুকাল হইলে, কিম্বা নাবালিকা অবস্থা হইলে, তাঁহারা সহমৃতা হইবার যোগ্যা নহেন। কোন উৎকট ঔষধ বা মাদক দ্রব্য সেবন করাইয়া কোন সতীকে সহমরণে উত্তেজিত করা শাস্ত্র বিরুদ্ধ।" ১৮০৫ খৃঃ অব্দে লর্ড ওয়েলেসলি, লর্ড কর্ণওয়ালিস ও সার জর্জ্জবার্লো এই তিনজন গবর্ণর জেনারেল ছিলেন। তাঁহাদের সময় সতীদাহ সম্বন্ধে কোন কার্য্যই হয় নাই। ১৮১২ খ্রীঃ সতীদাহ নিবারণের জন্য আবার চেষ্টা হইতে লাগিল। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিসের রিপোর্ট সংগ্রহ হইতে লাগিল। এই সময় রামমোহন রায় ইহা নিবারণের জন্য আন্দোলন উপস্থিত করিতে লাগিলেন। ফলে কিছুই হয় নাই। ১৮১৫ খ্রীঃ মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস গভর্ণর হইলে হুগলি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ অকলে হেষ্টিংসকে এই প্রথার বিরুদ্ধে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লেখেন যে, ইহা আইনের দ্বারা নিবারণ করিলে, কেবল সতীদিগের অর্থ লোলুপ উত্তরাধিকারী ভিন্ন আর কেহই আপত্তি করিবে না। হেষ্টিংস বাহাদুর অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারি-লেন না। তৎপরে ১৮২৩ খ্রীঃ লর্ড আমহার্ষ্ট গভর্ণর জেনারেল হইলে সতীদাহ নিবারণের আবেদন পত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। ১৮২৫ খৃঃ অক্টোবর মাসে তাঁহার সম্মুখে এক সহমরণের ভীষণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। ইহাতে উক্তপ্রথা নিবারণ সম্বন্ধে তিনি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট রামমোহনের দলস্থ ব্যক্তিগণ দ্বিতীয়বার আবেদন করিলেন। কিন্তু তিনি ব্রহ্মযুদ্ধের জন্য বিলাতের প্রভুদিগের নিকট অপ্রিয় হইয়া ছিলেন। সেইজন্য তিনি একবারে এপ্রথা রহিত করিতে সাহসী না হইয়া কতকগুলি কঠিন নিয়ম স্থাপন করিলেন। নিয়ম গুলি এই—

(১) সতীকে স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইয়া অনুমতি পত্র লইতে হইবে। অন্য কাহার দ্বারা আবেদন করিলে হইবে না।

(২) সতীকে স্বামীর দেহের সহিত একত্র দগ্ধকরা হইবে। মাদকতা সেবন করাইয়া বা অন্য কোনরূপে বল পূর্ব্বক হত্যা করা হইবে না।

(৩) যাহারা সহমরণে সহায়তা করিবে তাহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট কোন কর্ম্ম পাইবে না।

(৪) সতীর মৃতপতির কোন সম্পত্তি থাকিলে তাহা গবর্ণমেণ্টের বাজেয়াপ্ত হইবে।

এই বিধি প্রচার হইলে হিন্দুসমাজ মধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সহস্র সহস্র ব্যক্তির স্বাক্ষর করাইয়া এই নিয়ম রহিত করিবার জন্য এক আবেদন পত্র প্রেরিত হইল। রামমোহনের উপর সকলে অজস্র গালি বর্ষণ করিতে লাগিল। তাঁহার নামে কত রকমের গীত রচিত হইল। কিন্তু তিনি অম্লান বদনে ও অবিকৃতচিত্তে এ সব উপদ্রব সহ্য করিয়া অযুত হস্তীর বলে নিত্য নব উদ্যমে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি "প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের প্রথম সংবাদ" ও দ্বিতীয় সংবাদ নামক পুস্তকদ্বয় বঙ্গ ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে লিখিলেন, এবং ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়া নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া সর্ব্বত্র বিতরণ করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ হেষ্টিংসের সহধর্ম্মিনীর নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ১৮২৮ খৃঃ অব্দে ১৫ই মার্চ্চ "সংবাদ কৌমুদীতে" একটী সতীদাহের ভীষণ বিবরণ প্রকাশ করেন। বিবরণটী এই—"কলিকাতায় গঙ্গাতীরে একজন সতী অর্দ্ধ দগ্ধ অবস্থায় চিতা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া কয়েকজন ইংরাজ কর্ত্তৃক প্রাণ পায়।" "বিপ্রনাম" এবং "মুগ্ধবোধছাত্র" নামধেয় তৃতীয় পুস্তক ১৮৩০ খৃঃ অব্দে প্রকাশ করেন। এই তিনখানি পুস্তকের দ্বারা তিনি গভর্ণমেণ্টের মত পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার নামে এই বিষয়ে বিস্তর প্রশংসা ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত হয়। এবং এই নৃশংস প্রথা শীঘ্র রহিত হইবে বলিয়া গভর্ণমেণ্ট আশ্বাস প্রদান করেন।

১৮২৮ খ্রীঃ অব্দে ১২ই মার্চ্চ লর্ড আমহার্ষ্ট পদত্যাগ করিলে, ৪ঠা জুলাই লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসিলেন। রামমোহনের প্রাণগত অক্লান্ত চেষ্টায় দেশের শিক্ষিত লোক ও গভর্ণমেণ্ট বুঝিলেন যে সতীদাহ অতি নৃশংস প্রথা এবং ইহা শাস্ত্র সম্মত নহে। বেণ্টিঙ্ক অতি সদাশয় ও উদার প্রকৃতির গভর্ণর ছিলেন। তিনি রামমোহনের সতীদাহ সম্বন্ধে সদ্‌যুক্তি, স্বার্থত্যাগ ও অসামান্য পরিশ্রম ও শাস্ত্র বিচার দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তিনি রামমোহনের সহিত দেখা করিবার জন্য এডিকংকে পাঠাইলেন। রামমোহন বেণ্টিঙ্কের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সতীদের প্রতি নির্য্যাতনের অবস্থা তিনি অভিযোগ করিলেন, ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিসের রিপোর্ট সাক্ষ্য দিলেন; এবং এই কুপ্রথা যে শাস্ত্র সঙ্গত নহে তাহারও প্রমাণ দিলেন। ইহাতে গভর্ণমেণ্টের ভ্রম দূর হইল। তখন মহামতি বেণ্টিক ১৮২৯ খ্রীঃ ৪ঠা ডিসেম্বর আইন দ্বারা এই নৃশংস সতীদাহ প্রথা চিরদিনের মত উঠাইয়া দিলেন। রামমোহনের ভাগীরথী তীরের বাল্য প্রতিজ্ঞা আজ পূর্ণ হইল। তাঁহার বহু দিনের আকাঙ্খা আজ সফল হইল। তাঁহার হৃদয় আনন্দতরঙ্গে উদ্বেলিত হইতে লাগিল। যতদিন হিন্দু সমাজ থাকিবে ততদিন তাঁহার এই অক্ষয় কীর্ত্তি চিরদিন সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

সতীদাহ নিবারিত হওয়াতে ধর্ম্মসভা ক্রোধে, ক্ষোভে ও বিদ্বেষে ক্ষিপ্ত প্রায় হইল। চতুর্দ্দিকে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। রামমোহনকে বধ করিবার জন্য গুণ্ডা নিযুক্ত হইল। তিনি সমাজ ও আত্মীয়চ্যুত হইলেন। তাঁহার নামে কত রকমের বিদ্রূপাত্মক গান ও কবিতা রচিত হইল। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নির্ভীক চিত্তে একাকী রাজপথে ভ্রমণ করিতেন এবং সাবধানতার সহিত একখানি কিরিচ পোষাকের ভিতর রক্ষা করিতেন।

রামমোহন রায় কৃতজ্ঞ হৃদয়ে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে টাউনহলে প্রকাশ্য সভায় ১৮৩০ খ্রীঃ ১৬ই জুলাই তারিখে সতীদাহ নিবারণের জন্য

এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। ইহাতে দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি তিনশত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক স্বাক্ষর করেন। বড়লাট বাহাদুর ইহার একটী সুন্দর উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। অপর পক্ষে ধর্ম্মসভা এদেশে অকৃত-কার্য্য হইয়া এই আইন রহিত করিবার জন্য বিলাতে আপীল করিলেন। রামমোহন যখন বিলাতে ছিলেন তখন এই আপীলের শুনানী হয়। বিচারে প্রতিবাদ পত্র অগ্রাহ্য হইল। না জানি রাজার সেই সময়ে কিরূপ আনন্দ হইয়াছিল।

পূর্ব্বে এদেশে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। বহুবিবাহ স্ত্রীলোক দিগের যন্ত্রণার প্রধান কারণ। এই কদর্য্য প্রথার বিরুদ্ধে তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণাদির সহিত লেখনী চালনা করিতে লাগিলেন। বহুবিবাহ নিবারণের জন্য তিনি গবর্ণমেণ্টকে এরূপ ব্যবস্থা করিতে বলেন যে,— কোন ব্যক্তি এক স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রমাণ করিতে হইবে যে, শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট কোন দোষ আছে। নচেৎ তিনি পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইবেন না। স্ত্রীলোকের দায়াধিকার সম্বন্ধে তিনি শাস্ত্রীয় প্রমান ও বিশুদ্ধ যুক্তি অবলম্বনে প্রতিপন্ন করেন যে ইহা নিতান্ত অন্যায় ও নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক। স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রীলোকগণ স্বামীর সম্পত্তি হইতে কেন বঞ্চিত হইবে। দুটী অন্নের জন্য কুক্কুরের ন্যায় কেন সংসারের একপ্রান্তে কায়ক্লেশে জীবনাতিপাত করিবে। এই আন্দোলনের ফলে রামমোহনের দ্বারা ভারতীয় দায়াধিকার আইনের সূত্রপাত হয়। কন্যাপণ রহিতের জন্যও তিনি বহুচেষ্টা করিয়াছিলেন।

আমাদের দেশের শিক্ষা বিস্তারের প্রধান উদ্যোগী মহাত্মা ডেভিড-হেয়ার সাহেবের সহিত রামমোহনের বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। সাহেব রাম-মোহনের প্রায় সকল কার্য্যে সাহায্য করিতেন। তিনি রামমোহনকে পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং বলিতেন যে, আমি এদেশে একজন

স্নেহশীল বন্ধু ও আত্মীয় লাভ করিয়াছি। রামমোহনের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নানা বিষয়ে প্রকাশ পাইত। তিনি রাজার সর্ব্ববিধ সৎকার্য্যের পরম সহায় ছিলেন। যখন এদেশে হিন্দুকলেজ সংস্থাপনকারীরা রামমোহনের সঙ্গে কোন সংশ্রব রাখিতে অনিচ্ছুক হইয়া ছিলেন, সেই সময় তিনি গভর্ণমেণ্ট বা অপরের মুখাপেক্ষী না হইয়া ডেভিড হেয়ারের সাহায্যে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের জন্য এক বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষককে ১৫০৲ টাকা ও অন্যান্য শিক্ষকগণকে ৭০।৮০৲ টাকা হিসাবে বেতন দেওয়া হইত। রামমোহনের অন্যতম বন্ধু আড্যাম সাহেব বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতেন। ডাঃ ডফ্ সাহেব যখন এদেশে একটী ইংরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতে মনঃস্থ করেন, তখন রামমোহন রায় তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজ গৃহে প্রথমে স্থান দান করিয়া তাঁহাকে সে কার্য্যে সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি বেদ বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া ছিলেন। এইস্থানে তিনি বেদান্ত ও দর্শনশাস্ত্রের সারতত্ত্ব শিক্ষা দিতেন। এইরূপে তিনি সকল প্রকার শিক্ষা বিস্তারের পথ উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন।

বিলাত যাত্রা।

স্বদেশের মঙ্গলের জন্য রামমোহনের বিলাতগমনের ইচ্ছা, তাঁহার হৃদয়ে প্রধুমিত হইতেছিল। বিশেষ তত্রত্য আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম ও রাজনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভ করিবার জন্য তাঁহার বলবতী ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু সময়, সুবিধা ও অর্থাভাব প্রযুক্ত তাঁহার সে ইচ্ছা এতদিন পূর্ণ হয় নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর সম্রাটকে কয়েকটী বিষয়ে অধিকার চ্যুত করাতে, সম্রাট পার্লিয়ামেণ্টে তাঁহার পক্ষ সমর্থনের জন্য একজন উপযুক্ত লোক অনুসন্ধান করিতেছিলেন। রাম মোহনের বিলাত গমনের ইচ্ছা পূর্ব্ব হইতেই প্রচারিত হইয়াছিল, সুতরাং

দিল্লীর সম্রাট তাঁহাকেই উপযুক্ত পাত্র স্থির করিয়া ১৮২৯ খৃঃ অব্দে 'রাজা' উপাধি প্রদান করিয়া ও উপযুক্ত ক্ষমতা প্রদান পূর্ব্বক ইংলণ্ডে প্রেরণ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে কোন হিন্দু সন্তান অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া বিলাত যাত্রা করেন নাই। সুতরাং ইহাতেও দেশের মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। তিনি ঘৃণা, বিদ্বেষ ও অবজ্ঞাকে পদদলিত করিয়া, সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নিজ অভীষ্ট পথে গমন করিলেন। ১৮৩০ খৃঃ অব্দে ১৫ই নভেম্বর সোমবার তিনি পালিত পুত্র রাজা রাম, রামহরি ও রামরতন মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া "আলবিয়ান" নামক জাহাজে আরোহণ করিয়া বিলাত যাত্রা করিলেন। জাহাজের একটী স্বতন্ত্র গৃহে তাঁহাদের জন্য দেশীয় প্রথানুসারে রন্ধন হইত। তিনি দুইটী দুগ্ধবতী গাভী সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। বিলাত গমনের দিন তাঁহাকে দেখিবার জন্য বহু জনতা হইয়াছিল।

রামমোহনের বিলাত গমনের পূর্ব্বেই তাঁহার যশঃ সৌরভ তথায় বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহার প্রণীত খৃষ্টধর্ম্ম মূলক ইংরাজী গ্রন্থগুলি লণ্ডন নগরে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তাঁহার বিলাতে আগমন বার্ত্তা ব্যাপটিষ্ট মিসন সোসাইটী বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া ঘোষণা করেন যে "রামমোহন রায় একজন কলিকাতার ধনবান রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। ইনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। পারস্য ভাষায় ইহার এত জ্ঞান যে লোকে ইহাঁকে মৌলবী রামমোহন রায় বলিয়া থাকে। ইনি বিশুদ্ধ ইংরাজী লিখিয়া থাকেন এবং তিনি মনোবিজ্ঞান ও গণিত শাস্ত্রের পুস্তক সকল পাঠ করিয়া থাকেন। তিনি অতি সচ্চরিত্র লোক" ইত্যাদি।

তিনি ১৮১১ খৃঃঅব্দের ৮ই এপ্রেল ৪ মাস ২৩ দিনে তাঁহার প্রথম গম্যস্থান লিভারপুলে উপস্থিত হইলেন। জনৈক ভদ্র ইংরাজ তাঁহার ভবনে থাকিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি স্বাধীন ভাবে অবস্থিতি করা শ্রেয়স্কর মনে করিয়া "ব্র্যাডলিস" নামক প্রসিদ্ধ

হোটেলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই স্থানে বহু সংখ্যক ভদ্রলোক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। সুপ্রসিদ্ধ উইলিয়ম রস্কোর সহিত রাজার এই স্থানে আলাপ হয়। লিভার পুলের অধিবাসিগণ তাঁহাকে একজন মহাপুরুষ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তাঁহার মুখশ্রী ও সুন্দর ব্যবহারে সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তথায় ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিচার উপস্থিত হইলে খৃষ্টীয় শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহাদের অপেক্ষা রামমোহনের অধিকতর পাণ্ডিত্য দর্শন করিয়া তাঁহারা আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। এই সময়ে "রিফরম বিল" লইয়া মহা সভায় বাদানুবাদ হইতেছিল তজ্জন্য তিনি ত্বরায় লণ্ডনে গমন করিলেন। পথিমধ্যে কল কারখানা দেখিবার জন্য তিনি ম্যানচেষ্টারে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন।

তিনি লণ্ডনে গমন করিয়া "আডেলফি (Adelphi নামক হোটেলে গিয়া উঠিলেন। সেই দিন বেলা ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তথায় আগমন করিয়া তাঁহার সহিত পরিচিত হইতে লাগিলেন। যিনিই আলাপ করেন তিনিই রাজার মধুর চরিত্রে ও ভদ্র ব্যবহারে মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। তাঁহারা ভারতের বিবিধ বিষয়িনী প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তিনি সকলকার সকল প্রশ্নের অতি সদুত্তর প্রদান করিয়া প্রীতি উৎপাদন করিতে লাগিলেন। সমাগত ব্যক্তিগণ সকলেই রাজার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ক্রমে অগ্নিশিখার ন্যায় তাঁহার প্রতিভা লণ্ডন নগরে বিকীর্ণ হইতে লাগিল। এই স্থানে সুপ্রসিদ্ধ বেন্থাম সাহেবের সহিত তাঁহার আলাপ ও বন্ধুত্ব হয়। ইংলণ্ডেশ্বরের সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিয়া রাজসম্মান লাভ করেন, এবং তাঁহার অভিষেক স্থলে রামমোহনের বসিবার আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। একটী প্রকাশ্য ভোজে ইংলণ্ডেশ্বর রাজাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি হব হাউস সাহেব ৬ই জুলাই তাঁহাকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নামে একটী প্রকাশ্য সভায় মহাসম্মানের সহিত

ভোজ দিয়াছিলেন। বিলাতের একেশ্বরবাদিগণ রাজার সম্মানার্থ একটি বৃহৎ সভা আহ্বান করেন। এই সভায় অনেকে রাজার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। বিলাতের ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায় কর্ত্তৃক তিনি বিশেষভাবে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন, এবং তথাকার খ্যাত-নামা পণ্ডিতগণের সহিত তিনি যে বিচার ও ধর্ম্মালোচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ও অতুলনীয় বিচার শক্তি দেখিয়া বিলাতের পণ্ডিতগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন। পার্লিয়ামেণ্টে মহাসভায় রাজা ভারতবর্ষের অবস্থা ও শাসন সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন। রাজা বিলাতের সুন্দর হর্ম্ম্যরাজি, পুষ্পোদ্যান শোভিত কুটীররাজি, টেমস নদীর সুড়ঙ্গ, চতুর্দ্দিকের রেলরোড, কৃত্রিম নদী ও প্রস্রবণ, মনোহর সেতু প্রভৃতি সুন্দর দৃশ্যাবলীতে মুগ্ধ হইতে লাগিলেন।

রাজার পরম বন্ধু ডেভিড হেয়ার সাহেবের ভ্রাতারা বিলাতের বেডফোর্ড স্কোয়ার নামক স্থানে বাস করিতেন। রামমোহন বিলাতে উপনীত হইলে হেয়ার সাহেবের ভ্রাতাগণ তাঁহাদের বাটীতে থাকিবার জন্য তাঁহাকে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতাপ্রিয় রামমোহন আত্মনির্ভরতা ভালবাসিতেন, তজ্জন্য তিনি হোটেলে বাস করিতে লাগিলেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা ফ্রান্সে গমন করেন। হেয়ার সাহেবের এক ভ্রাতা তাঁহার সহিত তথায় গিয়াছিলেন। ইংলণ্ড বাসিগণের ন্যায় ফরাসিগণ রাজাকে অত্যধিক সমাদর করিয়াছিলেন। সম্রাট লুইস ফিলিপ্ তাঁহাকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করেন, এবং নিজ প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার সহিত একত্র ভোজন করেন। তত্রত্য কোন বিখ্যাত সভায় তিনি মাননীয় সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন। প্যারিস নগরের কোন হোটেলে কবি টমাস মুরের সহিত তাঁহার আলাপ হয় এবং উভয়ে একত্রে আহারাদি করেন। ফরাসীদেশে তিনি প্রায় এক বৎসরকাল বাস করেন, এবং সেই অল্পকালের

মধ্যে তিনি ফরাসীভাষা আয়ত্ত করিয়া লন। ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে রাজা ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, এবং হেয়ার সাহেবের ভ্রাতাদিগের গৃহে অবস্থিতি করেন।

রাজার নির্ম্মল চরিত্র ও হৃদয়ের ভালবাসা বিলাতের অনেককে আকৃষ্ট করিল। তিনি তথায় অনেক দেশ হিতকর কার্য্যে যোগদান করিতে লাগিলেন। তিনি স্বদেশের কল্যাণের জন্য ইংলণ্ডে রাজনীতি ও ধর্ম্মসম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি পার্লিয়া-মেণ্টের কমিটির সমক্ষে বিচার বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ, ভারতের লোকের সাধারণ অবস্থা বিষয়ে যে সাক্ষ্য প্রদান করেন, তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ইহাতে বিলাতের লোক সকল তাঁহার প্রতি এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে রেভারেণ্ড ডেভিডসন এম, এ, তাঁহার এক পুত্রের নাম "রামমোহন" রাখিয়াছিলেন। কুমারী কার্পেণ্টারের পিতা প্রসিদ্ধ ডাক্তার কার্পেণ্টার রামমোহনের সঙ্গে বৃষ্টলের কুমারী ক্যাসল ও কুমারী ফিডলের সহিত পরিচয় করিয়া দেন। ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে রাজা বৃষ্টল নগরের ষ্টেপলটোন গ্রোভ নামক মনোহর উদ্যান বাটীকায় উপনীত হইলেন। লণ্ডনের জন কোলাহলপূর্ণ বাটী পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়া যেন তিনি কিছু শান্তি লাভ করিলেন। এখানে তিনি কুমারী ফিডেল ও কুমারী ক্যাসেলের বাটীতে অতিথিরূপে বাস করিতে লাগিলেন। হেয়ার সাহেবের ভগ্নী রাজার সহিত বৃষ্টলে আসিয়াছিলেন। ডাঃ কার্পেণ্টারের সহিত তাঁহার নানাবিষয়ের আলোচনা হইত। সুবিখ্যাত প্রবন্ধলেখক জন ফষ্টার রাজার সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি ও জীবনের মধুরতার সর্ব্বদা প্রশংসা করিতেন। এখানে দেশহিতৈষিণী কুমারী কার্পেণ্টারের সহিত রাজার আলাপ হয়। রাজাই তাঁহার মনে ভারতের হিতসাধনেচ্ছা উদ্দীপ্ত করিয়া দেন।

স্বর্গারোহণ।

১১ই সেপ্টেম্বর ষ্টেপলটোন ভবনে একটী প্রকাশ্য সভা আহুত হয়। এই সভায় অনেক ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল। তাঁহার সহিত কথোপকথনের জন্য বহু সংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তিও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সভাস্থ পণ্ডিতগণ রাজাকে ভারতের ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি এবং দার্শনিকদিগের মতামত সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করেন। তিনি তিনঘণ্টা কাল ক্রমাগত দণ্ডায়মান থাকিয়া অতি সুন্দররূপে বিচক্ষণতার সহিত সকলকার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অদ্ভুত তর্ক-শক্তি ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া প্রশ্ন কর্ত্তারা স্তব্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু হায়! এই সভাই তাঁহার জীবন নাটকের শেষ অভিনয়।

এই অতিরিক্ত পরিশ্রমে তিনি শ্রান্ত ও ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। শেষে ১৯শে সেপ্টেম্বর জ্বরাক্রান্ত হইলেন। এই জ্বর ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বিকারে পরিণত হইল। প্রধান প্রধান চিকিৎসকগণ অত্যন্ত যত্ন সহকারে তাঁহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কুমারী কার্পেণ্টার, কুমারী ক্যাসেল, কুমারী ফিডেল ও ডেভিড হেয়ারের ভগ্নী তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। ডাঃ কার্পেণ্টার সর্ব্বদা রাজার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেন; কিন্তু হায়! কিছুতেই কিছু হইল না। ২৩ শে ডাঃ ক্যারিক পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে রাজার মস্তিষ্ক বিকল হইয়াছে। মস্তকে জোঁক বসান হইল। ২৪ শে তাঁহার বেশ সুনিদ্রা হইল; কিন্তু ২৬ শে ধনুষ্টঙ্কার রোগে পরিণত হইয়া তাঁহার মুখ বাঁকিয়া গেল। তাঁহার কেশ-দাম কর্ত্তন করিয়া শীতল জল মস্তকে দেওয়া হইল। অবিশ্রান্ত সেবা ও চিকিৎসাতেও কোন ফলোদয় হইল না। তাঁহার হস্তপদ ক্রমশঃ শিথিল হইতে লাগিল। প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার অবস্থা অতি শোচনীয় হইতে লাগিল। রাত্রি ২ টা ২৫ মিনিটের সময় যখন চন্দ্রালোকে চতুর্দ্দিক

উদ্ভাসিত, জগৎ নিস্তব্ধ, তখন তাঁহার পবিত্র আত্মা নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া দিব্যধামে প্রস্থান করিল। সেই চির প্রফুল্ল মুখ মণ্ডলে এক অপূর্ব্ব শান্তি ও গাম্ভীর্য্য বিরাজ করিতে লাগিল। তাঁহার প্রদীপ্ত জীবন-প্রদীপ চিরদিনের মত নির্ব্বাপিত হইল। ভারতের প্রভাত তারা কোন্ অলক্ষ্য স্বর্গরাজ্যে উদয় হইয়া আলোকিত করিল। তাই ধর্ম্মাত্মার আগমনে চাঁদ হাঁসিতেছিল। তাই জ্যোৎস্নাস্নাত গভীর নিশীথ সুধাধবলিত হইল। কিন্তু হায়! ইংলণ্ড কাঁদিল, ভারত কাঁদিল, পৃথিবী প্রাণের সন্তান হারাইয়া শোকে অধীরা হইলেন। যেন ভারত রবি রামমোহন পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়া পশ্চিমাকাশে অস্তমিত হইলেন। সকলকার হৃদয় শোকান্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। ১৮৩৩ খৃঃ অব্দের ২৭ শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার তাঁহার জীবনের মহাব্রত উদ্যাপন করিয়া তিনি অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন।

সমাধি।

রামমোহনের পুত্রগণ পাছে বিষয়াধিকারে বঞ্চিত হন, তজ্জন্য তিনি পূর্ব্ব হইতে বলিয়াছিলেন, যেন তাঁহার দেহ খৃষ্টানদিগের সমাধি স্থানে সমাহিত করা না হয়। তাঁহার মৃত শরীরেও যজ্ঞোপবিত দৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার এই অনুজ্ঞানুসারে ষ্টেপল টোন গ্রোভের নিকটবর্ত্তী এক নির্জ্জন বৃক্ষ বাটিকাতে ১৮ই অক্টোবর শুক্রবার তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করা হইল। রাজারাম, রামহরি ও রামরতন কাঁদিতে লাগিলেন। কুমারী হেয়ার, কিডেল, ক্যাসেল, কার্পেণ্টার প্রভৃতি কাঁদিতে লাগিলেন। রাজার বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন বিলাত গমন করেন, তখন তিনি উক্ত স্থান হইতে রাজার শবদেহ উত্তোলন করিয়া আরনোস ভেল (Arnos Vale) নামক স্থানে আনয়ন করিয়া তদুপরি একটী সুন্দর সমাধি-মন্দির নির্ম্মান করিয়া দেন। উহা অদ্যাবধি অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

শেষ কথা।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় পুরুষকারের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মনুষ্যত্ব লাভ করিবার আদর্শ-চরিত্র তিনি আমাদের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন। ভারতের শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ের উন্নতির মূলে সেই মহাপুরুষকেই সর্ব্বাগ্রে দেখিতে পাই। ভাষাশিক্ষার মূলে তিনিই জল সিঞ্চন করিয়া যান। সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে তিনি কি সংগ্রামই না করিয়াছেন? ধর্ম্মবিষয়ে তিনি একপ্রকার যুগান্তর করিয়া গিয়াছেন; এবং সকল শাস্ত্রের শেষ মীমাংসা যে একেশ্বরবাদ, তিনিই তাহা সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া যান। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ প্রতিভা দেখিয়া ইংলণ্ডবাসী পর্য্যন্ত বিস্মিত, স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার শরীর, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্মভাব ও মানসিক তেজ সকলই অসাধারণ ছিল। তাঁহার দেহ উচ্চে চারি হস্ত ছিল; এবং দেখিতে অতি সুশ্রী ও সুগঠিত ছিল। তাঁহার আজানুলম্বিত বাহু, বীরবপু, সুবৃহৎ মস্তক, উজ্জ্বল চক্ষু, প্রশান্ত বদন, উদার প্রকৃতি প্রভৃতি সকল লক্ষণই যেন তাঁহার মহাপুরুষত্ব ঘোষণা করিয়াছিল। তাঁহার হৃদয়ে এমন এক মহীয়সী শক্তি ছিল, যদ্দ্বারা তিনি সকল প্রকার লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেন। তাঁহার এমন সুন্দর মুখাকৃতি ছিল যে, সকলে নির্ণিমেষ লোচনে তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিতেন যে বাল্যকালে রাজার সহিত গাড়ীতে বেড়াইবার সময়ে আমি কেবলই রাজার সুন্দর মুখ খানি দেখিতাম।

তাঁহার দেহের প্রতি বিশেষ যত্ন ছিল, এবং শরীর রক্ষার জন্য প্রত্যহ নিয়মিত আহারাদি করিতেন। তিনি বলিতেন যে শরীর পরমেশ্বরের মূল্যবান্ দান। বৃক্ষমূলে যেমন জল সেচন আবশ্যক,

তেমনি বাল্যকাল হইতে দেহকে উপযুক্ত আহার দেওয়া প্রয়োজন। তাঁহার শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল এত অধিক ছিল যে, তিনি সমগ্র একটী ছাগমাংস একাকী ভোজন করিতে পারিতেন। প্রত্যহ ১২ সের দুগ্ধ পান করিতেন। আম্রের সময় তিনি ৫০টা আম্র জলযোগ করিতেন। কাঁদিশুদ্ধ ডাব খাইতেন। এইরূপ তাঁহার ভোজনের ক্ষমতা ছিল এবং তদ্রূপ শরীরে অসাধারণ বলও ছিল। বিলাতের হৃত্তত্ব পণ্ডিত (ফ্রনলজিষ্ট) স্পারজিন সাহেব তাঁহার বৃহৎ মস্তক দেখিয়া তাঁহাকে একজন অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া স্থির করেন। তাঁহার মস্তকের পাগড়ী পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বিলাত হইতে এদেশে আনয়ন করেন। উহা এত বড় যে আজকাল যাঁহাদের মস্তক খুব বড় তাঁহাদের মস্তকেও উহা বড় হয়।

তিনি প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে প্রায় ৪টার সময় শয্যাত্যাগ করিয়া কাফি পান করিতেন। তৎপরে কয়েকজন বন্ধু সমভিব্যাহারে প্রাতঃ ভ্রমণে বাহির হইতেন। প্রায় দুই ক্রোশ ভ্রমণ করিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই তিনি গৃহে প্রত্যাগত হইতেন। ১০টার সময় তিনি স্নান করিতেন। স্নানের পূর্ব্বে তিনি সমস্ত শরীরে অধিক পরিমাণে সর্ষপ তৈল মর্দ্দন করিতেন। তৎপরে সংস্কৃত, পার্শী ও আরবী ভাষায় কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে এক প্রকাণ্ড জলপূর্ণ টবে ঝম্পপ্রদান করিতেন। প্রায় ১ঘণ্টা ধরিয়া স্নান করিতেন। তিনি দিবাভাগে নানাবিধ ব্যঞ্জনাদিসহ অন্ন আহার করিতেন এবং রাত্রে মধু ও মাংসসহ রুটী খাইতেন। শারীরিক বল ও স্বাস্থ্য থাকাতে তিনি প্রবল পরাক্রমে আপনার সুমহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! বঙ্গের এমনি দুর্ভাগ্য যে এমন মহাপুরুষকে চিনিতে পারিল না। যাহাদের জন্য তিনি দেহ, মন, অর্থ, অশ্রু ও জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিলেন, তাহার ফল এ

হতভাগ্য বঙ্গদেশে ফলিল না। অনেকের মতে তিনি দেবদ্বেষী সমাজ-বিপ্লবেচ্ছু যথেচ্ছাচারী ; কিন্তু পক্ষপাত শূন্য হইয়া দেখিলে তাঁহাকে দেবতা ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। তিনি ষোড়শবর্ষ হইতে ঊনষষ্ঠী বৎসর পর্য্যন্ত কত কষ্ট কত যন্ত্রণা ভোগ করিলেন, কিন্তু তিনি কখনও সত্যের পথ হইতে স্খলিত হন নাই। তাঁহার পদভরে বঙ্গসমাজ কাঁপিয়া গিয়াছিল। তিনি সত্যের অটল ভূমিতে দণ্ডায়মান থাকিয়া অবিচলিত চিত্তে সকল অত্যাচার সহ্য করিয়া হৃদয়ের তেজ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনের প্রধান তেজ "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।" সেই মন্ত্রের প্রভাবেই বঙ্গ সমাজের সর্ব্ববিধ উন্নতি ঘটিয়াছে এবং সেই শক্তির প্রভাব আজ পর্য্যন্ত পরিলক্ষিত হইতেছে। বিধাতা যেন তাঁহাকে সর্ব্ববিষয়ে পূর্ণ শক্তি প্রদান করিয়া ইহ জগতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বঙ্গবাসী তাঁহার আদর না করুক, কিন্তু চিরদিন তাঁহার নাম হিরণ্ময় অক্ষরে জগতে জাজ্জ্বল্যমান থাকিবে।





লালাবাবু।

সংসারাসক্ত মানব শোক দুঃখের তরঙ্গে আবর্ত্তিত হইয়াও সংসারের মায়া ত্যাগ করিতে পারেন না। কিন্তু যে সকল ভাগ্যবান্ কোনরূপ শোকতাপ পান নাই, অতুল সম্পদের অধিকারী হইয়া সর্ব্বদা সংসারের সুখ সমীরণ উপভোগ করেন, তাঁহারা যদি পুত্র কলত্রাদির মায়া পাশ ছিন্ন করিয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন, তাঁহারা যথার্থই মহাপুরুষ ও মর্ত্ত্যের দেবতা। দুঃখ দারিদ্র্যপূর্ণ জ্বালাময় সংসারের ভীষণ তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া কেহ কেহ সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু ধনীর সন্তান হইয়া, বিপুল বিভবের অধিপতি হইয়া, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে কয় জনকে দেখা যায়? রাজার সন্তান, অসাধারণ ত্যাগী, বৈরাগ্যের-অবতার বুদ্ধদেবের মত, একজন প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ জন্মিয়াছিলেন; তাঁহার নাম লালাবাবু। ইনি ইতিহাস প্রসিদ্ধ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র এবং ধনপতি প্রাণকৃষ্ণের পুত্র। ইঁহার আশ্চর্য্য বৈরাগ্য, অসাধারণ বিনয় ও দৈন্য এবং অসীম দানশীলতা প্রভৃতি গুণ গ্রাম শ্রবণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি ধনবানের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া সুখ সম্পদে বর্দ্ধিত হইয়াও পাপ পঙ্কিল পৃথিবীর শত প্রলোভন তুচ্ছ করতঃ যুবাবস্থাতেই সংসারের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ ব্যক্তি লোক নিন্দা, লজ্জা, বিদ্রূপ, বাধা বিঘ্নাদি সমস্ত উপেক্ষা

করিয়া মনের তেজে কর্ত্তব্যপথে গমন করিয়া থাকেন। লালাবাবুও তদ্রূপ তাঁহাদের মধ্যে একজন তেজস্বী মহাপুরুষ ছিলেন। এই সকল নিবৃত্তি পরায়ণ নরদেবতার হৃদয়ে সৎসাহস ও বৈরাগ্যধর্ম্ম স্বভাবতই সমুদ্ভূত হইয়া থাকে।

বংশবৃত্তান্ত।

পরম বৈষ্ণব লালাবাবু ১১৮২ সালে (১৭৭৫ খৃঃ) মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বিখ্যাত কান্দীর রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার প্রকৃত নাম দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ। ইনি উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ ব্যাস সিংহ বঙ্গের বিখ্যাত রাজা বল্লাল সেনের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। বল্লাল সেন কোন নীচ কুলোদ্ভবা রমণীর পাণি গ্রহণ করাতে তেজস্বী ব্যাস সিংহ তাঁহার বাটীতে আহারাদি করিতে অস্বীকৃত হন। তজ্জন্য বল্লাল সেনের আদেশে ব্যাসের দেহ করাত দ্বারা কর্ত্তিত হয়। তদবধি তিনি "করাতিয়া ব্যাস" নামে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার পুত্র বলবান সিংহ সর্ব্ব প্রথমে কান্দীতে আসিয়া বাস করেন। ইঁহার অধস্তন একাদশ পুরুষ পরে (১৬৫০ খৃঃ) হরেকৃষ্ণ সিংহ নামক একজন বংশধর ছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদের রেশমের কারবারে ও উত্তমর্ণের ব্যবসার দ্বারা বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদ কুলিখাঁকে তিনি নজরানা স্বরূপ প্রভূত অর্থ প্রদান করিয়া বোয়ালিয়া ও অন্যান্য বিস্তর সম্পত্তি এবং রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন।

হরেকৃষ্ণের তিন পুত্র—নারায়ণ, গৌরাঙ্গ ও বিহারী। মধ্যম পুত্র গৌরাঙ্গ দ্বারাই কান্দী রাজবংশের নাম বিখ্যাত হয়। তিনি ৺রাধাবল্লভ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। গৌরাঙ্গ অপুত্রক হওয়ায় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিহারীর পুত্র রাধাকান্তকে দত্তক পুত্র রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিহারীর চারি পুত্র—দীন দয়াল, রাধাকান্ত, রাধাচরণ ও গঙ্গাগোবিন্দ।

ইহাঁদের মধ্যে রাধাকান্ত ও গঙ্গাগোবিন্দের নামই বিখ্যাত। ১৭২৮ খৃঃ অব্দে রাধাকান্ত জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি নবাব আলীবর্দ্দি খাঁ ও সিরাজের সময়ে রাজস্ব বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন। তৎপরে কোম্পানি বাহাদুর (১৭৬৫ খৃঃ) বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি ভার প্রাপ্ত হইলে, রাধাকান্ত কোম্পানির রাজস্ব আদায়ের অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। ইহাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রাধাকান্তকে একখানি সায়ার মহল ও হুগলীতে চুঙ্গী নামক এক প্রকার রাজস্ব আদায়ের স্বত্ব পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করেন। রাধাকান্তও অপুত্রক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গাগোবিন্দের পুত্র প্রাণকৃষ্ণকে দিয়া যান। তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া উক্তপদে গঙ্গাগোবিন্দকে নিযুক্ত করিয়া যান। ১৭৭২ খৃঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ।

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ লালাবাবুর পিতামহ ছিলেন। তিনি ১৭৩৯ খৃঃ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি দূরদর্শী এবং ফরাসী ভাষায় বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি মহম্মদ রেজাখাঁর অধীনে কানুনগোর কর্ম্ম করিতেন। মহম্মদ রেজা খাঁ পদচ্যুত হইলে সেই সঙ্গে গঙ্গাগোবিন্দেরও কর্ম্ম যায়। তৎপরে তিনি কর্ম্মের চেষ্টায় কলিকাতায় আগমন করেন। সৌভাগ্য বলে তিনি ওয়ারেন হেষ্টিংসের কৃপাদৃষ্টিতে পতিত হইয়া, তাঁহার সকল কার্য্যের দেওয়ানরূপে নিযুক্ত হন। রাজস্ব বিভাগের সমুদয় কার্য্যের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হওয়ায় তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অর্থ পিপাসা এত প্রবল হইয়াছিল যে, তিনি সামান্য কারণেই উৎকোচ গ্রহণ করিতেন। ১৭৭৫ খৃঃ উৎকোচ গ্রহণাপরাধে তিনি পদচ্যুত হন। কিন্তু হেষ্টিংসের বিরোধী সদস্য মনসন

সাহেবের মৃত্যু হইলে, হেষ্টিংস যখন সর্ব্বেসর্ব্বা হন, তখন তিনি গঙ্গাগোবিন্দকে ডাকাইয়া ১৭৭৬ খৃঃ ৮ই নভেম্বর দেওয়ানি কার্য্যে পুনরায় নিযুক্ত করিলেন। এইবার তিনি রাজস্ব বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন। তখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল না। পাঁচ বৎসর অন্তর মেয়াদি উত্তীর্ণ হইলে যাঁহার নিকট অধিক অর্থ পাইতেন, তাঁহাকেই জমিদারী প্রদান করিতেন। তাঁহারই হস্তে জমীদারগণের সত্ব স্বামিত্ব নির্ভর করিত। অল্পদিনের মধ্যেই গঙ্গাগোবিন্দ দেশের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। তৎকালে জমীদারগণের তিনিই দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন। লোকে হেষ্টিংস অপেক্ষা গঙ্গাগোবিন্দকে বেশী ভয় করিত। এমন কি নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র পর্য্যন্ত তাঁহাকে ভয় করিতেন। একদা কৃষ্ণচন্দ্র, নিজ পুত্র শম্ভুচন্দ্রের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে, গঙ্গাগোবিন্দকে পত্র লিখিয়া ছিলেন—"দরবার অসাধ্য, পুত্র অবাধ্য, কেবল ভরসা গঙ্গাগোবিন্দ।" তিনি মাতৃ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২০ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। এরূপ শ্রাদ্ধ কেহ কখনও দেখেন নাই। শ্রাদ্ধ সভার সমারোহ ব্যাপার দেখিয়া মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্রের পুত্র শিবচন্দ্র সবিস্ময়ে বলিয়াছিলেন—"মহাশয়, এযে দক্ষ যজ্ঞের ব্যাপার দেখিতেছি।" গঙ্গাগোবিন্দ তদুত্তরে বলিয়াছিলেন—"আজ্ঞে ততোঽধিক, কারণ সে যজ্ঞে শিব উপস্থিত হন নাই, এ যজ্ঞে স্বয়ং শিবের আগমন হইয়াছে।" হেষ্টিংস কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বিলাত যাত্রা করিলে, ১৭৮৫ খৃঃ গঙ্গাগোবিন্দেরও কর্ম্ম যায়। তিনি পদচ্যুত হইয়া ১৪ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। তিনি অসদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিলেও ৯০ লক্ষ টাকা নানাবিধ সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়া তাঁহার পাপ কলঙ্কিত জীবনে কিঞ্চিৎ পুণ্য অর্জ্জন করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি একমাত্র পুত্র প্রাণকৃষ্ণ ও পৌত্র লালাবাবুকে রাখিয়া ১৭৯৯ খৃঃ ৬০ বৎসর বয়সে পরলোক প্রস্থান করেন।

লালাবাবুর পিতা

প্রাণকৃষ্ণ সিংহ, গঙ্গাগোবিন্দের একমাত্র পুত্র ছিলেন। তিনি ১৭৫৫ খৃঃ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ তাত রাধাকান্ত এবং পিতার অতুল সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া বহু অর্থের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তিনিও পিতার সহিত রাজস্ব বিভাগের উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮০১ খৃঃ তিনি স্বোপার্জ্জিত অর্থে কয়েকটী সম্পত্তি ক্রয় করেন। তিনি বড় নিষ্ঠাবান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। কান্দীতে দেব বিগ্রহ এবং ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও অতিথি সেবার বন্দোবস্ত করেন। তাঁহারই পুণ্য প্রভাবে ধার্ম্মিক চূড়ামণি মহানুভব লালাবাবু জন্ম গ্রহণ করিয়া কলঙ্কিত গঙ্গা-গোবিন্দের বংশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। প্রাণকৃষ্ণ সিংহ ১৭৯২ খ্রীঃ অব্দে ৫৩ বৎসর বয়সে একমাত্র পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ বা লালাবাবুকে রাখিয়া দিব্যধামে গমন করেন।

লালাবাবু।

উত্তর পশ্চিমে কায়স্থগণ "লালা" নামে বিখ্যাত। তজ্জন্য কৃষ্ণচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিলে, পিতামহ গঙ্গাগোবিন্দ আহ্লাদ করিয়া পৌত্রের নাম "লালাবাবু" রাখিয়াছিলেন; এবং দীন দুঃখীগণকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া বদান্যতার পরিচয় প্রদান করেন। লালাবাবুর অন্নপ্রাশনের সময় গঙ্গাগোবিন্দ স্বর্ণপত্র খোদাই করিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ-পত্র প্রদান করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি প্রচুর দান করিয়া সকলকার আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছিলেন। লালাবাবু বাল্যকালে বাঙ্গালা, আরবী, পারসী ও সংস্কৃত ভাষা উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রন্থের শ্লোক সকল তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল এবং তিনি অনায়াসে সেই সকল শ্লোকের অন্বয় ও ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন। তাঁহার

হস্তাক্ষরও সুন্দর ছিল। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ধর্ম্মে মতি ছিল। বিশেষ ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁহার অসাধারণ ভক্তি ছিল। কিন্তু তিনি বড় স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন। বাটীর পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীদিগকে মধ্যে মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া, তাহাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতেন। পিতা ও পিতামহের সহিত তাঁহার প্রায়ই মতের অনৈক্য হইত। ইহার প্রধান কারণ, তাঁহাদের ধন পিপাসা অত্যধিক এবং তাঁহার চিত্ত দয়া মায়া ও সাধু প্রকৃতিতে গঠিত। তাঁহার দয়ার্দ্র হৃদয়ের শক্তি পিতা বা পিতামহের ব্যয়কুণ্ঠতায় সময়ে সময়ে বাধা প্রদান করিত। ইহা লইয়া পিতার সহিত প্রায়ই মনোমালিন্য ঘটিত। লালাবাবু সংসারের বৈষয়িক ব্যাপারে যেন এক প্রকার ঔদাসীন্য দেখাইতেন। ইহাতে পিতামহ গঙ্গাগোবিন্দ স্থির করিলেন যে, শীঘ্র বিবাহ দিলেই লালাবাবু সংসারাসক্ত হইয়া সমস্ত বিষয়ে মনোযোগী হইবেন। যে হেতু উদাসী মনকে সংসারের প্রতি আকর্ষণ করিবার পক্ষে বিবাহ একটী অমোঘ উপায়। এই বিশ্বাসে তিনি রশোড়া নিবাসী গৌরমোহন ঘোষের অপরূপা কন্যা কাত্যায়নীর সহিত মহা সমারোহে উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

স্ত্রীর দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণগ্রামে ও রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া লালাবাবু কিছু দিন সংসারে আসক্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পিতামহের মৃত্যুর পর তিনি আবার স্পৃহা শূন্য হইলেন। ইহাতে পিতা প্রাণকৃষ্ণ তাঁহার উপর প্রায়ই বিরক্ত হইতেন। একদা লালাবাবু তাঁহার ভৃত্যের পরিধেয় বস্ত্রের প্রয়োজন হওয়ায়, এষ্টেটের প্রধান কর্ম্মচারীকে বস্ত্র দিতে বলিলেন। তিনি ভৃত্যকে একখণ্ড ক্ষুদ্র বস্ত্র প্রদান করিলেন। ভৃত্য রজ্জু দ্বারা বস্ত্রের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া লালাবাবুকে দেখাইয়া বলিল, মহাশয় একটু বড় হইলে ভাল হইত। ইহা দেখিয়া লালাবাবু কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার ভৃত্যকে কেন এত ক্ষুদ্র বস্ত্র দিয়াছেন? উত্তরে কর্ম্ম-

চারী বলিলেন, আমি কি করিব, আপনার পিতার এইরূপ আদেশ। ইহাতে লালাবাবু বিরক্ত হইয়া পিতাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তুমি উপযুক্ত হইয়াছ যখন তোমার বিষয় বৃদ্ধি করিবার বাসনা নাই এবং উপার্জ্জন করিবারও ক্ষমতা নাই, তখন ইহাতেই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। নচেৎ স্বয়ং উপার্জ্জন করিয়া ভৃত্যকে উত্তম বস্ত্র ক্রয় করিয়া দিতে পার। পিতৃমুখ নিঃসৃত এরূপ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি লজ্জায় ও ক্রোধে গৃহত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তখন তিনি স্ত্রীর একখানি অলঙ্কার লইয়া অশীতি মুদ্রা সংগ্রহ করিলেন এবং ভৃত্যকে উপযুক্ত বস্ত্র প্রদান করিয়া অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। স্বাধীনতাপ্রিয় লালাবাবু রাজার সন্তান হইয়া পরের দাসত্ব করিতে বাধ্য হইলেন।

কর্ম্মজীবন।

তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও পদমর্য্যাদার জন্য কর্ম্ম পাইতে অধিক বিলম্ব হইল না। তিনি ১১৯৯ সালে সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমে বর্দ্ধমানে কলেক্টর সাহেবের সেরেস্তাদারের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এই কর্ম্ম করিতে করিতে তিনি বর্দ্ধমান জেলায় লাট বিশালাক্ষীপুর নামক জমিদারী ক্রয় করিলেন। লালাবাবুর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও যোগ্যতা দেখিয়া, গভর্ণমেণ্ট উড়িষ্যা বন্দোবস্ত কালে তথাকার রাজস্ব বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা করিয়া তাঁহাকে উড়িষ্যা প্রেরণ করিলেন। তথায় তাঁহার কার্য্যে বিশ্বস্ততা, উপযোগিতা ও রাজনীতিজ্ঞতা দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহার ক্রমশঃ পদোন্নতি করিতে লাগিলেন। এই স্থানে কার্য্য করিতে করিতে তিনি পরগণা রাহাং, সায়ার ও চাবিসকুদ ক্রয় করেন। তিনি শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়া ৺জগন্নাথদেবের সেবার জন্য দৈনিক ১০৲ টাকা ভোগের বন্দোবস্ত করেন। ১২১৫ সালে হঠাৎ একদিন

তিনি পিতার কঠিন পীড়ার সংবাদ প্রাপ্ত হন। তখনি তিনি কান্দীর বাটীতে পিতাকে দেখিবার জন্য যাত্রা করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি বাটী গমন করিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিলেন না। পথের দূরত্ব হেতু তিনি যাইতে না যাইতে পিতার জ্ঞান ও বাক্-শক্তি অন্তর্হিত হয়। পিতার মৃত্যুর পর তিনি গভর্ণমেণ্টের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর আরাধনায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সংসারে অনাসক্তি জন্মিল। ইন্দ্রিয় সংযমের নিমিত্ত তিনি মৎস্যাদি আমিষ খাদ্য ত্যাগ করিয়া নিরামিষ ও সামান্য আহার্য্যে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। এবং পূজা আহ্নিক হরিনাম ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি কান্দীর বাটীতেই থাকিতেন। কখনও কখনও তিনি ধর্ম্মপিপাসু হইয়া কলিকাতার বাটীতে আসিতেন; এবং বহু সংখ্যক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সহিত বিচার করিতেন। তিনি চরিত্র ও ধর্ম্মবলে এরূপ বলীয়ান্ ছিলেন যে কেহ কখনও তাঁহাকে কুপথে লইয়া যাইতে পারেন নাই। কুসংসর্গকে তিনি আন্তরিক ঘৃণা করিতেন। জোড়াসাঁকোর সিংহ বংশীয় এবং শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণের পুত্র রাজা রাজকৃষ্ণের সহিত তাঁহার বড় সৌহার্দ্দ ছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি অন্য কাহারও সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতেন না।

গৃহত্যাগ।

এইরূপে তিনি কখনও কলিকাতায় কখনও কান্দীতে বাস করিয়া শেষে বৃন্দাবনে বাস করিবার মানস করিলেন। চোরবাগানের নীলমণি বসুর উপর বিষয় কর্ম্মের ভার অর্পণ করিয়া ধর্ম্মচিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। একদা এক ধীবর কন্যা কান্দীর বাটীতে মৎস্য বিক্রয় করিয়া মূল্যের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। বেলা অধিক হওয়ায়

সে বলিল—"পারে যাবার বেলা গেল, একটু শীঘ্র ক'রে দাম দাও।" এই এক কথায় লালাবাবুর হৃদয় তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার সংসারের প্রতি বৈরাগ্য জন্মিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন মিছে সংসারের মায়ায় ভুলিয়া আছি, ভবপারে যাইবার সময় হইয়া আসিল, কৈ তাহার ত কিছুই সম্বল নাই। ধন দৌলত ত আমার সঙ্গে যাইবে না। আর কেন বৃথা প্রলোভনে মুগ্ধ থাকি? এইরূপ চিন্তা-স্রোতঃ তাঁহার হৃদয় সমুদ্রে প্রবাহিত হওয়ায়, তিনি অসার সংসারের মায়া ও ঐশ্বর্য্যসুখে জলাঞ্জলি দিয়া বৈরাগ্য-পথে ধাবিত হইলেন। জীবনাধিক একমাত্র শিশুপুত্র ও প্রিয়তমা ভার্য্যা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি পরিজনবর্গের স্নেহপাশ ছিন্ন করিয়া পবিত্র তীর্থ শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র রমণীয় শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন করিলেন। কেহ কেহ বলেন যে এক রজক কন্যা তাহার পিতাকে বলিতেছিল, "বাবা বেলা যে গেল, বাস্‌নায় আগুন দাও।" এই কথা শুনিয়া লালাবাবুর মর্ম্মে আঘাত লাগিল, তিনি অস্থির হইলেন; ভাবিলেন, আমারও দিন ফুরাইয়া আসিতেছে, কিন্তু বাসনায় আগুন দিলাম কৈ? সেই মুহূর্ত্তেই তিনি সংসারে অনাসক্ত হইয়া বৈরাগ্য পথে ধাবিত হইলেন। তাঁহাকে বৃন্দাবন হইতে গৃহে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাঁহার স্ত্রী কর্ত্তৃক অনেক চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু বৈরাগ্যের অবতার সংসার ত্যাগী চরিত্রবান্ মহাপুরুষকে সংসার প্রলোভনে মুগ্ধ করা কাহার সাধ্য? সুতরাং তাঁহার স্ত্রীর সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল।

লালাবাবু ১২১৫ সালের শেষ ভাগে ৩৩ বৎসর বয়সে সংসার পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন। তথায় রাধা কৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি ও মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া প্রত্যহ অতিথির সেবা করিবেন এই বাসনায় তিনি গৃহত্যাগের সময় ২৫ লক্ষ টাকা লইয়া যান। তিনি বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া প্রথমে ভরতপুরের মহারাজার এক প্রাসাদে

অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেও প্রথমেই সন্ন্যাস ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে পারেন নাই। মনুষ্য একেবারে সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারে না। তজ্জন্য বাসনার দাস মানব সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিলেও অন্ততঃ পুণ্যের বাসনাও হৃদয়ে পোষণ করে। লালাবাবু সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে আসিলেন, কিন্তু মন্দির করিব, বিগ্রহ স্থাপন করিব, অতিথি সেবা করিব ইত্যাদি রূপ বাসনার অধীন হইয়া তাঁহাকে অর্থের জন্য ২৫ লক্ষ মুদ্রার মায়ায় আবদ্ধ হইতে হইয়াছিল। তিনি বৃন্দাবনে ভরতপুরাধিপতির প্রাসাদে অবস্থিতি করিয়া প্রথমতঃ অসাধারণ দান করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে তিনি প্রত্যেক ব্রজবাসীর নিকট পরিচিত হইতে লাগিলেন। অর্থাধিক্যের সন্ধান পাইয়া দস্যু তস্করগণ তাঁহার প্রায় ৩ লক্ষ মুদ্রা অপহরণ করিয়াছিল। তৎপরে তিনি শীঘ্র শীঘ্র মন্দির নির্ম্মাণে মনোযোগী হইলেন। মন্দির নির্ম্মাণের প্রধান উপকরণ, প্রস্তরের জন্য তিনি রাজস্থানের এক রাণার নিকট আবেদন করিলেন। ইহাতে রাণা তাঁহাকে বিনামূল্যে আবশ্যক মত প্রস্তর লইয়া যাইবার অনুমতি প্রদান করেন। তিনি যমুনার পবিত্র মনোমুগ্ধকর পুলিন প্রদেশে এই বিশাল মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

বৃন্দাবন-জীবন।

রাণার রাজ্য হইতে শ্বেত প্রস্তর, মর্ম্মর প্রস্তর, প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের নানাবিধ প্রস্তর আসিতে লাগিল। বর্দ্ধমান জেলার দাঁইহাট নিবাসী কৃষ্ণচন্দ্র নামক বিখ্যাত ভাস্কর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বিগ্রহমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। মন্দিরের কার্য্যও প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় লালাবাবু এক মহা বিপদে পড়িলেন। বিপদের কারণ—ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট রাজপুতনায় কয়েকটী রাজার সহিত একটী সন্ধি স্থাপন

করিবার প্রস্তাব করেন। তদনুসারে রাণাকেও উক্ত সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবার আদেশ হয়, রাণা তাহাতে স্বাক্ষর করিতে ইতস্ততঃ করায়, কর্ত্তৃপক্ষদের মনে সন্দেহ হয় যে, লালাবাবু রাণার দেওয়ান, তাঁহারই কুমন্ত্রণায়, রাণা সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন। স্যার চার্লস মেটকাফ্ তখন দিল্লীর দরবারে কোম্পানীর পক্ষে রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি এই সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া লালাবাবুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অপরাধে অভিযোগ করতঃ তাঁহাকে ধৃত করিবার আদেশ প্রচার করিলেন। ইহাতে সমস্ত মথুরাবাসী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া এরূপ উত্তেজিত হইয়াছিল, যে প্রায় দশসহস্র ব্যক্তি লালাবাবুকে বেষ্টন করিয়া শরীর রক্ষকরূপে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। ক্রমে যতই তিনি দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ততই লোক সকল দলে দলে আসিয়া দলবৃদ্ধি করিতে লাগিল। শেষে প্রায় বিংশতি সহস্র লোক দলপুষ্ট হইয়া মহা কোলাহলে রাজপথ পরিপূর্ণ করিয়া চলিল। মেটকাফ্ রাজপথে এরূপ জনসঙ্ঘ দর্শনে ভীত হইয়া তাঁহার কর্ম্মচারী শান্তিপুর নিবাসী দেবীপ্রসাদ রায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, এরূপ জনতা হইবার কারণ কি? ইহাতে দেবীপ্রসাদ বলিলেন যে, লালাবাবু একজন সংসার ত্যাগী মহাপুরুষ। তিনি এবং তাঁহার পিতৃ-পিতামহাদি পূর্ব্ব পুরুষগণ সকলেই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিশ্বস্ত উচ্চ কর্ম্ম-চারী ছিলেন। আমার বোধ হয় তিনি এ সমস্ত বিষয় কিছুই জানেন না। তিনি নির্দ্দোষ, তজ্জন্য এত লোক ইঁহার অনুগমন করিতেছে। তখন মেটকাফ্ সাহেব লালাবাবুকে নিজ সম্মুখে আনয়ন করিয়া তাঁহার পরিচয় গ্রহণ করিলেন। তৎপরে রাণা সংক্রান্ত ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—"আমি এবং আমার পূর্ব্বপুরুষগণ চিরকাল যখন কোম্পানির অন্নে প্রতিপালিত, তখন সেই অন্নদাতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইব, এরূপ জনরব যে, কি রূপে, কোথা হইতে উত্থিত হইল, তাহা আমি

বুঝিতে পারিতেছি না। বরং স্বাক্ষর সম্বন্ধে আমি রাণাকে যে সকল সদুপদেশ দিয়াছি, তাহা রাণাকে জিজ্ঞাসা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।” মেটকাফ্ যখন অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, যে লালাবাবু সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ তখন তিনি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে দিল্লীর সম্রাটের নিকট লইয়া যাইলেন। দিল্লীশ্বর লালাবাবুর পরিচয় পাইয়া তাঁহার বিশেষ-রূপে সম্বর্দ্ধনা করিলেন; এবং মহারাজা উপাধি দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সংসার ত্যাগী লালাবাবু সবিনয়ে উক্ত উপাধি লইতে অস্বীকার করিলেন। এই সমস্ত ব্যাপারে প্রায় এক মাস কাল লালাবাবুকে দিল্লী নগরে অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। দিল্লী অবস্থান কালে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবার জন্য তিনি তথায় কিছু জমিদারী ক্রয় করেন। তৎপরে মাসাবধির পর যখন তিনি দিল্লী হইতে বৃন্দাবনে প্রত্যাবৃত্ত হন, তখন তাঁহাকে দর্শন করিয়া সকলে উৎফুল্ল হৃদয়ে উচ্চ কলরোলে “জয় লালাবাবুর জয়” বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। যেন রাহুগ্রস্ত পূর্ণচন্দ্রমা মুক্ত হইয়া স্বীয় মধুর কিরণমালা বিস্তার করিতে করিতে মর্ত্ত্যবাসীর উদ্গ্রীব-নয়ন-পথে উদ্ভাসিত হইলেন।

দিল্লী হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মহা সমারোহে তিনি রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। বিগ্রহের মুরলীবদন শ্যামকান্তি ও শ্রীরাধিকার প্রেমময়ী মোহিনী মূর্ত্তি এত নয়নাভিরাম যে দেখিলে ভক্ত মাত্রেই অবিরল ধারায় প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। মন্দিরটী শ্রীক্ষেত্রের মন্দিরের অনুকরণে শ্বেত প্রস্তরের দ্বারা নির্ম্মিত। ইহার একটী মাত্র চূড়া, তাহা নানা কারুকার্য্য বিশিষ্ট। ইহার শিল্প নৈপুণ্য ও স্থপতি বিদ্যা দর্শন করিলে ইটালীর স্থাপতিগণকেও লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। কি সুন্দর মনোহর মন্দির! যমুনার সেই কৃষ্ণচরণ মথিত সুপবিত্র মনোহর পুলিন প্রদেশে এই বিশ্ব বিশ্রুত বিশাল মন্দির বিরাজিত। তিনি এই মন্দিরের দৈনিক ভোগের ব্যয় একশত টাকা বরাদ্দ করেন এবং

তাঁহার কুঞ্জে প্রত্যহ যাহাতে ৫০৲ লোক প্রসাদ পায় এইরূপ বন্দোবস্তের জন্য, তিনি মথুরা, আলিগড় ও বুলন্দ সহরের অনেক টাকার সম্পত্তি, এবং রাজা সের সিংহের বিস্তৃত জমিদারী ক্রয় করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রিমার নামে উৎসর্গ করিলেন। এই মন্দিরে ১৫ দিন একজন অতিথি প্রসাদ পাইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার বংশের কেহই এক দিনের অধিক প্রসাদ পাইবেন না, এইরূপ নিয়ম করিয়া যান। তিনি লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়া রাধাকুণ্ডের সংস্কার করিয়া প্রস্তর দ্বারা মণ্ডিত করেন। এবং গোবর্দ্ধনে নিজের জন্য একটী কুঞ্জ ও "জায়েন" নামক একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তথায় "রঙ্গজী" নামক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

একবার ভরতপুরের রাজা লালাবাবুর প্রতি কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার শিরশ্ছেদনের আদেশ প্রদান করিলেন। তদনুসারে আজ্ঞাবাহী ঘাতক লালাবাবু ভ্রমে রাধামোহন ঘোষ নামক এক ব্যক্তির প্রাণ হনন করিল। ইহাতে লালাবাবু অতিশয় মানসিক কষ্টে কাল কাটাইতে লাগিলেন। ভরতপুরাধিপতি শত্রু নিপাত হইয়াছে শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। পরে যখন লালাবাবু সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুক বেশে অরিপুরে ভরতপুর রাজসন্নিধানে ভিক্ষা প্রার্থী হইলেন, তখন তিনি লালাবাবুকে দর্শন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন,--আমি এই সাধুপুরুষের প্রতি অত্যাচার করিয়া কি মহাপাপই না করিয়াছি! এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তদীয় চরণতলে পতিত হইলেন। সাধুগণের নির্ম্মল আকর্ষণে মহারাজাধিরাজেরও চিত্ত প্রসন্ন ও উদার হয়। সাধু সংসর্গে ভরতপুরাধিপতির কলুষিত চিত্ত, বিনয় ও সৌজন্যে আজ দেবতুল্য হইল। তিনি লালাবাবুর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রমার সেবার নিমিত্ত ভিক্ষা স্বরূপ বিস্তর ভূসম্পত্তি দান করিলেন।

শেষ জীবন।

লালাবাবুর শেষ জীবনের কঠোর ব্রতপালন ও অমানুষিক ত্যাগ স্বীকার এবং বিনয় ও দৈন্যভাব শ্রবণ করিলে পাষণ্ডেরও হৃদয় বিগলিত হয়। লালাবাবু প্রথমে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মন্দিরে বাস এবং যৎসামান্য প্রসাদ ভোজন করিয়া অষ্ট প্রহর হরিনাম করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তখনও তাঁহার মন্ত্র গ্রহণ করা হয় নাই। সুতরাং দীক্ষার জন্য তিনি পাগল হইলেন। সেই সময়ে বিখ্যাত বৈষ্ণব চূড়ামণি কৃষ্ণদাস বাবাজী বৃন্দাবনে বাস করিতেছিলেন। ইনি ভক্তমাল গ্রন্থের অনুবাদক। ইঁহার সাধুতা ও ভগবদ্ভক্তির পরিচয় পাইয়া লালাবাবু বাবাজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবেন স্থির করিলেন। এই স্থির করিয়া একদিন লালাবাবু দীন বেশে কৃষ্ণদাস বাবাজীর নিকট গমন করিয়া স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিয়া তাঁহার চরণ প্রান্তে পতিত হইলেন। লালাবাবুর গুণগাথা এবং বংশ পরিচয় তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি লালাবাবুকে সমাদর করিয়া অতিদীন ভাবে বলিলেন, বাবা তোমার দীক্ষা গ্রহণের এখনও সময় হয় নাই, কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। ইহা শুনিয়া লালাবাবু বিষণ্ন বদনে তাঁহার চরণে বিদায় গ্রহণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন— গুরুজীর এরূপ বলিবার কারণ কি? হয় তিনি পাণ্ডিত্যাভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে এরূপ অপ্রিয় কথা বলিলেন, নচেৎ আমার কিছু ত্রুটী আছে, তজ্জন্য তিনি আমার প্রতি বিমুখ হইলেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি দুঃখ ও বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইয়া মনে করিতে লাগিলেন,— আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনবাসী হইলাম, কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া অতিথি সেবার জন্য সমস্ত দান করিলাম, ঠাকুর বাটীতে কেবল মাত্র এক মুষ্টি প্রসাদ ভোজন করিয়া হরিনামামৃত পানে জীবন অতিবাহিত করিতেছি, অথচ বাবাজী বলিলেন, দীক্ষার এখনও বিলম্ব আছে, আমার

কি দুরদৃষ্ট! এইরূপে দুঃখিত চিত্তে কালাতিপাত করিতে করিতে নিজ চরিত্র অনুশীলনে বুঝিতে পারিলেন, যে আমার মনে এখনও বিলক্ষণ তমঃ রহিয়াছে, তাই প্রভুর কৃপা হইল না। আমার ঠাকুরবাড়ী, আমার অতিথিশালা, আমার ব্যয়সম্পন্ন ভোগ প্রসাদ ইত্যাদি আমিত্ব জ্ঞান বা অহঙ্কারত কৈ এখনও তিরোহিত হয় নাই। এবং আমি যখন সমস্ত উৎসর্গ করিয়াছি তখন কি রূপে আমি ঐ প্রসাদ আবার গ্রহণ করি? আমার ত আর কিছুই নাই, সুতরাং আমার ভিক্ষা করিয়া জীবন অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য। এই স্থির করিয়া তিনি মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করতঃ কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমণ করিয়া ভিক্ষা দ্বারা প্রাণ ধারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ দীন ভাবে কিছুদিন কাটাইয়া এক দিবস ধীরে ধীরে কৃষ্ণদাস বাবাজীর কুটীরে উপনীত হইলেন, এবং কাতর কণ্ঠে তাঁহার চরণ প্রান্তে সজল নয়নে পুনর্ব্বার কৃপা ভিক্ষা করিলেন। বাবাজী তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া সমাদর পূর্ব্বক দীন মধুর বচনে বলিলেন, বাবা! তোমার দীক্ষার আর একটু বিলম্ব আছে, ধৈর্য্য ধারণ কর, সময়ে ভগবানের কৃপা লাভ করিবে। লালাবাবু চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্তম্ভিত হইলেন, অবিরল ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে ভগ্ন মনোরথে প্রত্যাগমন করিয়া আবার গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তৎপরে স্বীয় অপরাধ অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন আমার হৃদয় এখনও অহঙ্কারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, এখনও হৃদয়ের মলিনতা ও সঙ্কীর্ণতা দূর হয় নাই! আমি সর্ব্বত্র ভিক্ষা করিতে যাই, কৈ এক দিনও ত শেঠ বাবুদের কুঞ্জে ভিক্ষা করিতে যাইতে পারিলাম না! অহঙ্কার প্রভাবে সে দিকে যাইতে যেন লজ্জা ও দম্ভ আসিয়া উপস্থিত হয়। ছি ছি! ধিক আমাকে! এখনও শেঠ বাবুদের শত্রু জ্ঞানে ঘৃণা করি! কৈ তবে আমার মন অহঙ্কার-শূন্য হইল কৈ? চিত্তশুদ্ধি না হইলে ত ভগবানের দয়া হইবে না। ধন্য বাবা কৃষ্ণদাস! ধন্য তোমার মহিমা! এইরূপ চিন্তা

করিতে করিতে তিনি রাত্রে স্বপ্নাদিষ্ট হইলেন যে, শীঘ্র শেঠ বাবুদের বাটীতে ভিক্ষা গ্রহণ কর। স্বপ্ন দর্শন করিয়া তিনি চমকিত হইলেন। ভাবিলেন কি আশ্চর্য্য, অভিমানই আমার পরম শত্রু। অভিমান প্রভাবেই আমি বাবাজীর কৃপা লাভে বঞ্চিত হইয়াছি। তিনি তখনই অভিমান পরিত্যাগ করিলেন। প্রভাত হইবামাত্র তিনি অতি দীন ভাবে শত্রুপুরী শেঠেদের কুঞ্জে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ভিক্ষা পাত্র হস্তে লালাবাবুকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া ঠাকুর বাটীর কর্ম্মচারিগণ কাঁদিয়া ফেলিল। সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র শেঠজী আসিয়া দেখিলেন সত্যই লালাবাবু আজ তাঁহার দ্বারে ভিক্ষাপ্রার্থী। তাঁহার দীন বেশ, বৈরাগ্য ও ঔদাসীন্য দেখিয়া তিনিও কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার ক্রোধ ও শত্রু ভাব একেবারে গলিয়া গেল। তিনি লালাবাবুর চরণে পতিত হইলেন। বিনয়ের কি অদ্ভুত ক্ষমতা! শেঠবাবুর মান, অভিমান, ক্রোধ, অহঙ্কার, শত্রুতা কোথায় পলায়ন করিল। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে যিনি বিনয়কে আশ্রয় করেন, তাঁহার নিকট চিরবৈরীও পরম মিত্র হয়। তাই লালাবাবুর অহঙ্কার-শূন্যতা, সরলতা, বিনয় ও দৈন্যভাব দর্শন করিয়া পরম শত্রু শেঠজী আজ লালাবাবুর চরণ প্রান্তে পতিত হইলেন। নির্ম্মল-হৃদয় লালাবাবু তৎক্ষণাৎ শেঠজীকে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন; এবং উভয়েই প্রেমাশ্রু সলিলে ভাসিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ এই অবস্থায় থাকিয়া শেঠজী লালাবাবুকে প্রসাদ ভোজন করাইবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু লালাবাবু মাধুকরীব্রত ভঙ্গ করিতে যখন কোন প্রকারে সম্মত হইলেন না, তখন তিনি অগত্যা মুষ্টি ভিক্ষাই প্রদান করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে ব্যাকুল চিত্তে লালাবাবুর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। লালাবাবু শেঠজীর ভদ্র ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া যেমন ঠাকুরবাড়ী হইতে বাহির হইলেন, অমনি দেখেন, সম্মুখে কৃষ্ণদাস বাবাজী। লালাবাবু তৎক্ষণাৎ "গুরুদেব" বলিয়া তাঁহার চরণ তলে মূর্চ্ছিত হইয়া

পতিত হইলেন। বাবাজী তাঁহার শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক স্নেহপূর্ণ বচনে বলিলেন—“বাবা, এইবার তোমার দীক্ষার সময় উপস্থিত।”

তৎপরে লালাবাবু কৃষ্ণদাস বাবাজীর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সাধনার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি ভিক্ষালব্ধ রুটী দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন। তাঁহাকে আর রন্ধনাদি করিয়া সময় নষ্ট করিতে হইত না। ব্রজবাসিগণ তাঁহার জন্য এক প্রকার সুন্দর রুটী প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ আগমনের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিত। তিনি এক বাটী ভিন্ন আর দ্বিতীয় বাটীতে গমন করিতেন না। তজ্জন্য সকলেই তাঁহার জন্য প্রস্তুত থাকিতেন। অদ্যাপি বৃন্দাবনে এক প্রকার রুটী হয় তাহা লালাবাবুর রুটী নামে বিখ্যাত। শেষে তিনি সন্ধ্যার পর কম্বলাবৃত দেহে গুপ্তবেশে ভিক্ষার্থ কোন একটী মাত্র গৃহস্থের বাটীতে গমন করিতেন। যদি ভিক্ষা পাইতেন সে দিন আহার হইত, নচেৎ অভুক্ত অবস্থায় নিশা অতিবাহিত হইত। তিনি সাধনার ফলে আহার পরিত্যাগ করিয়া, ফলমূল তৎপরে শুষ্কপত্র চর্ব্বন করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। যোগের এমনি প্রভাব যে স্বীয় রসনা ও উদর নিজের আয়ত্তাধীন হইল। যোগের সেই অপূর্ব্ব শক্তি প্রভাবে তিনি সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করিয়া শেষে বাক্য পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া মৌনী সন্ন্যাসী হইলেন। সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণের পর চতুর্দ্দিকে তাঁহার নাম ব্যাপ্ত হইল। তাঁহাকে দর্শন করিতে বহুলোকের সমাগম হইত, কিন্তু তিনি তখন কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না।

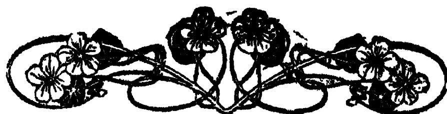
মৃত্যু।

এই পুণ্যবান্ মহাপুরুষের পরলোক গমন সম্বন্ধে এরূপ কিংবদন্তি আছে যে—একজন গণক গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে তাঁহার ক্ষুরে

মৃত্যু হইবে। এই আশঙ্কায় তিনি ক্ষৌর কার্য্যাদি করিতেন না, শ্মশ্রু রাখিয়াছিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের ফের,—নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম কে উলঙ্ঘন করিবে? একদিন গোয়ালিয়ারের মহারাণী গোবর্দ্ধনে লালাবাবুকে দর্শন করিতে আসিতেছিলেন। লালাজী তখন মৌনব্রতাবলম্বী, পাছে তাঁহাকে কথা কহিতে হয়, এই ভয়ে তিনি পলায়নের অবসর অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এমন সময়ে মহারাণী তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া, যেমন লালাবাবু সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, অমনি সেই সময় সহসা মহারাণীর অশ্ব লালাবাবুকে পদাঘাত করিল। অশ্বের ক্ষুরের আঘাতেই তিনি ভূতলশায়ী হইলেন। অতঃপর অন্যান্য ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া কুঞ্জে লইয়া আসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই তাঁহার গুরুদেব কৃষ্ণদাস বাবাজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি গুরুদেবের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে ১২২৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল পক্ষীয় দ্বিতীয়া তিথিতে ৪৬ বৎসর বয়সে দিব্যধামে গমন করিলেন। গুরুদেব তারক-ব্রহ্ম নাম শুনাইতে লাগিলেন। ভক্তবৃন্দ সকলে রোদন করিতে লাগিলেন। গোয়ালিয়ারের মহারাণী রোদন করিতে করিতে বিলাপ করিতে লাগিলেন, কোথায় সাধু দর্শন করিয়া পুণ্য অর্জ্জন করিব না আমিই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইলাম! আমার মত পাপীয়সী আর কে আছে? লালাবাবুর মৃত্যু সংবাদ অচিরে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। বৃন্দাবনের সমগ্র রাজপথ জনতার প্লাবনে নিমগ্ন হইল, সহস্র সহস্র কণ্ঠ বিস্ফুরিত রোদন ধ্বনি গগন প্রাঙ্গণ বিদীর্ণ করিল। বৃন্দাবনবাসীর গভীর করুণ নিনাদ দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। হায়! ধর্ম্মরাজ্যের একটী নক্ষত্র খসিয়া পড়িল। জগৎ হইতে একটী ধার্ম্মিক চূড়ামণি অন্তর্হিত হইলেন। এখন আর কয় জন লালাবাবুর মত দেখা যায়? একটী রত্ন বিলুপ্ত হইলে পুনরায় তেমনটী আর দৃষ্ট হয় না।

লালাবাবু স্বর্গে গিয়াছেন কিন্তু তাঁহার পবিত্র নাম প্রত্যেক ভারত-বাসীর হৃদয়ে চিরদিন দেদীপ্যমান থাকিবে। তাঁহার অলৌকিক ধর্ম্মানুরাগ এবং অসাধারণ বৈরাগ্য, অদ্যাবধি আবাল, বৃদ্ধ, বনিতার হৃদয়ে তাঁহার নাম স্মরণ করাইয়া দিতেছে। ধন্য লালাবাবু, এ জগতে তুমি চিরদিনই অমর হইয়া থাকিবে।

লালাবাবুর মৃত্যুর বহুপূর্ব্ব হইতেই তাঁহার পত্নী রাণী কাত্যায়নী কান্দীর রাজ-সম্পত্তি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং তাঁহার একমাত্র নাবালক পুত্র শ্রীনারায়ণ চন্দ্র সিংহের অভিভাবক ছিলেন। রাণী কাত্যায়নী সৎ কার্য্যে ও পরসেবা ব্রতে অনেক অর্থ দান করিয়াছিলেন। শ্রীনারায়ণ সিংহ তিনটী বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় দুইটী কন্যা ব্যতীত তাঁহার একটীও পুত্র সন্তান জন্মে নাই। তাঁহার জীবদ্দশাতেই মধ্যমা স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তজ্জন্য প্রথমা স্ত্রী প্রতাপনারায়ণ ও কনিষ্ঠা স্ত্রী ঈশ্বর চন্দ্র নামে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ইঁহাদের দ্বারাই বিখ্যাত পাইকপাড়ার রাজবংশের উৎপত্তি হইয়াছে। কান্দীর রাজবংশ এখন কলিকাতার অধিবাসী। ইঁহারা সেই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের নাম স্মরণ করাইয়া দিতেছেন।





রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর।

Queen Press.



সমাজ-রক্ষক রাধাকান্ত দেব।

স্বধর্ম্মনিষ্ঠতা, সদাশয়তা এবং মহাপ্রাণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সৌরভে দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত করিবার জন্য যেন এই স্বনামধন্য মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় ও খৃষ্টানদিগের সেই ভয়ঙ্কর ধর্ম্মান্দোলন-যুগে এই ধর্ম্মবীর প্রকৃত যোদ্ধার ন্যায় প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় সর্ব্বজন সমাদৃত, উন্নত-মনা, নির্ম্মল-চরিত্র তেজস্বী মনীষী বঙ্গদেশে এ পর্য্যন্ত আর কেহ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ।

শোভাবাজারের বিখ্যাত রাজবংশে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের পৌত্র এবং রাজা গোপীমোহন দেবের একমাত্র পুত্র ছিলেন। ১৭৮৪ খৃঃ ১১ই মার্চ্চ (১১৯১ সালের ১লা চৈত্র) ইনি সিমুলিয়াস্থিত মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। প্রভূত ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে পালিত হইলেও বিদ্যানুশীলনে চিরদিন ইঁহার মূল্যবান্ জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই তিনি বিদ্যানুরাগী ছিলেন। প্রথমে গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় তিনি সামান্য বাঙ্গালা ও অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা করেন। বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা তখন অতিশয় মন্দ ছিল। শিক্ষালাভের জন্য তৎকালে একখানিও

উৎকৃষ্ট পুস্তক ছিল না। তজ্জন্য তাঁহার পিতা বাড়ীতে উপযুক্ত পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া উত্তম বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দিয়াছিলেন। তৎপরে মিঃ ক্যানিং সাহেবের বহুবাজার স্থিত কলিকাতা একাডেমিতে তিনি ইংরাজী বিদ্যাশিক্ষা করেন এবং তৎসঙ্গে মৌলভীদের নিকট পার্শী ও আরবি ভাষা শিক্ষা করিয়া দেশের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হইয়া উঠেন। অল্প বয়সে তাঁহার এতাদৃশ শিক্ষা নৈপুণ্য দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি অতি সুশীল, সুসভ্য ও বিনম্র ছিলেন। তাঁহার শিখিবার শক্তিও অসাধারণ ছিল।

কর্ম্মজীবন।

এইরূপে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া তিনি নানা দেশহিতকর কার্য্যে যোগদান করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে সাধারণের এই বিশ্বাস ছিল যে, ইংরাজী শিক্ষা করিলেই লোকে খৃষ্টান হয়; কিন্তু যখন দেশের লোক দেখিলেন যে রাধাকান্ত নিজে ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ হইয়া উক্ত ভাষা প্রচলন করিবার পোষকতা করিতেছেন, এবং পিতৃপিতামহের দৃষ্টান্তানুসারে সম্পূর্ণরূপে হিন্দু আচার ব্যবহার রক্ষা করিয়া চলিতেছেন, তখন সেই কুসংস্কার অমূলক বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস হইল। মহাত্মা ডেভিড হেয়ার দেশের সুশিক্ষার জন্য যখন একটী ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন, রাজা রাধাকান্ত দেব সেই প্রথম সদনুষ্ঠানের প্রধান উৎসাহ দাতা ছিলেন। দেশের লোকের বিদ্যালাভ ও জ্ঞানার্জ্জনের পথ মুক্ত করিবার জন্য তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। হিন্দুকলেজ স্থাপন বিষয়ে ইনি বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। তৎপরে উক্ত কলেজের স্থাপনার পর তিনি উহার অন্যতম পরিচালক হইয়াছিলেন। কলেজে প্রথমাবস্থায় হিন্দুগণ উক্ত বিদ্যালয়ে বালক পাঠাইতে অসম্মত হইতে লাগিলেন। কারণ তাঁহাদের বিশ্বাস খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারই কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্য। পরে যখন রাধাকান্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের

নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে কলেজে খৃষ্টধর্ম্মের উপদেশ দেওয়া হইবে না, তখন হিন্দুগণের আর কোন আপত্তি রহিল না। তিনি সমস্ত দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে লইয়া উক্ত বিদ্যালয় পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তিনি হিন্দু-ধর্ম্মে ও হিন্দুর আচার ব্যবহারে আস্থাবান্ ছিলেন বলিয়াই হিন্দু-সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ভাজন ছিলেন; তজ্জন্য তিনি যাহা বলিতেন তাহাতেই লোকে বিশ্বাস করিত। তৎপরে তিনি স্ত্রী-শিক্ষার বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন। যখন দেশের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে নানা কুসংস্কার প্রচলিত ছিল—স্ত্রীলোক লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হয়, স্বেচ্ছাচারিণী হয় ইত্যাদি-রূপ অন্ধ বিশ্বাস ছিল, তখন রাধাকান্ত দেব স্বীয় অন্তঃপুর মধ্যে বালিকা বিদ্যালয় খুলিয়া অল্প বয়স্ক বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তিনি সেই সময় স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি বিধানের জন্য "স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ক" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সকলকার ভ্রম দুর করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা ও যত্নে এদেশে প্রথম স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন হয়।

ইহার পর তিনি সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইয়া ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালীর সংস্কার করেন; এবং ঐ কার্য্য করিবার সময় তাঁহার মনে একখানি সংস্কৃত অভিধানের অভাব উপলব্ধি হয়। সেই অভাব পূর্ণ করিবার মানসে তিনি প্রভূত অর্থব্যয় ও ৪৬ বৎসরের অপরিমিত পরিশ্রমে এক বিরাট্ সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন করেন; ইহার নাম—

শব্দকল্পদ্রুম।

ইহা তাঁহার জীবনের যথার্থ অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ। এই মূল্যবান্ অভিধান প্রকাশিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছিল। ১২২৯ সালে ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। ইহার জন্য তিনি একটী স্বতন্ত্র ছাপাখানা স্থাপিত ও টাইপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই টাইপ "রাজার টাইপ" নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এই সুবিশাল অভিধান প্রণয়ন করিয়া তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন, এবং

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বত্র কিরূপ স্মৃতিস্তম্ভ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার আর নূতন পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। এই অভিধান প্রণয়ন তাঁহার জীবনের অবিনশ্বর গৌরব। ইহা কখনও কাহারও স্মৃতি-সীমার বহির্ভূত হইবে না। যত দিন যে দেশে সংস্কৃত ভাষার আদর থাকিবে, ততদিন সেই স্থানে রাধাকান্ত দেবের নাম ও কীর্ত্তি অক্ষুন্ন থাকিবে। এই গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য ১২৬৬ সালে (১৮৫৯ খৃঃ) কলিকাতার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে একত্র মিলিত হইয়া একটী প্রকাশ্য সভায়, তাঁহাদের ভক্তি ও সম্মানের নিদর্শন স্বরূপ তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন; এবং তাঁহাদের সংগৃহীত অর্থদ্বারা তাঁহার একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করেন। ইহা এসিয়াটিক সোসাইটীর এক প্রকোষ্ঠে রক্ষিত হইয়াছে। তিনি স্বদেশে এই সম্মান লাভ করেন, কিন্তু ইউরোপের নানা স্থানের রাজকীয় সাহিত্য সমিতি হইতে অতি উচ্চ সম্মান ও প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি গ্রেটবৃটন, জার্ম্মানি, ফ্রান্স, রুসিয়া, ডেনমার্ক প্রভৃতি নানা বিদ্বৎ-সমিতির মাননীয় সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন; এবং তাঁহার সুনাম ও সুযশ নানা দেশে প্রচারিত হইয়াছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে হার ও সুবর্ণময় ঘটিকাযন্ত্র ও রুসিয়ার সম্রাট্ তাঁহাকে সুবর্ণ পদক উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। ডেনমার্কের রাজা সপ্তম ফ্রেডারিক তাঁহাকে একটী সুন্দর কারুকার্য্য সমন্বিত হার ও সুবর্ণ পদক দিয়াছিলেন। ইঁহার প্রতিকৃতিতে সেই হার ও পদক শোভা পাইতেছে।

স্কুলবুক সোসাইটী (School Book Society) প্রতিষ্ঠিত হইলে হেয়ার সাহেবের সহযোগিতায় তিনি বিদ্যালয় পাঠ্য সমিতির সভ্য হইয়া বালকদিগের পাঠ্যপুস্তকের অভাব মোচন করেন। ১৮২৩ খৃঃ তিনি নীতিকথা, বর্ণপরিচয় ও প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী Spelling book or Reader প্রণয়ন করেন। ইংলণ্ডের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী তাঁহার

পুস্তকগুলির অতিশয় প্রশংসা করিয়াছিলেন। যথার্থই তিনি এই সকল পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বালকগণের শিক্ষার পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন। নচেৎ এরূপ শিক্ষাবিস্তার হইত কি না সন্দেহ।

রামমোহন রায় যখন ধর্ম্মান্দোলন করিয়া দেশমধ্যে ভিন্নমত উপস্থিত করেন, তখন কলিকাতার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ইঁহাকেই তাঁহাদের প্রতিপালক ও সনাতন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষকরূপে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনিও সেই কার্য্যে দেহ মন নিয়োগ করিয়া রাজোচিত কার্য্য করিয়াছিলেন। তখন তিনিই হিন্দুধর্ম্মের অধিপতি। বিদ্যা, বুদ্ধি, সহায়, বল, বিক্রম প্রভৃতি গুণভূষিত রাধাকান্তই তখন দেশের সকলকার আশা ও ভরসা স্থল ছিলেন। ১৮২৬ খৃঃ অব্দ হইতে তিনি সহরে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষকরূপে অগ্রণী হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহার ভয়ে বিপক্ষদল ভীত থাকিত। যে অনুষ্ঠানকে তিনি শাস্ত্র বিরুদ্ধ ও সদাচার বিগর্হিত বলিয়া মনে করিতেন, তিনি কখনই তাহার পোষকতা করিতেন না। যে নূতন প্রথাপদ্ধতি তাঁহার বিচারে হিন্দু-সমাজের অনিষ্টকর ও দূষণীয় বলিয়া প্রতীত হইত, তিনি তৎপ্রবর্ত্তনপথে বাধা দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতেন। সেই কারণে তিনি বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের প্রচলিত বিধবা বিবাহের প্রতিবাদী ছিলেন। তিনি ধর্ম্মান্ধ হিন্দুর ন্যায় অনিষ্টকর প্রথার অনুষ্ঠানে বা পরিচালনে উৎসুক ছিলেন না। তিনি স্বাধীনতা ও সাহসে আত্মনির্ভর করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না; এবং রাজনীতি সংক্রান্ত দেশ হিতকর কার্য্যে তিনি কখনও পরাঙ্মুখ হইতেন না। সমস্ত রাজ-নীতি ঘটিত সমিতিতে তিনিই অধ্যক্ষতা করিতেন। তাঁহার কর্ম্ম-দক্ষতা, রাজনীতিজ্ঞতা, দেশহিতৈষিতা ও অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় "জাষ্টিস অফ্ দি পিস" বা অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে অভিষিক্ত করেন।

সে সময়ে উহা বাঙ্গালীর পক্ষে বিশেষ গৌরবের পদ ছিল। পর বৎসর তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১৮৩৭ খৃঃ অব্দের ১৪ই জুলাই তারিখে রাজা বাহাদুর উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন, এবং ঐ উপাধির সঙ্গে তাঁহাকে রাজোচিত পরিচ্ছদ, রত্নহার, তরবারি ও বর্ম্ম প্রদান করেন। ১২৩৯ সালে তিনি গয়ায় গমন করেন। তথায় টিকারির রাজা তাঁহাকে উপহার প্রদান করেন। পথিমধ্যে মুরশিদাবাদের নবাব নাজিমের দরবার দেখিয়া যান! নবাব তাঁহার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে বিশেষ অভ্যর্থনা করেন এবং অনেক মূল্যবান্ উপহার প্রদান করেন।

এদেশের শিল্প ও কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য যে রাজকীয় সমাজ আছে, রাধাকান্ত দেব তাহার সহকারী সভাপতি ছিলেন। লাখরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আইন হইলে প্রায় দশ সহস্র ব্যক্তি সমবেত হইয়া একটী সভা করিয়া উহার প্রতিবাদ করেন। উক্ত সভায় তিনি প্রধান উদ্যোক্তা ও সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে মহারাণী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া ভারতশাসন ভার গ্রহণ করিলে, ইনি শোভাবাজার রাজবাটীতে একটি সম্মিলনী আহুত করেন। এই সভায় বড়লাট প্রমুখ ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ এবং দেশের গণ্যমান্য সকলেই উপস্থিত ছিলেন। এরূপ বৃহৎ সভানুষ্ঠান এদেশে আর কখনও হয় নাই। সিপাহি-বিদ্রোহ দমনের পর শান্তি স্থাপনের স্মরণার্থে ১৮৬০ খৃঃ অব্দে তিনি আর একটী সম্মিলনী আহূত করেন। ১৮৬১ খৃঃ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন স্থাপিত হইলে ইনি সেই সময় হইতে শেষ জীবন পর্য্যন্ত ইহার সভাপতিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শেষ জীবন।

রাধাকান্তদেব ধর্ম্মকর্ম্ম দ্বারা শেষ জীবন অতিবাহিত করিবার মানসে ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করেন। ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে ইনি কে, সি, এস, আই (K. C. S. I.) উপাধি প্রাপ্ত হন। এই উচ্চতর সম্মান বাঙ্গালীর মধ্যে ইনিই প্রথম লাভ করেন। এই উপাধি লইবার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইলে, তিনি কলিকাতায় আসিতে অসম্মত হওয়ায়, তখনকার লাটসাহেব স্যার জন লরেন্স আগ্রাসহরে (Special) দরবার করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ বিধান দেন যে অগ্রবন (আগ্রা) বৃন্দাবনের অন্তর্গত। সুতরাং সেখানে যাইবার কোন আপত্তি নাই। তখন রাধাকান্ত দেব আগ্রার দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে ১৬ই নভেম্বর এই দরবার হয়। রাধাকান্ত দরবার মণ্ডপে প্রবেশ করিলে লাটসাহেব ও দেশীয় রাজন্যবর্গ ও অন্যান্য সমস্ত উপস্থিত নিমন্ত্রিত সভ্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া ইঁহার অভ্যর্থনা করেন। রাধাকান্ত দেব তৎকালীন হিন্দু সমাজের অগ্রণী ছিলেন বলিয়া কি ইংরাজগণ, কি দেশীয়গণ, সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। বৃন্দাবনে ইংরাজগণের বানর ও ময়ূরাদি পক্ষী শিকার করার প্রথা রাধাকান্তদেবের চেষ্টায় আইন কর্ত্তৃক বন্ধ হইয়া যায়। বৃন্দাবনে তাঁহার শেষ জীবন ধর্ম্ম ও পুণ্য কর্ম্মে অতিবাহিত হয়। তথায় তাঁহার নাম ও সুযশ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল; এবং সকলেই জানিতেন যে রাধাকান্ত-দেব একজন উদারচেতা ও আদর্শ হিন্দু।

মৃত্যু।

ইঁহার জীবন যেরূপ গৌরবান্বিত মৃত্যুও তদ্রূপ আশ্চর্য্যজনক। জানিনা কোন্ পুণ্যফলে তিনি তাঁহার মৃত্যুর দিন অবগত হইয়াছিলেন।

মৃত্যুর দুই তিন দিন পূর্ব্বে, মাত্র তাঁহার সামান্য সর্দ্দি হইয়াছিল। মৃত্যুর দিন প্রাতে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করিয়া তাঁহার প্রিয় ভৃত্যকে বলিলেন—"নবীন আজ আমার শেষ দিন। আমার দাহ সম্বন্ধে তোমাকে যেরূপ উপদেশ দিব তুমি সেই মত কার্য্য করিবে। একথা পূর্ব্বে আমার পুরোহিত মহাশয়কেও বলিয়া রাখিয়াছি। অদ্য আবার তোমায় বলিয়া রাখিতেছি, মন দিয়া শ্রবণ কর। দেহ হইতে আমার প্রাণবায়ু বহির্গত হইলে, এই দেহকে যমুনা সলিলে স্নান করাইয়া নববস্ত্র পরিধান করাইবে। তৎপরে সুগন্ধিদ্রব্য লেপিত করিয়া মধুর হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে যমুনা পুলিন প্রদেশে লইয়া যাইবে। শুষ্ক তুলসী বৃক্ষ আমি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। সেই তুলসী বৃক্ষ ও চন্দন কাষ্ঠের চিতা সজ্জিত করিবে। আমি যেরূপ ভাবে উপবিষ্ট আছি এইরূপ ভাবে আমার দেহ তদুপরি উপবেশন করিয়া উপরে একটী চন্দ্রাতপ দিবে। তৎপরে চিতায় অগ্নি প্রদান করিয়া দেহকে ভস্মীভূত করিবে। যখন ভস্মাবশিষ্ট দেহ অনুমান একসের আন্দাজ থাকিবে, তখন উহা তিন খণ্ড করিয়া এক ভাগ যমুনায় কচ্ছপদিগকে দিবে, দ্বিতীয় ভাগ যমুনায় নিক্ষেপ করিবে, তৃতীয় ভাগ বৃন্দাবনের মৃত্তিকায় গভীর করিয়া প্রোথিত করিবে।" ভৃত্যকে এই কথা বলিয়া, তৎপরে বন্ধুবান্ধবগণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া বাটীর প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিলেন। তুলসী তলায় বৃন্দাবনের পবিত্র রজে শয্যা প্রস্তুত করিয়া শয়ন করিলেন। মস্তকের নিকট শালগ্রাম ও তুলসী বৃক্ষ রাখিয়া একান্ত মনে দুই ঘণ্টাকাল মালা জপ করিতে লাগিলেন। সেই সময় তাঁহাকে ডাকিতে বা কথা বার্ত্তা কহিতে নিষেধ করিয়া ছিলেন। এইরূপে মালা জপ করিতে করিতে অপরাহ্ন দুই ঘটিকার সময় তাঁহার পবিত্র আত্মা নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মায় মিলিত হইল। ভারতের একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র অদৃশ্য হইল। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে ১৯শে এপ্রেল শুক্রবার এই পুরুষ-সিংহ রাধাকান্ত দেব পুত্র পৌত্র

আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি এবং সমগ্র বঙ্গদেশকে গভীর শোক সাগরে নিমগ্ন করিয়া ৮০ বৎসর বয়সে কোন্ অলক্ষ্য পররাজ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

তাঁহার মৃত্যু সংবাদ প্রত্যেক বঙ্গবাসীর পক্ষে সাধারণ শোকাবহ ঘটনারূপে পরিগণিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশার্থ উক্ত খৃঃ অব্দে ১৪ই মে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন গৃহে একটী সভা হয়। সেই সভায় দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এরূপ বিরাট সভা আর কখনও হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সর লরেন্স পিল এই সভায় বলিয়া ছিলেন—"রাধাকান্ত দেব ভদ্রতা ও বিনয়ের অবতার, তাঁহার চরিত্র ও আচার ব্যবহার আমাদের প্রত্যেকের অনুকরণ করা উচিত।" তাঁহার গভীর বিদ্যা, নানা বষয়িনী শিক্ষা, দেশের কল্যাণে অসাধারণ পরিশ্রম, তাঁহার সুশীল ও মনোজ্ঞ স্বভাব এবং পবিত্র ধর্ম্মভাবের বিষয় সম্বন্ধে অনেকে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ইনি তিন পুত্র রাখিয়া যান—মহেন্দ্র নারায়ণ, রাজেন্দ্র নারায়ণ, ও দেবেন্দ্র নারায়ণ। এই তিন পুত্র হইতে শোভাবাজার রাজ বাটীর বহু পরিবার বর্দ্ধিত হইয়াছে।





ভাগ্যবান্ মতিলাল শীল।

ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন, সহমরণপ্রথা নিবারণ প্রভৃতি ভীষণ সামাজিক আন্দোলনে যখন বঙ্গদেশে নবযুগের সৃষ্টি হইতেছিল, যখন ধর্ম্মান্দোলনে সমগ্র বঙ্গভূমি প্রকম্পিত হইতেছিল, তখন সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে নানা আন্দোলনের রঙ্গভূমিতে এই ভাগ্যবান্ মহানুভব জন্ম গ্রহণ করেন। ইতি পূর্ব্বে যে সকল প্রতিভাশালী ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ এই বঙ্গভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, মতিলাল শীল তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। ইনি জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া নম্রতা, শিষ্টতা, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও উদ্যম প্রভৃতির গুণে, যেরূপে লক্ষ্মীমন্ত হইয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। পরার্থপরতা, লোক হিতৈষিতা ও স্বদেশের কল্যাণের নিমিত্ত তিনি যে সমস্ত সদনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারা চিরদিন তাঁহার মহত্ত্বকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। তাঁহার গুণাবলী বনজাত কুসুমের ন্যায় তৎকালে গৃহে গৃহে কীর্ত্তিত হইত।

জন্ম বিবরণ।

মতিলাল শীল ১৭৯১ খৃঃ অব্দে কলিকাতার কলুটোলা নামক স্থানে সুবর্ণ বণিক কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন। ইহাঁর পিতার নাম চৈতন্য চরণ শীল। তাঁহার চিনেবাজারে একখানি কাপড়ের সামান্য দোকান ছিল। মতিলালের পিতৃপিতামহাদির



ভাগ্যবান্ মতিলাল শীল (১৬১ পৃঃ)

অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। অবস্থা ভাল না হইলেও ইহাঁদের বংশ অতি উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত ছিল। চৈতন্যচরণ শীল অতি সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। একবার তিনি কলিকাতার বিখ্যাত ডাকাত মোহন চাঁদের বিরুদ্ধে বিচার কালে স্পষ্টরূপে সাক্ষ্য দেওয়ায় গভর্ণমেণ্ট ও জন সাধারণের নিকট হইতে প্রভূত সম্মান ও ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পঞ্চম বর্ষ বয়সের সময় মতিলাল গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় প্রবিষ্ট হইলেন। ইহার কিয়দ্দিবস পরে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। বাল্যকালে তিনি পিতৃহীন হইয়া কোন রকমে পাঠশালার বিদ্যা শেষ করিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষর ঠিক ছাপার মত হইয়াছিল। তিনি শুভঙ্করের অঙ্ক প্রণালী এমন উত্তমরূপে শিখিয়াছিলেন যে, সকলেই তাঁহার মৌখিক অঙ্ক কষা দেখিয়া চমৎকৃত হইত। তৎপরে মার্টিন বাউল (Martin Bowle) নামক একজন সাহেব আমড়া তলায় এক বিদ্যালয় স্থাপন করিলে, বালক মতিলাল সেই স্কুলে শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন। সে সময়ে বিদ্যালয়ে অতি অল্প শিক্ষা দেওয়া হইত। সামান্য দুই চারিখানি মাত্র ইংরাজী পুস্তক শেষ পাঠ্য পুস্তক রূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। তৎকালে সেই পর্য্যন্ত ইংরাজী শিখিলেই যথেষ্ট হইত। সুতরাং ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা ঐ পর্য্যন্তই হইয়াছিল। শেষে ব্যবসায় ক্ষেত্রে সদা সর্ব্বদা ইংরাজগণের সহিত কথা বার্ত্তা কহিয়া পাশ্চাত্য বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি কলাবিদ্যা ও সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি স্বরের বিস্তার করিতে পারিতেন।

মতিলাল সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন বলিয়া অনেক সময়ে সখের যাত্রাদলে ও কবির লড়াইয়ে অভিনয় করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইতেন। ক্রমে তৎকালীন নানা কুসংসর্গের প্রলোভনে তিনি পতিত হইলেন। মন্দ সঙ্গীদের সংস্রবে তিনি ক্রমশঃ অলস ও অমিতব্যয়ী হইয়া উঠিলেন, এবং অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার পিতৃ সঞ্চিত অর্থ নানা অকার্য্যে নষ্ট করি-

ফেলিলেন। যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল ও অপরিণাম-দশিতার ফলে তাঁহাকে সেই সময়ে অর্থাভাব জনিত কষ্টের চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হইতে হইয়াছিল।

বিবাহ।

তৎকাল প্রচলিত প্রথানুসারে মতিলালের সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ১২১৫ সালে কলিকাতার সুরতির বাগান নিবাসী মোহনচাঁদ দের একটী অল্প বয়স্কা কন্যার সহিত বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। মোহন চাঁদ জামাতার বৃথা শিক্ষাভিমান ও অবিনীত স্বেচ্ছাচারিতা দর্শনে চিন্তিত হইলেন। ক্রমে তাঁহার চরিত্র দর্শন করিয়া দিন দিন জীবনে হতাশ ও লক্ষ্য-শূন্য হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি তাঁহাকে আপনার কর্ম্মস্থান যুক্ত প্রদেশে লইয়া যাইবার মনস্থ করিলেন। সেই সময়ে লৌহবর্ত্মের সৃষ্টি হয় নাই, সুতরাং কোন দূর দেশে বা তীর্থস্থানে গমন করিতে হইলে নৌকা করিয়া যাইতে হইত। ১২১৯ সালে মোহন চাঁদ জামাতা মতিলালকে সমভিব্যাহারে লইয়া কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন ও জয়পুর প্রভৃতি নানা তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়া শেষে নিজ কর্ম্মস্থানে উপনীত হইলেন। তখন পর্য্যন্ত জামাতার চরিত্র পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কিছুই পরিলক্ষিত হয় নাই। মতিলাল জীবনের ২৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এইরূপ অলস ও নিরুৎসাহ অবস্থায় যাপন করিতে লাগিলেন। শেষে শ্বশুর মহাশয়ের কর্ম্মস্থানে তাঁহার জীবনের সমস্ত ভাবের বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল। যেন তাঁহার বিলাসাচ্ছন্ন অজ্ঞানের মোহ দূরীভূত হইল। তিনি অবিলম্বে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া ১২২২ সালে (১৮১৫ খৃঃ) বিষয় কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। এই সময় হইতে যেন তাঁহার জীবনে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল।

কর্ম্ম জীবন।

কলিকাতায় যে দুর্গ আছে তথায় সৈন্যদিগের মাল সরবরাহ করিবার নিমিত্ত মিলিটারি অফিসারের নিকট মতিলাল এক কর্ম্ম পাইলেন। এইরূপ সরবরাহ কার্য্য দুই বৎসর পর্য্যন্ত করিয়া তিনি শেষে বালিখালে একটী কাষ্টম দারোগার পদ প্রাপ্ত হইলেন। এই কার্য্য তিনি অল্প দিন করিয়াছিলেন। কারণ এই সময়ে কমললোচন মল্লিক নামে তাঁহার এক জ্ঞাতি ভগিনীপতির মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে কমললোচন তাঁহার পত্নী ও দুইটী নাবালক সন্তানের ভার মতিলালের হস্তে অর্পণ করিয়া যান। তাঁহাদের জমিদারী দেখাশুনা করিবার জন্য মতিলাল দারোগার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। মতিলাল তাঁহার ভগিনীর অনুমতি লইয়া জমিদারীর অর্থে নিজ দায়িত্বে একটী ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ তাঁহার ইহাতে লোকসান হইল। এই অবস্থান্তর সময়ে গূঢ় দৈববিধানবলে এবং ঘটনাচক্রে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও যুবক মতি-লাল ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও উদ্যমের সহিত পুনরায় অন্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। ১২২৬ সালে (১৮১৯ খৃঃ) তিনি বোতল ও কর্কের ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। এক সময় তিনি অনেকগুলি খালি বোতল ও শিশি সুলভ মূল্যে ক্রয় করিলেন। কিছু দিন পরে বাজারে বোতলের বিশেষ অভাব অনুভূত হইল। ছোলা দ্বারা কৃষ্ণপান্তি যেমন অসঙ্গত লাভ করিয়াছিলেন, মতিলালও তদ্রূপ মহার্ঘ বাজারে বোতল বিক্রয় করিয়া বিলক্ষণ লাভ করিলেন। ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, তিনি সামান্য ব্যবসাকেও ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন না। এই বোতল বিক্রয়লব্ধ লাভই তাঁহার উৎসাহ ও উন্নতির মূল হইয়াছিল।

মতিলাল উক্ত অর্থ দ্বারা তাঁহার জ্ঞাতি ভগিনীর সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া অবশিষ্ট অর্থদ্বারা ১৮২০ খৃঃ অব্দে তৎকালীন বিখ্যাত বণিক মিঃ স্মিথসনের বেনিয়ান নিযুক্ত হইলেন। অল্প দিনের মধ্যে তিনি সাধুতা

ও প্রতিভাবলে সাহেবের অতিশয় প্রীতিভাজন হইলেন। ক্রমে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানির ভারতবর্ষ ও চীন দেশীয় বাণিজ্য জাহাজের কাপ্তেন সাহেবদের মুচ্ছুদি হন। তাঁহাদের জাহাজে যে সকল দ্রব্য আসিত তাহা বিক্রয় করিয়া দিতেন, এবং এতদ্দেশীয় বিবিধ দ্রব্য সাহেবদের ক্রয় করিয়াও দিতেন। ইহাতে তাঁহার বিলক্ষণ লাভ হইত এবং সম্মানও যথেষ্ট ছিল। ক্রমাগত নয় বৎসর কাল তিনি এই লাভ-জনক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি যে সকল দ্রব্য সরবরাহ করিতেন তন্মধ্যে গো-চর্ম্মেরও অর্ডার পাইতেন। এই কর্ম্মটী এবং ইহার আদান প্রদানে যে লভ্য হইত, তাহা তিনি নিজে গ্রহণ না করিয়া তাঁহার এক সরকারকে দিয়াছিলেন। সরকার এই কার্য্য দ্বারা দুই লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

ব্যবসায় ও বাণিজ্যের উন্নতিসাধনকল্পে তিনি প্রাণপণে খাটিতে লাগিলেন। মতিলাল স্বীয় প্রতিভাবলে অতি অল্পকাল মধ্যে কতক-গুলি ইংরাজ-বণিকের দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। তাঁহারা মতিলালকে তাঁহাদের বেনিয়ান নিযুক্ত করিলেন। ১৮২৮ খৃঃ অব্দে (১২৩৫ সালে) তিনি ৮টী হৌসের অধ্যক্ষ হইলেন। (1) Messrs. Leach, Kettlewell; (2) Livingstone, Syreres & Co.; (3) Mc Leod, Fagan & Co.; (4) Chapman & Co.; (5) Tulloh & Co.; (6) Ralli, Mavrojani; (7) Oswald, Seal & Co.; (8) Kelsall & Co.

মুরহিকি এণ্ড কোম্পানির অধীনে তিনি একটী নীলের আড়ত খুলিয়াছিলেন। এই সময় তিনি পরিশ্রমজনক এত অধিক কার্য্যে আসক্ত হইয়াছিলেন এবং তাহা এমন সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ করিতেন যে শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি প্রতিদিন এতগুলি অফিসে উপস্থিত হইয়া আয় ব্যয়ের হিসাব পরিষ্কার করিতেন।

মতিলাল দেশীয় পণ্যসমূহ, বিশেষতঃ চাউল, চিনি ও নীল এই তিনটী জিনিষের পক্ষে বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তাঁহার বিচক্ষণতায় মুগ্ধ হইয়া মেসার্স টমাস এণ্ড কোং, তাঁহাকে তাঁহাদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এক সময়ে তাঁহার পণ্য পরীক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞতা দেখিবার জন্য জনৈক ইংরাজ বণিক তাঁহার চক্ষু বাঁধিয়া নীল পরীক্ষা করিতে দিয়াছিলেন। প্রখর প্রতিভাপ্রভাসিত লব্ধপ্রতিষ্ঠ মতিলাল সেই অবস্থায় থাকিয়া কেবল হস্ত দ্বারা নীলের বিশেষত্ব উপলব্ধি করিয়া যথাযথ মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার ব্যবসায়ের দূরদর্শিতা ও পণ্য দ্রব্যের বিচক্ষণতায় মুগ্ধ হইয়া সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। চাউল ও চিনি ইত্যাদি বিষয়েও এই প্রকার পরীক্ষা করিতে পারিতেন। ব্যবসায়ে তাঁহার গভীর চিন্তাশীলতা ও অন্তর্দৃষ্টি এরূপ প্রখর ছিল যে বড় বড় কুঠীয়াল সাহেবেরাও তাঁহার পরামর্শ লইয়া বিষয় কার্য্য করিতেন।

বাণিজ্য জগতে উচ্চ স্থান লাভ করিবার জন্য তিনি বেনিয়ানের কার্য্য ব্যতীত অন্য নানাবিধ ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। তিনি অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে পারিতেন। কখন অলসভাবে বসিয়া থাকিতেন না। তিনি ছাপরায় সোরা, গাজীপুরের চিনি, রামপুর বোয়ালিয়ায় রেশম এবং অন্যান্য জিলার নানারকমের মাল সস্তায় খরিদ করিয়া বাজার দর অনুযায়ী বিক্রয় করিয়া লভ্যবান্ হইতেন। ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে পশ্চিম ভারতে চিনির মূল্য প্রতি টন ৩২ শিলিং হইতে ২৪ শিলিঙ্ কমিয়া গেল। মতিলাল সেই সময় পাটনা ও গাজীপুরে ৯৲ টাকা মণ হিসাবে ১২ লক্ষ টাকায় কাশীর চিনি ক্রয় করিলেন। খরচ খরচা বাদে তিনি প্রতি মণ ৩৲ টাকা লাভে বিক্রয় করিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রায় চারি লক্ষ টাকা লাভ হইল। এতদ্ব্যতীত তিনি বিলাতি মালের আমদানী ও দেশীয় পণ্য দ্রব্যের রপ্তানির কার্য্যও করিতেন। বিলাত হইতে তিনি

কাপড় ও লৌহ প্রচুর পরিমাণে আমদানি করিতেন। তাঁহার প্রতিভা ও বিচক্ষণতা গুণে তিনি যে ব্যবসায় হস্তক্ষেপ করিতেন অদৃষ্ট গুণে তাহাই সুবর্ণে পরিণত হইত। এই জন্য সেই সময়ে সকলেই তাঁহাকে ধনকুবের বলিত। তিনি টাকা কখনও বসাইয়া রাখিতেন না, উপার্জ্জিত ধনরাশি সর্ব্বদাই ব্যবসায়ে খাটাইতেন। তিনি ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখা কিম্বা কোম্পানির কাগজ ক্রয় করা ভাল বাসিতেন না।

মতিলাল ক্রমে বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিলেন। স্মিথসন্ সাহেবের গঙ্গাতীরবর্ত্তী ময়দার কল ক্রয় করিলেন। এই কল তৎকালে অতি অদ্ভূত পদার্থ ছিল। কারণ ইহা বাষ্পীয়বলে পরিচালিত হইত। ধনাগমের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অর্থ উপার্জ্জনের ইচ্ছাও বাড়িয়া গেল। যখন তাঁহার চতুর্দ্দিক হইতে অজস্র অর্থ আসিতে লাগিল, তখন তিনি সহরের নানা স্থানে অনেক জমী ক্রয় করিলেন। তদুপরি বিস্তর ভাড়াটীয়া বাটী প্রস্তুত করিলেন। এইরূপে মতিলালের অর্থ-সৌভাগ্য যখন চরম সীমায় উপনীত, তখন কতকগুলি জমীদার তাঁহাদের জমিদারী মতিলালের নিকট বন্ধক রাখিলেন। এই বন্ধকতাসূত্রে তিনি মণ্ডলঘাট, মহিষাদল ও অন্যান্য কতকগুলি বড় বড় ষ্টেটের স্বত্বাধিকারী হইলেন। এই ঋণ দান হইতেই তাঁহার ভূম্যধিকারের সূত্রপাত হয়। যাঁহারা ঋণগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই অর্থ দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া ভূসম্পত্তি বিনিময় করিয়াছিলেন। ক্রমে তিনি সহর ও মফঃস্বলে বহুতর সম্পত্তি ক্রয় করিতে লাগিলেন। ডাক্তার জ্যাকসনের নিকট হইতে ধর্ম্মতলার বাজার ক্রয় করিয়াছিলেন। এই বাজার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

ইহার পর তিনি ছোট বড় বার তেরখানি জাহাজ প্রস্তুত করাইয়া বাঙ্গালী নামের কলঙ্ক দূর করিয়াছিলেন। জাহাজগুলির মধ্যে একখানি তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা রাজরাণীর নামে বিখ্যাত ছিল। এই সকল জাহাজ

ইউরোপ ও চীন দেশে বাণিজ্যহেতু প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি ইহা হইতে প্রভূত উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে ইহাদের অধিকাংশগুলি নষ্ট হইয়া যায়। প্রবল উদ্যম ও অধ্যবসায়ের বলে মতিলাল সেই সময়ে একজন প্রখ্যাতনামা জমীদার ও বঙ্গের প্রধান বণিক বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিলেন।

দানশীলতা।

মতিলাল শীলের অন্তঃকরণে সর্ব্বদা পরোপকার ও পরদুঃখ মোচনেচ্ছা প্রবল ছিল। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন দেশীয় সমাজের কল্যাণকর প্রায় প্রত্যেক সদনুষ্ঠানেই আন্তরিক আগ্রহ সহকারে যোগ দিতেন। অনেক সভায় তিনি সারগর্ভ বক্তৃতাও করিতেন। দেশের যথার্থ মঙ্গল সাধনোদ্দেশে তিনি অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন। ১৮২৯ খৃঃ অব্দে সতীদাহ প্রথা রহিত হইলে "ধর্ম্মসভা" যখন মহাত্মা রামমোহনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া লর্ড বেন্টিঙ্ক বাহাদুরের নিকট আবেদন করিয়া বিফল হন, তখন মতিলাল শীল ধর্ম্মসভায় উপস্থিত হইয়া একটী সুদীর্ঘ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। তাহার সার মর্ম্ম এই—"হে সভ্যগণ! আপনারা বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া যাহাতে ধর্ম্মসভা নামের সার্থকতা হয় তাহাই করুন। যাহাতে সভার ব্যয় হইতে দেশের অনাথ ও অক্ষমদিগের ভরণ পোষণ হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হউন।" ইত্যাদি ভাবে অনেক কথা বলিয়া শেষে সভা হইতে চাঁদা তুলিয়া এবং নিজে যথেষ্ঠ দান করিয়া অনাথ দিগের অন্ন বস্ত্রের অভাব মোচন করিতে লাগিলেন। আত্ম ভরণ পোষণে অসমর্থ শত শত লোক মতিলালের দয়া ও দাতব্যগুণে গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে লাগিলেন, কিন্তু কালক্রমে অন্যান্য দাতারা দান বন্ধ করিলেও তিনি একা ঐ ব্যয়ভার বহন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ধর্ম্মসভা উঠিয়া গেল, কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পরদুঃখ কাতর মতিলালের দানশীল হস্ত পূর্ব্ববৎ উন্মুক্তই রহিল। এই ব্যাপারে

১৮৪৭ খৃঃ অব্দে তিনি আপনার বিষয় হইতে এমন সুবন্দোবস্ত ও নিয়ম করিয়া দেন যে, তদ্বারা কলিকাতাবাসী অনেক দরিদ্র লোক অদ্যাবধি প্রতিপালিত হইতেছে।

ইহার পর মহানুভব মতিলালের হৃদয়ে একটী মহৎ কার্য্য করিবার ইচ্ছা প্রধূমিত হইল। তিনি দেখিলেন যে জগতে অন্নদান ও বিদ্যাদানের তুল্য এমন পুণ্যকার্য্য আর নাই। তখন তাঁহার মনে একটী অতিথি-শালা করিবার ইচ্ছা হইল। তাঁহার কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইল। কলিকাতার উত্তরে বেলঘরিয়া নামক স্থানে বারাকপুর রোডের উপর ১৮৪১ খৃঃ অব্দে একটী অতিথিশালা স্থাপন করিলেন। এই স্থানে প্রতিদিন প্রায় সহস্র ক্ষুধার্ত্ত অতিথিকে অন্নদান করিতেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর অদ্যাবধি ঐ স্থানে প্রায় চারি পাঁচ শত বুভুক্ষুর জঠরাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া থাকে। এই অতিথিশালা তাঁহার দয়া ও দানশীলতার কীর্ত্তিস্তম্ভ। আহা! যিনি ক্ষুৎ পিপাসা কাতর পরিশ্রান্ত দরিদ্র পথিকের বিষণ্ণ বদনের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন, তিনিই মহাত্মা! তাঁহার জীবন ও অর্থোপার্জ্জন সার্থক! ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে মতিলাল এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময়ে এদেশে বহুসংখ্য বিদ্যালয় ছিল না। সামান্য দুই চারিটি যাহা ছিল, তাহাতে অনেক দূর হইতে বালকগণকে পড়িতে আসিতে হইত। তদুপরি অনেকের বিশ্বাস ছিল যে সাহেবদের স্কুলে বাইবেল শিক্ষা দেওয়া হয়, তখন একটীও হিন্দুর স্কুল ছিল না। সেই অভাব দূর করিবার নিমিত্ত, এবং তিনি নিজে বিশিষ্ট শিক্ষিত ছিলেন না বলিয়া, যাহাতে নিজের দেশের বালকগণ উত্তমরূপে বিদ্যালাভ করিতে পারে, তজ্জন্যই তিনি পটলডাঙ্গায় শীলস কলেজ নাম দিয়া এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে ছাত্রগণের নিকট হইতে একটাকা করিয়া বেতন লইতেন। বেতন লইবার কারণ—সে সময়ে দেশের লোকের

এমনি কুসংস্কার ছিল, যে, বিনা বেতনে বিদ্যাশিক্ষা করা অপমানের বিষয় মনে হইত। অধিকন্তু গুরুদক্ষিণা না দিলে তাহার বিদ্যাশিক্ষা নিষ্ফল। তজ্জন্য তিনি এক টাকা বেতন লইয়া ছাত্রগণকে পাঠ্যপুস্তক, কাগজ, কলম প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিয়া বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। পরে ঐ বিদ্যালয়ে বহুসংখ্য ছাত্র হইলে, তিনি ছাত্রদের বেতন ও কাগজ কলম প্রভৃতি রহিত করিয়া "শীলস্ ফ্রি কলেজ" নাম দিলেন। উহাকে চিরস্থায়ী করিবার নিমিত্ত তিনি বহু অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে উক্ত বিদ্যালয় হ্যালিডে ষ্ট্রীটে নব নির্ম্মিত অট্টালিকায় বিশেষ খ্যাতির সহিত পরিচালিত হইতেছে। এই বিদ্যামন্দির মতিলাল শীলের স্বদেশ-হিতৈষিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মতিলালের দানশীলতার মধ্যে আর একটী কার্য্য বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। মেডিকেল কলেজে হসপিটাল প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত তিনি অনেক মূল্যবান্ সম্পত্তি দান করেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহার এই অসামান্য দান-শীলতার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ উক্ত হাঁসপাতালে একটি বিভাগ খুলিয়া মতিলালের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক বালিকাগণের ও দুর্ভাগিনী বিধবাগণের নিমিত্ত একটী ফণ্ড খুলিয়া দেন। তিনি স্বয়ং তাহাদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অভাব মোচন করিতেন। কোন যাচক তাঁহার নিকট হইতে রিক্তহস্তে ফিরিয়া যায় নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হীরালালের বিবাহের সময়, যে সকল ঋণী ঋণের দায়ে কারারুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিয়া তাহাদিগকে কারামুক্ত করেন। কোন শত্রুও বিপদে পড়িয়া তাঁহার শরণাগত হইলে তাহাকে রক্ষা করিতে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। ১৮৫০ খৃঃ অব্দে গভর্ণমেণ্ট নিউ ষ্ট্রাণ্ড রোড নামক গঙ্গাতীরে রাস্তা খুলিবার সঙ্কল্প করেন। ইহাতে মতিলালের অনেক জমী ছিল। মতিলাল উক্ত জমী দান করিয়া উহার পরিবর্ত্তে একটী

স্নানের ঘাট প্রস্তুত করাইয়া লন। তাঁহার নামে গঙ্গার ঘাট চিরকাল তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। এক্ষণে প্রত্যহ শত শত লোক উক্ত ঘাটে গঙ্গাস্নান করিয়া পুণ্য অর্জন করিয়া থাকেন। সুতরাং সকলেই এই পুণ্যশ্লোক মতিলালের নাম উচ্চারণ করিয়া তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা দেখাইয়া থাকেন। এই ঘাট মতিলাল শীলের অবিনশ্বর কীর্ত্তি।

স্মিথসন্ হোল্ডস্ ওয়ার্থ নামক সাহেবের নিকট কর্ম্ম করিয়া মতিলালের অবস্থার উন্নতি হয়। তজ্জন্য সাহেবের মৃত্যু হইলে তদীয় পত্নীর দুঃস্থ সময়ে তিনি যত্ন ও অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। এমন কি মেম বিলাতে গমন করিলেও তিনি তথায় মাসিক বৃত্তি পাঠাইতেন। মতিলাল শীল যদিও বণিক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ব্যবহার অতি সৎ ছিল। তিনি এমনি সত্যবাদী ছিলেন যে, একবার মুখ হইতে যাহা বলিতেন তাহা শত চেষ্টাতেও কেহ তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিত না। জনৈক সাহেব বিপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট কিছু অর্থ ঋণ চাহিয়াছিলেন। তিনি সেই টাকা দিতে স্বীকৃত হইলে তাঁহার বন্ধু-বান্ধব অনেকেই নিষেধ করিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন, যাহা বলিয়া ফেলিয়াছি তাহার অন্যথা কিরূপে করিব। সাহেবকে টাকা ধার দিয়া অতি সামান্যই আদায় হইয়াছিল। সুপ্রিম কোর্টের কোন এটর্ণি বিপদে পড়িয়া মতিলালের নিকট ঋণ করিয়াছিলেন। তিনিও তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন নাই। এইরূপে তাঁহার কয়েক লক্ষ টাকা লোকসান হইয়াছিল।

এইরূপ সদনুষ্ঠান ও দানশীলতায় তাঁহার মহৎ জীবন অতিবাহিত হইত। ঢক্কানিনাদে আত্মশ্লাঘা না করিয়া তিনি নীরবে সাধ্যাতীত দান করিয়া দেশের সেবা করিতেন। তাঁহার চরিত্রে অনেক গুণ ছিল, যদ্দ্বারা তাঁহার অমরত্ব লাভ হইয়াছে। তিনি বঙ্গ-বিধবাগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া ব্যথিত হইয়া বলিয়াছিলেন, যিনি হিন্দু বিধবাকে বিবাহ করিবেন

তিনি তাঁহাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিবেন। ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যায়, তিনি বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলিতেন যে ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং তাঁহার সৃষ্ট জীবদিগকে ভালবাসাই ধর্ম্ম। যাহা হউক তিনি নানাপ্রকার সৎকর্ম্ম দ্বারা সাধারণের উপকার করিয়া নিজ নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি বণিক কুলের আভরণ স্বরূপ ছিলেন। তিনি কেবল নিজের বুদ্ধি, পরিশ্রম ও যত্ন দ্বারাই উন্নতির উচ্চ শিখরে অরোহন করিয়াছিলেন।

মৃত্যু।

১৮৫৪ খৃঃ ২০শে মে তাঁহার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হয়। একদিন হঠাৎ তাঁহার পেটের অসুখ করে, এবং তৎসঙ্গে জ্বরও দৃষ্ট হয়। এইরূপ অবস্থায় চল্লিশ ঘণ্টা কাল অসুস্থানুভব করায়, তিনি পুত্রদিগকে গঙ্গায় তাঁহার বাঁধাঘাটে তাঁহাকে লইয়া যাইতে বলিলেন। তিনি সেই ঘাটে আসিয়া একবার জন্ম শোধ তাঁহার ঘাট দেখিয়া লইলেন এবং মা ভাগীরথীর চরণে কোটী কোটী প্রণাম করিলেন। পরে মাতা বসুন্ধরার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। বঙ্গের কৃতিসন্তান মতিলাল সেই ঘাটে শয়ন করিয়া বেলা এক ঘটিকার সময়ে স্ত্রী পুত্র পৌত্রাদি আত্মীয় স্বজনদিগকে কাঁদাইয়া সমগ্র দেশবাসীকে গভীর শোক-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া মর্ত্যধাম পরিত্যাগ করিলেন। তিনি পঞ্চ পুত্র রত্ন ও পাঁচটী লক্ষ্মী স্বরূপিনী কন্যা রাখিয়া ১২৬১ সালের ৭ই জ্যৈষ্ঠ ৬৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার পুত্রগণ দানশীলতা ও স্বদেশ হিতৈষিতায় পিতৃ-পদানুসরণ করিয়া নিজ নিজ অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছেন।

মতিলাল দেখিতে নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব্ব মধ্যমাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার শরীর বেশ বলিষ্ঠ ও সুস্থ ছিল। তাঁহার প্রতিকৃতি দেখিলেই তাঁহাকে অতি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া প্রতীতি হয়। তাঁহার অহঙ্কার ও বাবুগিরি ছিল না। তিনি বিলাস ও বাবুগিরিকে

অতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তিনি সামান্য ধুতি, চাপকান ও হাতে বাঁধা চাদরের পাগড়ী মাত্র ব্যবহার করিতেন। তিনি বিলক্ষণ সদ্ব্যয়ী ছিলেন, এক কপর্দ্দকও অপব্যয় করিতেন না। পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা না করিয়া তিনি কোন কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতেন না। তাঁহার নম্রতা ও শিষ্টতার পার্শ্বে কিন্তু অটল স্বাধীন ভাব বিরাজ করিত। তাঁহার কাহাকেও ভয় ছিল না। তিনি এমনি স্পষ্টবাদী ছিলেন, যে সম্পর্ক বিরুদ্ধ যত বড় লোকই হউক না কেন, কাহাকেও উচিতকথা বলিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি তোষামোদ আদৌ ভালবাসিতেন না। একবার নিজ কাছারি বাড়ী গমন করিবার সময় তাঁহার স্কন্ধদেশ হইতে একখানি তোয়ালে পড়িয়া যায়। জনৈক ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী তাড়াতাড়ি উহা উঠাইয়া দিলে, তিনি বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—"আপনি ব্রাহ্মণ হইয়া এরূপ অন্যায় কার্য্য কেন করিলেন? চাকরি করিতে আসিয়াছেন বলিয়া কি আপনার সম্মান নাই। আপনি বর্ণশ্রেষ্ঠ, আপনাকে আর কি বলিব, ইহাতে আমি বড় অসন্তুষ্ট হইলাম।" এই জন্য তিনি চাকরি-জীবনকে বড়ই ঘৃণা করিতেন। তিনি স্পষ্টই বলিতেন,—"নিজের জীবন বিক্রয় করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়।" হায় মতিলাল! কবে তোমার মর্ম্মস্পর্শী ভবিষ্যদ্বাণী কার্য্যে পরিণত হইবে! কবে এ হতভাগ্য বঙ্গবাসী দাসত্ব পরিত্যাগ করিবে!





Queen Press, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। (১১৩ পৃঃ)



প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর।

রামমোহনের ধর্ম্মান্দোলনে প্রকম্পিত-বঙ্গদেশে নবযুগের স্থচনাক্ষেত্রে, স্বনামধন্য এই শক্তিশালী মহাত্মা অবতীর্ণ হন। ধর্ম্মসংস্কার, সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা বিস্তার, এমন কি রাজনীতিক ব্যাপার প্রবর্ত্তনের সেই প্রথম যুগে, দ্বারকানাথ অপূর্ব্ব প্রতিভা ও অতুলশক্তি লইয়া যেন মহাত্মা রামমোহনের নব ধর্ম্মে সাহায্য করিবার নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়াছিলেন। চরিত্র মহত্ত্বে ও নির্ভীক ধর্ম্মপক্ষ সমর্থনে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। ১২০১ সালে (১৭৯৭ খৃঃ অব্দে) ইঁহার জন্ম হয়। তিনি কান্যকুব্জাগত ভট্ট-নারায়ণের পুত্র নৃসিংহ কুশারীর বংশ সম্ভূত। ইঁহারা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু "ঠাকুর" নামে পরিচিত।

বংশ পরিচয়।

দ্বারকানাথের ঊর্দ্ধতন চতুর্থপুরুষ জয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়ে বঞ্চিত হইয়া, আদি নিবাস যশোহর হইতে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। দ্বারকানাথের পিতামহেরা পাঁচ সহোদর ছিলেন। তন্মধ্যে দর্পনারায়ণ ও নীলমণিই অধিক বিখ্যাত। এই নীলমণির পুত্র রামমণিই দ্বারকানাথের পিতা। নীলমণি জজ আদালতের সেরেস্তাদারী কর্ম্ম করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। নীলমণির তিন পুত্র—রামলোচন,

রামমণি ও রামবল্লভ। রামমণির দুই বিবাহ। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে দ্বারকানাথ ও রাধানাথ এবং দ্বিতীয়ার গর্ভে রমানাথের জন্ম হয়। রামলোচন নিঃসন্তান, তজ্জন্য তিনি দ্বারকানাথকে যথাশাস্ত্র পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। রমানাথ উত্তরকালে "মহারাজা" উপাধি পাইয়াছিলেন। ইঁহাদের বংশের সকলেই স্বনামধন্য, প্রতিভাশালী ও স্বদেশ-ভক্তিপরায়ণ। দর্পনারায়ণ পাথুরিয়াঘাটায় বাস করিতেন এবং নীলমণি যোড়াসাঁকোতে নূতন আবাস বাটী নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিতে আরম্ভ করেন। দর্প-নারায়ণের মধ্যমপুত্র গোপীমোহন ঠাকুর বহুভাষাবিৎ এবং দয়া, বিদ্যানু-রাগ, দানশীলতা প্রভৃতি বহুগুণে বিভূষিত ছিলেন। তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া মুলাযোড় গ্রামে গঙ্গাতীরে দ্বাদশটী শিবমন্দির ও ব্রহ্মময়ী দেবীমূর্ত্তি স্থাপিত করেন এবং অতিথিসেবার জন্য বহু মূল্যবান্ সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া যান। ইঁহার ছয় পুত্রের মধ্যে হরকুমার ও প্রসন্নকুমার দুই জনই সমাজে অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন। হরকুমারের পুত্র স্বর্গীয় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর; এবং স্বনামধন্য বদান্যবর প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সোপানের উপর সৌম্য-মূর্ত্তিতে চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া উপবিষ্ট আছেন। ইঁহার পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন বিলাত যাইয়া খৃষ্টান হওয়াতে তাঁহার সমস্ত বিষয় মহারাজ যতীন্দ্রমোহনকে দিয়া যান। ইঁহারা সকলেই হিন্দু কিন্তু "পীরালী" নামে খ্যাত।

বিদ্যা শিক্ষা।

দ্বারকানাথ প্রথমে পাঠশালায় বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়া পরে চিৎপুর অবস্থিত সের বোর্ণ (Sher borne) সাহেবের বিদ্যালয়ে প্রথমে ইংরাজী শিক্ষা করেন। তৎপরে রেভারেণ্ড মিঃ উইলিয়ম এড্যামসের নিকট ইংরাজী শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি উত্তমরূপে

সংস্কৃত শিখিয়া দর্শনশাস্ত্র পাঠ করেন। দার্শনিকগণের সহিত নিরন্তর তর্ক বিতর্ক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তাঁহার যথেষ্ট শাস্ত্রজ্ঞান হইয়াছিল। তৎপরে তাঁহার মন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মান্ধতা ও কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া মহাত্মা রামমোহন রায়কে বন্ধুরূপে প্রাপ্ত হইলেন, এবং তাঁহার সহিত একমত হইয়া ধর্ম্মকার্য্যে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

কর্ম্ম জীবন।

বাল্যকালেই দ্বারকানাথের পিতার মৃত্যু হয়। সুতরাং পৈতৃক বিষয়াদি পর্য্যবেক্ষণের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল। এই জমিদারী পরিচালনায় ইনি অল্প বয়সেই সবিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ইঁহাদের পাবনার অন্তর্গত বহরমপুর নামক একটী জমিদারী ছিল। এই জমিদারী ও রাজস্ব বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে করিতে তাঁহার আইন শিক্ষার অভিলাষ হয়। আইন শিক্ষার সময় মিঃ কটলার ফরগুসন নামক বিখ্যাত ব্যারিষ্টর সাহেবের দ্বারা তিনি অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন। প্রগাঢ় চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে তিনি দেওয়ানি ও ফৌজদারী উভয়-বিধ আইন শিক্ষা করিয়া প্রসিদ্ধ উকিল হইয়া উঠিলেন। অনেক গুরুতর মোকদ্দমা তাঁহার হাত দিয়া নিষ্পত্তি হইতে লাগিল। ক্রমে রাণী কাত্যায়নী, রাজা বরদাকান্ত রায় এবং অনেক খ্যাতনামা জমীদার তাঁহার মক্কেল হইলেন। এইরূপে তিনি বিখ্যাত ও প্রধান উকীল হওয়াতে এতদ্দেশীয় রাজা মহারাজা ও ইংরাজদিগের এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান প্রধান ভূম্যধিকারিগণের অত্যন্ত বিশ্বস্ত উকিল হইয়া উঠিলেন।

ব্যবহারজীবীর কর্ম্ম করিতে করিতে তিনি ২৪ পরগণার নিমকি কলেক্টারের অধীনে সেরেস্তাদারের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ছয় বৎসর কাল এই কার্য্য দক্ষতার সহিত পরিচালনা করায়, কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে নিমকির দেওয়ানের পদে উন্নীত করেন। তৎকালে নিমক মহলে

দেওয়ানী কার্য্য প্রাপ্ত হইলে লোকে দুই দিনে ধনী হইয়া উঠিত। এইরূপে সহরে অনেকে বিখ্যাত ব্যক্তি ধনী হইয়াছিলেন। দ্বারকানাথও দেওয়ান হইয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ক্রমে তিনি বোর্ড, কাষ্টম ও অহিফেন বিভাগের দেওয়ানী কর্ম্ম করেন। ইহার দ্বারা দ্বারকানাথ কয়েক বৎসরের মধ্যে ধনবান্ হইয়া উঠিলেন। তৎপরে নিজের কার্য্যবাহুল্যপ্রযুক্ত স্বেচ্ছায় তিনি বোর্ডের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে বোর্ডের সেক্রেটারী পার্কার সাহেব যারপর নাই দুঃখিত হইয়া তাঁহার কার্য্য নৈপুণ্যের যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়া দুই খানি পত্র লেখেন। ইহার পর দ্বারকানাথ ইউরোপীয় প্রণালীতে ব্যবসায় করিবার মনস্থ করিলেন। উইলিয়াম কার ও উইলিয়ম প্রিন্সেপ নামক দুই জন ইংরাজ অংশীদার লইয়া "কারঠাকুর" নামে এক অফিস খুলিলেন। তাঁহার অফিসের প্রতিপত্তি শীঘ্রই বাড়িয়া উঠিল। দ্বারকানাথ এই স্বাধীন সওদাগরী কার্য্যে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। এক জন দেশীয় লোকের দ্বারা পরিচালিত এইরূপ একটী অফিসের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া তৎকালীন গভর্ণর লর্ড বেন্টিক বাহাদুর তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিয়া এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। তৎকালে অনেকে হৌসের মুচ্ছুদ্দিগিরি কর্ম্ম করিতেন, কিন্তু এরূপ স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে কেহই সাহসী হন নাই। সুতরাং এক জন দেশীয় লোকের এরূপ অগ্রসরতা দর্শনে গভর্ণর বাহাদুর সন্তুষ্ট হইয়া পত্র দ্বারা তাঁহাকে উৎসাহিত করেন। যাহা হউক এ সৌভাগ্য এক জন বাঙ্গালীর পক্ষে সামান্য গৌরবের বিষয় নহে।

১৮৩৩ ইহার পর দ্বারকানাথ "ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক" নামক একটী ব্যাঙ্ক স্থাপিত করেন। এই ব্যাঙ্ক তিনি সতের বৎসর পর্য্যন্ত পরিচালনা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি নীল, রেশম ও চিনির কুঠি করিয়াছিলেন। রাণীগঞ্জে কয়লার ব্যবসা চালাইয়াছিলেন। এইরূপ তিনি নানাবিধ স্বাধীন

ব্যবসার দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি ওকালতি, স্বাধীন বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক, কুঠির কার্য্য ব্যতীত জমিদারী কার্য্যেও বিশেষ কৃতকার্য্য হন। পৈতৃক জমিদারী ব্যতীত তিনি নিজে অনেক জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। রাজসাহীর অন্তর্গত কালীগ্রাম, যশোহরের অন্তর্গত মহম্মদ সাহি, পাবনার সাহাজাদপুর, রঙ্গপুরের স্বরূপপুর, মণ্ডল-ঘাটার তের আনা অংশ, দ্বারবাসিনী, জগদীশপুর প্রভৃতি অনেক স্থানের বিষয় ক্রয় করেন।

বদান্যতা।

উপরোক্ত কার্য্য দ্বারা তিনি যেমন প্রভূত উপার্জ্জন করিয়াছিলেন তদ্রূপ তাঁহার দানশক্তিও অদ্ভুত ছিল। দয়া ও বদান্যতার কার্য্যে তাঁহার হস্ত সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত। সহৃদয়তা ও পরদুঃখ মোচনেচ্ছা প্রভৃতি সদ্‌গুণে তাঁহার সমকক্ষ লোক তৎকালে কলিকাতায় অতি বিরল ছিল। তিনি ২৪ পরগণার দাতব্য চিকিৎসালয়ে নিরাশ্রয় অন্ধগণের সাহায্য নিমিত্ত এক লক্ষ টাকা দান করেন। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ লেপার এসাইলেম যথায় কুষ্ঠরোগগ্রস্ত রোগিগণের চিকিৎসা অদ্যাবধি হইয়া থাকে, সেই হাঁসপাতালটী হৃদয়বান্ উচ্চমনা মহাত্মা দ্বারকানাথ ঠাকুরের অর্থে সংস্থাপিত। ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটী স্থাপন, মেডিকেল কলেজে হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ দেশহিতকর কার্য্যে তিনি অকাতরে সহস্র সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছিলেন। সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠানে এরূপ মুক্ত-হস্ত দাতা তৎকালে আর দেখা যায় নাই। তাঁহার সদাশয়তার প্রমাণস্বরূপ অনেক গল্প এদেশে প্রচলিত আছে।

এক জন জেলার জজ পীড়িত হইয়া বিলাত গমনেচ্ছু হইলেন কিন্তু তাঁহার এক লক্ষ টাকা ঋণ ছিল এবং ঋণ পরিশোধেরও কোন উপায় ছিল না। তখন সাহেব অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে দ্বারকানাথ ঠাকুরকে স্মরণ করিলেন। যদিচ তাঁহার সহিত সাহেবের কোন চাক্ষুষ

পরিচয় ছিল না, তথাপি তৎকালে সকলেই দ্বারকানাথকে লোকহিতৈষিতার জন্য উদার ও বদান্য বলিয়া জানিতেন। সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সাহেব নিজ দুঃখ জানাইয়া তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিলেন। দ্বারকানাথ অবিলম্বে সমস্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে উত্তমর্ণেরা তাঁহাকে কারাগারে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছে এবং পীড়িত অবস্থায় কারাগারে যাইলে পাছে সাহেবের মৃত্যু ঘটে, তজ্জন্য পরদুঃখকাতর দ্বারকানাথ তৎক্ষণাৎ উত্তমর্ণগণের প্রাপ্য এক লক্ষ টাকা পরিশোধ করিয়া দিলেন। সাহেব তদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া সাশ্রুনয়নে তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া একখানি অঙ্গীকার পত্র (Hand Note) লিখিয়া দিতে চাহিলেন। তখন দ্বারকানাথ বলিলেন পীড়িত অবস্থায় আপনার নিকট হইতে হ্যাণ্ড নোট লইয়া আর কি করিব? এই টাকা পুনরায় ফিরিয়া পাইব এ আশায় টাকা ধার দিই নাই। তবে যদি কখন আপনার অবস্থার উন্নতি হয়, তখন যদি পারেন, তাহা হইলে এই টাকা দিতে চেষ্টা করিবেন। সাহেব আনন্দাশ্রুপূর্ণনয়নে বলিয়াছিলেন, আপনি যেরূপ পরদুঃখকাতর ও উচ্চমনা সাধু প্রকৃতি, তখন আপনি আশীর্ব্বাদ করুন এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যেন শীঘ্র আপনার এই ঋণ পরিশোধ করিতে পারি। যাহা হউক সাহেব ঈশ্বর কৃপায় বিলাত হইতে সুস্থ শরীরে প্রত্যাগমন করিয়া দ্বারকানাথের ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কোন সময়ে, তাঁহার এক জন সহাধ্যায়ী কষ্টে পড়িয়া দ্বারকানাথের নিকট কিঞ্চিৎ প্রার্থনাশায় পত্র লিখিলে, তিনি অবিলম্বে তাঁহাকে পাঁচ শত টাকা পাঠাইয়া দেন এবং এই পত্র লিখিলেন যে, আপনি কলিকাতায় আসিলে, চিরজীবনের জন্য ভরণপোষণের ভার লইব। তাঁহার বাল্যকালের শিক্ষক শারবরণ (Sherburne) সাহেবকেও তিনি শেষ জীবন পর্য্যন্ত প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তাঁহার সদাশয়তা স্বদেশীয় কি

বিদেশীয় গণনা করিত না। যে স্থানে সাহায্যের প্রয়োজন হইত সেই স্থানেই তাঁহার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত ছিল। তৎকালে তিনি দেশীয় সমস্ত হিতকর কার্য্যের অগ্রণী ছিলেন। সে সময়ে এমন কোন সাধারণ হিত-কর কার্য্য ছিল না, যাহার সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট না ছিলেন, বা যাহার উন্নতিকল্পে তিনি মুক্ত হস্তে আর্থিক সাহায্য করেন নাই। হিন্দু কলেজ ও জমীদার সভা (Landholder's Society) ইঁহারই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট-পদ সৃষ্টিবিষয়ে ইনি বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন, এবং তিনি স্বয়ং কলিকাতায় "জষ্টিস অফ্ দি পিস" পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

এতদ্দেশীয় ছাত্রদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের যে শিক্ষাসমিতি ছিল, দ্বারকানাথ তাহার একজন উদ্যোগী এবং সুযোগ্য উদ্যমশীল সভ্য ছিলেন। তিনি হিন্দু কলেজকে হিন্দু ছাত্রগণের ভবিষ্যৎ উন্নতির দ্বার মনে করিয়া ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছিলেন। ১৮৩৫ খৃঃ কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। শবব্যবচ্ছেদকালে হিন্দুগণ চিরন্তন ধর্ম্মহানির আশঙ্কা করিয়া কলেজে অনুপস্থিত হইতে লাগিল। আর কেহ অধ্যয়ন করিতে সম্মত হইতেছিল না। দ্বারকানাথ ইহা জানিতে পারিয়া প্রতিদিন কলেজে শব ব্যবচ্ছেদ গৃহে উপস্থিত হইয়া ছাত্রগণকে বুঝাইয়া দিতেন যে, ইহাতে তাঁহাদের জাতিপাত বা অধর্ম্ম হইবে না, বরং ইহা দ্বারা শারীর বিজ্ঞান-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তাঁহারা উত্তম চিকিৎসক হইতে পারিবেন। তাঁহার চেষ্টায় ছাত্রগণের কুসংস্কার দূরীভূত হয় এবং মধুসূদন গুপ্ত নামক ছাত্র প্রথমে শবব্যবচ্ছেদ করিয়া সাধারণের নিকট শ্রদ্ধাস্পদ হইয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট এই কার্য্যের জন্য সম্মানসূচক তিনটী তোপধ্বনি করিয়াছিলেন। ছাত্রগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ দ্বারকানাথ তিন বৎসর অন্তর দুই হাজার টাকা পারিতোষিক দিতেন।

এই সদাশয় মুক্তহস্ত-পুরুষ যে সর্ব্বশ্রেণীর লোকের প্রীতি ও শ্রদ্ধা-ভাজন হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? তিনি বঙ্গবাসীর নিকট যেমন সম্মানিত ছিলেন তদ্রূপ ইংরাজ সমাজেও তাঁহার সম্মান অপরিসীম ছিল। গভর্ণর জেনারেল লর্ড অকলণ্ডকে শাসনবিধি সম্বন্ধে সৎপরামর্শ প্রদান করিবার নিমিত্ত তিনি লাট ভবনে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতেন। লাট বাহাদুর এদেশের নানা হিতানুষ্ঠান সম্বন্ধে ও জমীদারগণের সহিত গভর্ণমেণ্টের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় প্রস্তাব লইয়া সর্ব্বদাই তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন। প্রতি বৃহস্পতিবারে পরস্পর সাক্ষাৎ হইত। লাট সাহেব তাঁহার বারাকপুরের প্রাসাদে তাঁহাকে প্রায়ই নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন। তিনিও সহোদরা সমভিব্যাহারে সর্ব্বদাই দ্বারকানাথের ভবনে আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। ইঁহার ক্রীত বিখ্যাত বেল-গেছিয়া উদ্যানে লাটসাহেব ও অনেক উচ্চশ্রেণীস্থ সম্ভ্রান্ত ইংরাজ প্রায়ই পান ভোজনে নিমন্ত্রিত হইয়া আমোদ প্রমোদে আপ্যায়িত হইতেন।

দ্বারকানাথ প্রথমে গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, তৎপরে রামমোহন রায়ের সহিত পরিচয় হওয়াতে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় সৌহার্দ্দ জন্মে। ক্রমে এমন হইয়া উঠিল যে, রামমোহনের শিক্ষায় হিন্দুধর্ম্মের পৌত্তলিকতা ও আড়ম্বর বৃথা বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হওয়াতে, তিনিও সত্যস্বরূপ একেশ্বর ব্রহ্মের উপাসনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাপনাদি ধর্ম্ম কার্য্যে সহায়তা করিতে একমাত্র দ্বারকানাথই রামমোহনের দক্ষিণ-হস্ত স্বরূপ ছিলেন। দ্বারকানাথ ব্যতীত রামমোহন এক দিনও স্থির থাকিতে পারিতেন না। এরূপ একমন একপ্রাণ বন্ধু প্রায় দেখা যায় না। সম্পদে বিপদে সকল সময়েই উভয়ে উভয়ের একমাত্র ভরসা ছিলেন। দ্বারকানাথের সাহায্য না পাইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম অকালেই বিনষ্ট হইত। কারণ রামমোহন বিলাতযাত্রা করিলে কতিপয় বৎসরের মধ্যেই সমাজের সভ্যগণ, অনেকেই ভিন্ন মতাবলম্বী হইয়া এই ধর্ম্ম পরিত্যাগ

করিলেন। তখন একমাত্র দ্বারকানাথই এই সমাজকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। সমাজের সমগ্র মাসিক ব্যয় একা দ্বারকানাথই বহন করিতেন। তাঁহার যত্ন, চেষ্টা ও উদ্যমের ফলে ব্রাহ্মধর্ম্ম পুনর্জ্জীবিত হয়।

বিলাত হইতে যখন তিনি রামমোহনের পত্র পাইতেন, তখন আর স্থির থাকিতে পারিতেন না, তাঁহার মনে হইত যে কতদিনে নিজের চক্ষে সেই স্বর্গীয় ছবি সন্দর্শন করিবেন। বিলাত যাইবার পূর্ব্বে তিনি একবার নিজের দেশগুলি ভ্রমণ করেন। ১২৪২ সালে তিনি উত্তর পশ্চিম গমন করেন। তখন রেলগাড়ী হয় নাই, তজ্জন্য তিনি নৌকা ও স্থানে স্থানে অশ্বের ডাকগাড়ীতে নানা স্থানের নানা তীর্থ পরিদর্শন করেন। বৃন্দাবনে দশহাজার টাকা ব্যয় করিয়া তত্রস্থ ব্রাহ্মণ ভোজন করান। তিনি যখন আগরার দুর্গমধ্যে প্রবেশ করেন, তখন তথাকার ইংরাজ সৈনিকগণ তাঁহাদের উপাসনা গৃহের দুরবস্থা দেখাইয়া সংস্কারের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করে। তাহাতে দ্বারকানাথ তাঁহাদিগকে পাঁচশত মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন।

বিলাত যাত্রা।

পশ্চিম ভ্রমণের জ্ঞানলাভ করিয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহার বিলাত গমনেচ্ছা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ছয় বৎসর পরে তিনি ১৮৪২ খৃঃ অব্দের ৯ই জানুয়ারি ইণ্ডিয়া নামক জাহাজে বিলাত যাত্রা করিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে তাঁহার ভ্রাতা রমানাথ ঠাকুর, ভাগিনেয় চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারি পরমেশ্বর মৈত্র, রামমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ রায় ও কতিপয় ইংরাজ বন্ধু গিয়াছিলেন। বিলাত যাইবার পথে প্রায় দ্রষ্টব্য সকল স্থানই তিনি দেখিয়াছিলেন। রোম নগরে তিনি পোপ কর্ত্তৃক সম্মানিত হন। প্রুসিয়ার রাজকুমার ফ্রেডারিকের সঙ্গে তিনি পরিচিত হইয়া সৌহার্দ্দ লাভ

করেন। ইউরোপের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া, তিনি ১০ই জুন বিলাতে পৌঁছিলেন। তথায় তিনি অতি উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন;—রাজমন্ত্রী স্যার রবার্ট পিল, বোর্ড অফ্ কণ্ট্রোলের সভাপতি লর্ড ফিটজারল্ড, লর্ড ব্রাউহেম প্রভৃতি মহামান্য ও উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ কর মর্দ্দন করিয়া তাঁহার সমাদর করেন। তৎপরে ১৬ই জুন তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ১৮ই জুন তিনি বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে মহারাণী কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া একত্রে ভোজন করেন। তাঁহার অনুরোধে তিনি ইংলণ্ডের সেনা সম্মিলন (Review) ও রাজপ্রাসাদস্থ শিশু-আগার পরিদর্শন করেন। মহারাণী ও তাঁহার স্বামী প্রিন্স আলবার্ট তাঁহাদের দুইখানি বৃহৎ তৈলচিত্র (Oil painting) প্রদান করেন। তিনি কলিকাতায় আসিলে পর, উহা কলিকাতাবাসিগণকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। এই দুই খানি চিত্র এখনও টাউনহলের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। দ্বারকানাথ ক্রমশঃ রাজপরিবারস্থ সমস্ত লোক ও ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান লোকের নিকট বিশেষ সম্মানের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি বিলাত হইতে তাঁহার পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে যে পত্র লেখেন তাহার কয়েক ছত্র এই,—"আমি লণ্ডনে পৌঁছিবার দুই দিন পরেই মহারাণী কর্ত্তৃক মহাসমাদরে পরিগৃহীত হইয়াছি। এসিয়া ও ইউরোপের অনেক স্থান দেখিয়া এরূপ প্রত্যাশা করি নাই যে, ইংলণ্ড সদৃশ ক্ষুদ্র দ্বীপে, আর কিছু নূতন দেখিব। কিন্তু লণ্ডন বাস্তবিকই অদ্ভুত নগর। এখানকার জনতা ও ব্যক্তিগণের কার্য্যতৎপরতা, গাড়ী, ঘোড়া, দোকান ইত্যাদিতে আমাকে বিস্মিত করিয়াছে। প্রাতে ৮টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত আমি কেবল লোকজনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ব্যস্ত থাকি। ধনী ব্যক্তির এখানে আসিয়া জীবনের সুখ সম্ভোগ করা উচিত। এখানকার উদ্যান দেখিয়া আমার বেলগেছিয়া উদ্যানের উপর আর কিছুমাত্র আস্থা নাই।"

একদিন মহারাণী ভিক্টোরিয়া, তাঁহার স্বামী, খুল্লতাত প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণের সহিত, অশ্বারোহী সৈন্যগণের রণাভিনয় দর্শনার্থ দ্বারকানাথ নিমন্ত্রিত হন। সেই দিন মহারাণী স্বয়ং তাঁহাকে রণকৌশল বুঝাইয়া দেন। ভারতবাসীর পক্ষে এ গৌরব লাভ সাধারণ নহে। আর একদিন মহারাণী তাঁহাকে প্রীতিভোজে নিমন্ত্রণ করিয়া সেই দিনের মুদ্রিত তিনটী স্বর্ণমুদ্রা উপহার দেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষও তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে ক্রটী করেন নাই। বলিতে কি তিনি সর্ব্বত্রই রাজোচিত সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

দ্বারকানাথ বিলাতের ডাকঘর, পশুশালা, ছাপাখানা, কল কারখানা প্রভৃতি নানা স্থান পরিদর্শন করিয়া স্কটলণ্ডে উপনীত হন। তথায়ও তিনি বহুসম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পরম বন্ধু ও উপদেষ্টা রাজা রামমোহন রায়ের সমাধি দর্শনার্থ বৃষ্টল নগরে গিয়াছিলেন। তথায় সমাধি দর্শন করিয়া বন্ধুর উদ্দেশে তিনি অশ্রুপাত করেন এবং ব্যথিত হৃদয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে ষ্টেপল্‌টোন গ্রোভ স্থিত সমাধি কোন ক্রমেই তাঁহার নামের যোগ্য নহে। বিশেষ ইহার উপর স্মরণার্থ কিছুই নাই। তজ্জন্য তিনি রামমোহনের শব উত্তোলন করিয়া ইয়ারনোজ ভেল নামক স্থানে সমাহিত করেন। ঐ সমাধির উপর অতি সুন্দর স্মরণ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তৎপরে প্যারিস নগর দেখিবার জন্য তাঁহার চিত্ত অস্থির হয়। ফ্রান্স গমনের দিন বিদায় কালে তথায় "লেভির" মত মহা সমারোহ হইয়াছিল। প্যারিসে উপনীত হইয়া তিনি রাজধানীর মনোহারিণী অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ফ্রান্সের সম্রাট লুইস ফিলিপ, সম্রাজ্ঞী ও রাজমন্ত্রী প্রভৃতি রাজপুরুষ ও কর্ম্মচারিগণ সকলেই তাঁহার সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা করেন। প্যারিসে অবস্থিতি কালে ইংলণ্ডের ডাইরেক্টর সভা হইতে একখানি অভিনন্দন পত্র ও একটী স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন।

তিনি স্বদেশের কল্যাণকর অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন, ঐ পদক তাহার পুরস্কার স্বরূপ। তাঁহার প্রধান প্রধান কার্য্যগুলি ঐ পদকে খোদিত ছিল। বিলাত হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া তিনি মহারাণীর নিকট হইতে একখানি পত্র এবং তাঁহার সম্পূর্ণ প্রতিচিত্র প্রাপ্ত হন। ভাগ্যবান্ দ্বারকানাথ ইউরোপে যেরূপ রাজসম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ সম্মান অন্য কোন বঙ্গবাসীর অদৃষ্টে ঘটে নাই।

১৮৪২ খৃঃ অব্দের শেষভাগে দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলণ্ড হইতে ভারতে প্রত্যাগমন করেন। তিনি স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া, স্বজাতির কল্যাণকর অনেক উপায় অনুসন্ধান করিয়া, নিজের অসাধারণ ক্ষমতা ও বিদ্যাবুদ্ধির জয় পতাকা উড্ডীন করিয়া দেশে ফিরিলেন। কিন্তু দেশের লোক তাঁহার জাতি গিয়াছে বলিয়া মহা গণ্ডগোল আরম্ভ করিল। পীরালি ঠাকুরগণও তাঁহার বিপক্ষ হইয়াছিলেন। শেষে দেশীয় সমাজে স্থির হইল, যদি দ্বারকানাথ প্রায়শ্চিত্ত করেন, তাহা হইলে তিনি সমাজভুক্ত হইতে পারিবেন। কিন্তু তিনি প্রায়শ্চিত্তের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই।

১৮৪৫ খৃঃ অব্দের ৮ই মার্চ্চ দ্বারকানাথ পুনরায় বিলাত যাত্রা করিলেন। চিকিৎসা বিদ্যায় উত্তমরূপে সুশিক্ষিত হইবার জন্য ইঁহার সঙ্গে চারিজন শিক্ষার্থী বাঙ্গালী যুবক বিলাত গিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী, (ইনি গুডিভ চক্রবর্ত্তী নামে পরে পরিচিত হন।) ভোলানাথ বসু, দ্বারকানাথ বসু ও গোপাল লাল শীল। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম দুইজনের সমস্ত ব্যয় ভার দ্বারকানাথ বহন করেন, অপর দুইজনের ব্যয়ভার গভর্ণমেণ্ট বহন করেন। বিলাত যাইবার পথে দ্বারকানাথ কাইরো নগরে ইজিপ্টের রাজপ্রতিনিধি ও নেপল্‌স্ সহরে ইটালীর রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ২৪শে জুন তিনি লণ্ডন নগরে উপস্থিত হন। প্রধান রাজমন্ত্রী গ্লাড্‌ষ্টোন্ সাহেব একদা দ্বারকানাথকে নিমন্ত্রণ

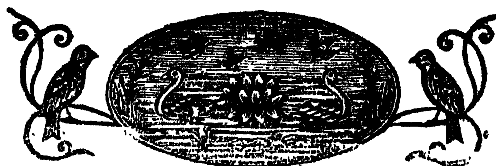
করেন। তথায় তাঁহার সহিত ভারতবর্ষের হিতসাধনবিষয়ক বিবিধ কথোপকথন হয়। দ্বিতীয়বারেও দ্বারকানাথ মহারাণী কর্ত্তৃক বিশেষরূপে সম্মানিত হন। প্রাসাদে অভ্যর্থনা উপলক্ষে তিনি সিংহাসনের পশ্চাতে দাঁড়াইবার দুর্লভ সম্মান ও স্থান প্রাপ্ত হন। বাকিংহাম প্রাসাদে গমন উপলক্ষে দ্বারকানাথ, মহারাণী ও প্রিন্স এলবার্টের ক্ষুদ্র আকারে চিত্রিত-মূর্ত্তি সম্মান স্বরূপ উপঢৌকন প্রাপ্ত হন। চিত্রের নিম্নে মহারাণী স্বহস্তে এই কথাগুলি লিখিয়া ছিলেন,—"To Dwarka Nath Tagore, with best regards from Victoria R. Albert, Buckingham Palace, July 8th, 1845." তিনি পূর্ব্বে স্কটল্যাণ্ড দেখিয়াছিলেন, এবার আয়র্লণ্ডে গমন করিলেন। তথায়ও তিনি বিশেষরূপে সম্মানিত হন। তিনি বিলাতে যেরূপ মহাসমারোহে থাকিতেন তাহাতে তিনি "Indian Prince" এই আখ্যা প্রাপ্ত হন। কি বিলাতে কি ভারতে সর্ব্বত্রই তিনি এই নামে সম্মানিত ছিলেন।

মৃত্যু।

কি অশুভক্ষণেই তিনি দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে আর স্বদেশে ফিরিতে হইল না। তিনি বিলাতে পৌছিয়া প্রায় ছয় মাসকাল নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া ও সম্মান প্রাপ্ত হইয়া ১৮৪৬ খৃঃ অব্দের ৩০শে জুন ডচেস্ অফ্ ইনভর্ণেস ((Duchess of Inverness) কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হন। ভোজন সময়ে দ্বারকানাথ হঠাৎ অত্যন্ত শীত ও কম্প অনুভব করেন। নিমন্ত্রিতা রমণীগণ তাঁহার আকস্মিক পীড়া দর্শন করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তৎক্ষণাৎ চারি জন ডাক্তার চিকিৎসার্থ নিযুক্ত করিলেন। তৎপরে তথা হইতে শীঘ্র গৃহে প্রত্যাগমন করেন। চিকিৎসকগণ কিয়দ্দিবস চিকিৎসা করিয়া তাঁহাকে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে পরামর্শ দিলেন। তিনি এক মাসকাল ইতস্ততঃ বায়ু সেবন, করিলেন,

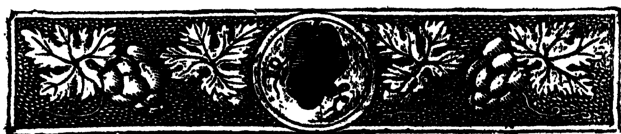
কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ১৮৪৬ খৃঃ অব্দের (১২৫৩ সালে) ১লা আগষ্ট সবিরাম জ্বরে বেলফাষ্ট নগরে ৫২ বৎসর বয়সে তাঁহার জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল। তাঁহার বন্ধু রামমোহন রায় বিলাতে দেহত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং তিনিও তাঁহার প্রিয় সুহৃদকে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে পারিলেন না। তাঁহাদের উভয়ের ভালবাসা ও বন্ধুত্ব জগৎ-বাসীকে দেখাইবার জন্য যেন তিনি বন্ধুর নিকট চিরনিদ্রায় শয়ন করিলেন। কেনসাল গ্রিণ্ (Kensal Green) নামক স্থানে মহাসমারোহে তাঁহার সমাধি হয়। সমাধিস্তম্ভে রজতফলকে এই কথাগুলি বঙ্গানুবাদের সহিত লিখিত হয়;—"Babu Dwarknath Tagore, Zemindar, died 1st August, 1846, aged 52 years."

তাঁহার মৃত্যু সংবাদে ইউরোপের সকলেই রোদন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রদর্শনার্থ ইংলণ্ডের টাইমস্ ও অন্যান্য সকল সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণ তাঁহার শোকে মুহ্যমান হইয়া গভীর শোক প্রকাশ করিয়া সম্পাদকীয় স্তম্ভ সকল পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ এদেশে পৌঁছিলে চতুর্দ্দিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। তাঁহার স্মরণার্থ ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ সার্ পিটার গ্রাণ্টের সভাপতিত্বে টাউন হলে ১৮৪৬ খৃঃ ২রা ডিসেম্বর একটী মহতী শোকসভার অধিবেশন হইয়াছিল। বড়ই আক্ষেপের বিষয় দ্বারকানাথ অতি অল্প বয়সে কালের করাল কবলে পতিত হইয়াছিলেন। তিনি তিন পুত্র রাখিয়া যান। জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রদ্ধাস্পদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিতীয় পুত্র গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর।





রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। (১৮৭ পৃঃ)



রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর পর্য্যন্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর মহৎ লোকদিগের জীবনী শেষ হইল। এই শতাব্দীতে মুসলমানগণের প্রবল প্রতাপ, আচার ব্যবহার ও ভাষার প্রচলন সমস্তই অস্তমিত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্রিটিশ প্রতাপও ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিতে লাগিল। এই শতাব্দীর কৈশোর কালে ১৮১৩ খৃঃ অব্দে (১২২১ সালে) বৈশাখ মাসে কলিকাতা বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীটস্থ মাতামহের আলয়ে মহাত্মা কৃষ্ণমোহনের জন্ম হয়। এই সময় আমাদের মহারাজা তৃতীয় জর্জ্জ নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সহিত ঔপদ্বীপিক যুদ্ধে (Peninsular War) লিপ্ত ছিলেন। তজ্জন্য ভারতেও অনেক অসুবিধা ও অশান্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। কালের সেই অশান্তিপূর্ণ অধ্যায়ে, ইতিহাসের সেই বিচিত্রময় পরিচ্ছেদে ভারতমাতা একটী পুত্ররত্ন লাভ করিয়া শান্তি সুখে সুখী হইয়াছিলেন। সেই রত্নই কৃষ্ণমোহন।

কৃষ্ণমোহনের বাল্যজীবন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। তিনি দরিদ্রের পর্ণ কুটীরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতার নাম জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী বারুইপুরের ৪ ক্রোশ দক্ষিণবর্ত্তী নবগ্রামে তাঁহার জন্মভূমি ছিল। তিনি দরিদ্র কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান। সে সময়ে কুলীনগণের ভিক্ষাবৃত্তি ও বিবাহ ব্যবসাই জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন ছিল। তৎকালে তাঁহারা শৈশবেই বিবাহিত হইয়া শ্বশুরের গলগ্রহ হইতেন। তদনুসারে তিনি কলিকাতার ঝামাপুকুর নামক স্থানে

বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীটে রামজয় বিদ্যাভূষণের কন্যাকে বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়েই বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি শ্বশুরের পোষ্য হইয়া তথায় বাস করিতে করিতে, বয়োবৃদ্ধিসহকারে তাঁহার তিনটী পুত্র ও দুইটী কন্যা জন্ম গ্রহণ করিল। জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম ভুবনমোহন, মধ্যম কৃষ্ণমোহন এবং কনিষ্ঠ কালীমোহন।

রামজয় বিদ্যাভূষণ সামান্য গৃহস্থ ছিলেন। তিনি যোড়াসাঁকো-নিবাসী সুবিখ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহের পিতামহ শান্তিরাম সিংহের সভা-পণ্ডিত ছিলেন; এবং সামান্য যজমানী ব্যবসায় দ্বারা কোন রকমে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তৎকালে দ্রব্যাদির দুর্ম্মূল্যতা ছিল না, সুতরাং সংসার চালাইতে বর্ত্তমানের ন্যায় বিশেষ কষ্ট হইত না। কিন্তু জীবন-কৃষ্ণের বংশ বৃদ্ধি হওয়াতে ও দিন দিন দ্রব্যাদির মূল্য মহার্ঘ্য হওয়াতে রামজয় বড় বিপদে পড়িলেন। তিনি কৌশলে জামাতা প্রভৃতি পোষ্য-গণকে স্থানান্তরিত করিতে মনঃস্থ করিলেন। তিনি গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেনে জামাতাকে কিঞ্চিৎভূমি দান করিয়া তাহাতে ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। সুতরাং জীবনকৃষ্ণকে শ্বশুর-ভবন ত্যাগ করিতে হইল। তিনি নূতন আবাসে পুত্র কলত্রাদি লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই-বার তিনি সংসার-পোষণে বড়ই কষ্টে পড়িলেন। তাঁহার স্ত্রী কাটনা কাটিয়া, বেটের দড়ি পাকাইয়া ও পৈতা প্রস্তুত করিয়া স্বামীর সাহায্য করিতে লাগিলেন। রামজয় বিদ্যাভূষণও কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিতেন এবং জীবনকৃষ্ণ স্বয়ং ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে অতি কষ্টে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

বিদ্যাশিক্ষা।

এই সময়ে ভারতবন্ধু হেয়ার সাহেব কলিকাতায় অনেকগুলি পাঠশালা ও বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। এই সকল পাঠশালা ও বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে শিক্ষাদানের নিয়ম ছিল। তিনি কালীতলায় যে পাঠ-

শালাটী খুলিয়া ছিলেন, তথায় বালক কৃষ্ণমোহন ছয় বৎসর বয়সে ১৮১৯ খৃঃ অব্দে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মাতার ঐকান্তিক যত্নে কোন রকমে পাঠশালার পাঠ চলিতে লাগিল। অল্প কাল মধ্যে তিনি পাঠশালার প্রধানতম ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইলেন। হেয়ার সাহেব কৃষ্ণমোহনের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে ১৮২৩ খৃঃ অব্দে তাঁহার নবপ্রতিষ্ঠিত "স্কুল সোসাইটী" নামক ইংরাজী বিদ্যালয়ে লইয়া গেলেন। এই সময়ে কৃষ্ণমোহনের উপনয়ন ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়। তাঁহার বিদ্যানুশীলনের যত্ন ও একাগ্রতায় মুগ্ধ হইয়া "স্কুল সোসাইটী" তাঁহার পড়িবার সমুদয় ব্যয় বহন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিদ্যানুরাগিতা ও সচ্চরিত্রতার গুণে তিনি শিক্ষক মণ্ডলীর অতিশয় প্রিয়পাত্র হইতে লাগিলেন।

কিন্তু এই সময়ে তাহার সাংসারিক অবস্থা অতিশয় শোচনীয় ছিল। কোন দিন তাঁহার উদরে অন্ন যাইত, কোনদিন অনাহারে উপবাসে দিন কাটিত। তথাপি বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে এমনি মনোযোগী ছিলেন, যে এই সকল কষ্ট তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। তাঁহার পিতা মাতা সতত অন্নের চেষ্টাতেই ব্যস্ত থাকিতেন। সুতরাং যথা সময়ে স্কুলের অন্ন পাওয়া কৃষ্ণমোহনের অদৃষ্টে জুটিয়া উঠিত না। ক্রমে এই অনাহার কষ্ট প্রবল হইল। তিনি দেখিলেন এরূপ ভাবে চলিলে শীঘ্রই তাঁহার দেহ জরাগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। তজ্জন্য তিনি মাতার সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, রাত্রে তিনি সমস্ত পাঠ সমাপন করিয়া প্রাতঃকালে রন্ধন করিবেন, এবং সেই সময়ে তাঁহার মাতা নিজ শ্রমের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করিবেন। এই নিয়মেও তাঁহাদের প্রতিদিন অন্নের সংস্থান হইত না। শেষে তিনি মাতুলালয়ে বিগ্রহ পূজা করিয়া নৈবেদ্যর যাহা কিছু তণ্ডুল প্রাপ্ত হইতেন, তাহাতে তাঁহার প্রাতঃকালিক অন্নের সংস্থান হইত। ঐ তণ্ডুল তিনি নিজে রন্ধন করিতেন এবং ঐ সময়েও তিনি বিদ্যালয়ের পুস্তক পাঠ করিতেন।

এইরূপে যথা সময়ে আহার প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার জীবন রক্ষা ও বিদ্যা শিক্ষার প্রশস্ত উপায় স্থিরীকৃত হইয়াছিল। যাহা হউক বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এত কষ্টে পড়িয়াও তাঁহার দৃঢ় বিদ্যানুরাগ ও একান্ত অধ্যবসায়ের গুণে তিনি ক্লাসের প্রথম ছাত্র ছিলেন, এবং শিক্ষা বিষয়ে কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারিত না।

এক বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮২৪ খৃঃ অব্দে যখন হিন্দু কলেজ সংস্কৃত কলেজের নব নির্ম্মিত গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন কৃষ্ণমোহন "স্কুল সোসাইটী" হইতে অবৈতনিক ছাত্ররূপে হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি অত্যন্ত যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে প্রধানতম ছাত্র বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন। ১৮২৮ খৃঃ অব্দে কৃষ্ণমোহনের জীবনের একাধারে হর্ষ ও বিষাদের উদয় হইল। কারণ এই অব্দে তিনি হিন্দু কলেজের পরীক্ষায় সর্ব্বোন্নত হওয়ায় যেমন তাঁহার হৃদয় আনন্দোৎসাহে উৎফুল্ল হইল, তেমনি এই কাল-খৃষ্টাব্দে দরিদ্রতার কঠোর পীড়নে তাঁহার দরিদ্র পিতার জীবন বায়ুর অবসান হইল। এ শোক তাঁহার এবং পরিবার বর্গের কি ভয়ঙ্কর মর্ম্মস্পর্শী! যাহা হউক এই দুঃখের দিনে বিদ্যালয়ের প্রধান ছাত্রবৃত্তি তাঁহারই অদৃষ্টে ঘটিয়া ছিল। তাঁহার অগ্রজ ভুবনমোহনেরও এই সময়ে Court of Request নামক তৎকালীন বিচারালয়ে মকর্দ্দামার আরজি লিখিবার একটী কর্ম্ম জুটিয়া ছিল। এই আদালত এক্ষণে ছোট আদালত নামে অভিহিত হইয়াছে। এই কর্ম্ম অবলম্বনে তাঁহাদের সংসারের কষ্ট অনেকটা দূর হইল। এক বৎসর পরে কৃষ্ণমোহনের হিন্দু কলেজের পাঠ শেষ হইল। ১৮২৯ খৃঃ অব্দে নভেম্বর মাসে তিনি হিন্দু কলেজ হইতে উচ্চ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইলেই, হেয়ার সাহেব তাঁহাকে নিজ স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেন। স্কুল সোসাইটীর নাম এই সময়ে পরিবর্ত্তিত হইয়া হেয়ার স্কুল হইয়াছিল।

ডিরোজিও।

কৃষ্ণমোহন যখন হিন্দু কালেজের প্রথম শ্রেণীতে পড়েন, তখন সেই কালেজের চতুর্থ শ্রেণীতে একজন অসাধারণ ব্যক্তি শিক্ষক ছিলেন। ইঁহার নাম হেন্‌রি ভিভিয়ান ডিরোজিও। ইনি জাতিতে ফিরিঙ্গী, তাঁহার বয়স বিংশতি বৎসর মাত্র। কিন্তু বিদ্যা, বুদ্ধি, উৎসাহ, স্বাধীন-চিত্ততা, স্বদেশানুরাগ, সত্য-প্রিয়তা প্রভৃতি গুণে ইনি কালেজের ছাত্রগণের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। অল্প দিনের মধ্যে ছাত্রগণ ইঁহার এতাদৃক অনুরক্ত হইয়া পড়িল যে, ইঁহার মুখের দুইটা কথা শুনিবার জন্য সর্ব্বদা ইঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত। ইঁহার একটা কথায় যে কাজ হইত, কলেজের কর্ত্তৃপক্ষদিগের দশ ঘা বেতের ভয়ে তাহা হইত না। তাঁহার ভালবাসা ও সদুপদেশের গুণে ত্বরায় অনেক গুলি ছাত্র তাঁহার শিষ্য হইল। ইঁহারা এদেশে ইংরাজী শিক্ষার ইতিহাসে "ডিরোজিও ক্লাব" নামে বিখ্যাত। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ি, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাজা দিগম্বর মিত্র, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি ছাত্রগণ ডিরোজিওর শিক্ষার গুণে দেশের মধ্যে বড় লোক হইয়াছিলেন। ডিরোজিওর সুমিষ্ট বাক্য ও উপদেশের গুণে, ছাত্রগণ এমন বশীভূত হইয়াছিল যে, তাহারা তাঁহার জন্য মরিতে পারিত। তিনি বালকগণকে সত্য-প্রিয়, উদার, সাহসী ও তেজস্বী করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

ডিরোজিও সাহেব, ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধে এক নূতন ভাব জাগাইয়া দিলেন। তিনি হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতার ভ্রম দেখাইয়া ও সামাজিক কুরীতির দোষ দেখাইয়া, ছাত্রগণকে হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে উৎ-সাহিত করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণমোহন প্রভৃতি ছাত্রগণ এই নূতন ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বধর্ম্মের প্রতি আস্থাহীন হইতে লাগিলেন। ক্রমে ছাত্রদের

মনে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। তাহারা সাহসের সহিত হিন্দু ধর্ম্মবিরুদ্ধ অনেক কাজ করিতে লাগিল। কলিকাতা সহরে সর্ব্বত্র হুলস্থূল পড়িয়া গেল। হিন্দুয়ানি লোপ পাইল, জাতি ধর্ম্ম গেল, সর্ব্বনাশ হইল, বলিয়া চতুর্দ্দিকে আন্দোলন হইতে লাগিল। ডিরোজিওর শিক্ষায় ছাত্রগণ নাস্তিকতা শিক্ষা করিতেছে এবং অনাচারী হইয়া উঠিতেছে, এই হেতুবাদে সাহেবের বিরুদ্ধে কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট এক আবেদন পত্র উপস্থিত হইল। ধর্ম্ম সভার সভ্যগণ দলবদ্ধ হইয়া ডিরোজিওকে হিন্দু কালেজ হইতে তাড়াইবার জন্য হেয়ার সাহেবকে আক্রমণ করিয়া বলিলেন "ডিরোজিও সাহেবকে না তাড়াইলে আমরা ছেলেদের আর স্কুলে পাঠাইব না।" সুতরাং ডিরোজিও সাহেবকে বাধ্য হইয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইল। স্কুল পরিত্যাগ করিলেও ডিরোজিওর প্রভাব ইঁহাদের উপর সমভাবে অক্ষুণ্ণ রহিল। তিনি যে তরঙ্গ তুলিয়া দিয়া গেলেন তাহা আর থামিল না। যুবকগণ নির্ভীক চিত্তে সামাজিকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন; কৌলীন্য প্রথার উচ্ছেদ সাধন, শুক্র বিক্রয় নিবারণ, বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহের প্রতিবন্ধকতা আচরণ প্রভৃতি আলোচ্য বিষয় লইয়া তাঁহারা হিন্দু সমাজে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। যুবকগণ সভা সমিতি করিয়া, সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া হিন্দু সমাজের কুসংস্কার গুলির মূলোৎপাটনে বদ্ধপরিকর হইলেন। ইঁহাদের উদ্যোগে ১৮২৯ খৃঃ "একাডেমিক এসোসিয়েসন" নামে এক সভা সংস্থাপিত হইল। ইহার উদ্দেশ্য সামাজিক কুসংসারের উচ্ছেদ সাধন। এই সভায় ডেভিড হেয়ার, মিঃ রায়ান, লর্ড বেন্টিঙ্কের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ বেনসন সাহেব প্রভৃতিরও বিশেষ সহানুভূতি ছিল।

গৃহত্যাগ।

দুই বৎসর ধরিয়া এইরূপ সামাজিক আন্দোলন হওয়াতে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে দেশ মধ্যে ভয়ঙ্কর বিপ্লব উপস্থিত হইল। সে সময়ে কৃষ্ণমোহনের

বাটীতে ডিরোজিওর ছাত্রগণের একটা বৈঠক ছিল। উক্ত খৃষ্টাব্দে ২৩শে আগষ্ট তারিখে, যখন কৃষ্ণমোহন হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা করিতে গিয়াছেন, সেই সময়ে তাঁহার অনুপস্থিতিতে যুবকদল এক মহা বিভ্রাট বাঁধাইয়া বসিল। যুবকগণ অস্পর্শীয় গোহাড় ও গোমাংস এক ব্রাহ্মণের বাটীতে নিক্ষেপ করিয়া "ঐ গোহাড়, ঐ গোমাংস" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। সেই চিৎকারে ব্রাহ্মণ ক্রোধে কম্পান্বিত কলেবরে প্রতিবেশিবর্গের সহিত দলবদ্ধ হইয়া মার মার শব্দে যুবকদিগকে আক্রমণ করিলেন। যুবকদল যে যেদিকে পারিল সে সেই দিকে পলায়ন করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে নিরীহ কৃষ্ণমোহন বাটী আসিয়া দেখেন যে বাটী লোকে পরিপূর্ণ, কেবল মার মার শব্দ। এমন সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভুবনমোহন কর্ম্মস্থান হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইতেছেন দেখিয়া, প্রতিবেশিবর্গ তাঁহার নিকট কৃষ্ণমোহনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিল যে, আপনার ভ্রাতার প্ররোচনায় যুবকদল গোহাড় নিক্ষেপ করিয়াছে। যদি আপনি মঙ্গল চান তাহা হইলে এখনি কৃষ্ণমোহনকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দিন, নতুবা আপনাদের আর রক্ষা নাই। ভুবনমোহন আর কি করিবেন, তিনি ভীত হইয়া কৃষ্ণমোহনকে বলিলেন—"ভাই, হয় তুমি বাটী হইতে বহিষ্কৃত হও, নতুবা আমাকে বহিষ্কৃত হইতে হইবে।" কৃষ্ণমোহন কোন কথা না কহিয়া জ্যেষ্ঠের আদেশ অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়া ম্লানমুখে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন।

খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ।

নিঃসম্বলে গৃহত্যাগী হইয়া কৃষ্ণমোহন সে রাত্রি কোথায় যান, উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি স্বীয় বন্ধু দক্ষিণারঞ্জনের ভবনে গিয়া আশ্রয় লইলেন। তৎপরে কোন সহৃদয় ইংরাজ তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন। এই সময় কৃষ্ণমোহন ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন।

বিখ্যাত ডফ সাহেব কৃষ্ণমোহনকে নিরাশ্রয় দেখিয়া খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহাতে হিন্দুসমাজ কৃষ্ণমোহনের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার কর্ম্মচ্যুতির নিমিত্ত হেয়ার সাহেবকে গিয়া বলিলেন—"কৃষ্ণমোহনকে না তাড়াইলে আর কোন হিন্দু সন্তানকে এ বিদ্যালয়ে পাঠান হইবে না।" ইহাতে তিনি শঙ্কিত হইলেন, সুতরাং হেয়ার সাহেব বাধ্য হইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বে কৃষ্ণমোহনকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। অসহায় কৃষ্ণমোহন এইরূপে অন্নে পর্য্যন্ত বঞ্চিত হইলেন। সমাজ হইতে পরিত্যক্ত, আত্মীয় স্বজন হইতে সম্বন্ধ চ্যুত, মনোদুঃখে জর্জ্জরিত, নিরাশ্রয় কৃষ্ণমোহন নিরুপায় হইয়া, পাদরি ডফ্ সাহেবের চিত্তমুগ্ধকারী ধর্ম্মকথায় আকৃষ্ট হইলেন। তৎপরে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ১৭ই অক্টোবর মৃজাপুর ষ্ট্রীটে ডফ্ ভবনে (বর্ত্তমান ঘোষালদিগের বাটীতে) বহু সংখ্যক ইংরাজ ও বাঙ্গালীর সম্মুখে ডফ্ সাহেবের পৌরহিত্যে তিনি খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। ভারত মাতার কৃতি সন্তান সমাজের অত্যাচারে অসহায় অবস্থায় এইরূপে সনাতন আর্য্য ধর্ম্ম চ্যুত হইয়া ম্লেচ্ছ ধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য হইলেন। কি পরিতাপের বিষয়!

কৃষ্ণমোহন খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আশ্রয় পাইলেন। এই খৃষ্টাব্দে "লণ্ডন মিসনারি সোসাইটীর" অধীনে মৃজাপুর ষ্ট্রীটে এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। কৃষ্ণমোহন তাহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত ছিলেন। ইহাতে তাঁহার দুঃখ দূর হইল। তিনি মনের আনন্দে জ্ঞানের মনোমদ বিভায় কার্য্য ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ কি ষোড়শ বৎসর বয়সের সময় কৃষ্ণমোহনের হাওড়ানিবাসী রাধামোহন চট্টোপাধ্যায়ের বিন্দুবাসিনী নাম্নী কন্যার সহিত বিবাহ হইয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করাতে রাধামোহন তাঁহার কন্যাকে পাঠাইতে আপত্তি করিলেন। সাধ্বী স্ত্রী গোপনে পিতার অজ্ঞাতসারে স্বামীকে পত্র লিখিলেন। পত্নীর মনোভাব জানিতে পারিয়া কৃষ্ণমোহন অগত্যা

আদালতের আশ্রয় লইলেন। হাওড়া আদালতের বিচারে তাঁহার জয় হইল, তিনি সানন্দে স্ত্রীকে নিজ আবাসে লইয়া আসিলেন। ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে তাঁহার স্ত্রী বিন্দুবাসিনী খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী হন।

তাঁহার খৃষ্টান হইবার পূর্ব্বে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে হেয়ার স্কুলের শিক্ষকতার সময়ে, প্রসন্নকুমার ঠাকুর রিফরমার (Reformer) নামে এক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। কৃষ্ণমোহন ইহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া উক্ত বৎসরের মে মাসে Inquirer নামক এক কাগজ বাহির করিলেন। এই কাগজ হিন্দু-দিগের কুসংস্কার সমূহের বিরুদ্ধবাদী অনেক তেজস্বী প্রবন্ধে পূর্ণ থাকিত। এই সময় বঙ্গভাষার অতি দুরবস্থা, তজ্জন্য কৃষ্ণমোহনের দৃষ্টি বঙ্গভাষার সৌষ্ঠব-সাধনে প্রধাবিত হইল। তিনি 'সুধাংশু' নামক বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশ করিলেন। এই কাগজে স্বাধীনভাবে সকল বিষয়ের সমালোচনা করিতেন। যাহাতে দেশের কুসংস্কার দূর হয়, কুরীতি সকল সংশোধিত হয়, নীতির উন্নতি হয়, তিনি সেই চেষ্টা করিতেন। এই পত্র দ্বারা বঙ্গভাষার অনেকটা উপকার হইয়াছিল। ইহার পর তিনি অনেকগুলি পুস্তক প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন, তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

কর্ম্মজীবন।

মৃজাপুরের বিদ্যালয়ে পাঁচ বৎসর অধ্যক্ষতা করিতে করিতে ক্রমশঃ তাঁহার পদের উন্নতি হইতে লাগিল। খৃষ্টান সমাজে তাঁহার মান সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ১৮৩৭ খৃঃ তিনি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-যাজকের পদে উন্নীত হইলেন। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে তাঁহার জন্য হেদুয়ার পশ্চিমে বেথুন কলেজের দক্ষিণে একটী খৃষ্টীয় ধর্ম্ম মন্দির নির্ম্মিত হইল। ইহা অদ্যাবধি কৃষ্ণবন্দ্যোর গির্জ্জা বলিয়া সাধারণে পরিচিত। এই ভজনালয়ে তিনি আচার্য্য হইয়া নিয়মিতরূপে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন।

সচ্চরিত্র ব্যক্তি সকলেরই স্নেহের পাত্র। বিশপ উইলসন সাহেব সুচরিত্রের জন্য কৃষ্ণমোহনকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। তিনি পশ্চিমে ধর্ম্মপ্রচার করিতে যাইয়া কোন বেগমের নিকট প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হন। সেই অর্থে তিনি হেদুয়ার এই গির্জ্জা প্রস্তুত করাইয়া দেন। এতদ্ভিন্ন রামকমল সেন প্রভৃতি এদেশবাসীর নিকট হইতে ৮০০০৲ আট হাজার টাকা সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই স্থানে কৃষ্ণমোহন ১৮৩৭ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৫২ পর্য্যন্ত ১৫ বৎসর কাল ধর্ম্মযাজকের পদে আধিরূঢ় ছিলেন। এই খৃষ্টাব্দে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালীমোহনও খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

স্বকীয় অধ্যবসায় ও ঐকান্তিক যত্নের প্রভাবে কৃষ্ণমোহন সংস্কৃত, আরবী, পারসী, উর্দ্দু, হিন্দি, বাঙ্গালা, ইংরাজী, লাটিন, গ্রীক্, হিব্রু, উড়িয়া, তামিলি, গুজরাটী এই ত্রয়োদশটী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত, হিন্দি, তামিল ও উড়িয়া ভাষার প্রত্যেক বৎসরই পরীক্ষক হইতেন। তাঁহারই একান্ত চেষ্টা ও যত্ন প্রভাবে ১৮৬৩ খৃঃ এদেশে বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষাপ্রথা প্রথম সংস্থাপিত হয়। এজন্য বঙ্গবাসী তাঁহার নিকট চির ঋণী।

জগতে মহজ্জীবন লাভ করার প্রধান উপায়—পরিশ্রম। শ্রমবিমুখ আলস্যপরায়ণ ব্যক্তি জগতে কিছুই করিতে পারে না। যিনি সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন, তিনিই জগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। কৃষ্ণমোহন বালককাল হইতে নানা বিপ্লবের মধ্যে পতিত হইয়াও শেষজীবন পর্য্যন্ত অপরিমিত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি কি প্রাতঃকাল, কি মধ্যাহ্নকাল, কি রাত্রিকাল, সকল সময়েই কোন না কোন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। তিনি কখনও আলস্যে সময় নষ্ট করিতেন না।

পুস্তক প্রচার।

১৮৪৫ খৃঃ গভর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের প্ররোচনায় কৃষ্ণমোহন "সর্ব্বার্থ সংগ্রহ" নামক জ্ঞানগর্ভ মহাকোষ (Encyclopædia Bengaliansis) প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহা ত্রয়োদশ খণ্ডে বিভক্ত। এই অমূল্য গ্রন্থ বঙ্গভাষার একটী প্রধান ভূষণ। ইহাতে বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিদ্যার পাণ্ডিত্য দেখাইয়া তিনি বিদ্যোৎসাহী সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যে প্রীত হইয়া ১৮৪৬ খৃঃ লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয় তাঁহাকে একখানি এলফিনষ্টোন প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস উপহার দিয়াছিলেন। ১৮৫১ খৃঃ মহাত্মা বীটন বা বেথুন সাহেবের মৃত্যু হইলে যে শোক সভা হয়, কৃষ্ণমোহন তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন; এবং উক্ত খৃষ্টাব্দে "বেথুন সোসাইটী" সংস্থাপিত হইলে, তিনি ইহার সভ্য ও সহকারী সভাপতির পদে সম্মানিত হন। ক্রমে কৃষ্ণমোহনের বিদ্যাবুদ্ধির প্রভাব দিন দিন সাধারণে প্রচারিত হইতে লাগিল। তিনি অনেক ইংরাজী পত্রে নানা প্রকার প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। "কলিকাতা রিভিউ" নামক একখানি ত্রৈমাসিক কাগজ এই সময় প্রচারিত হয়। কৃষ্ণমোহন ইহার এক জন প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন। "বাঙ্গালার কুলীন ব্রাহ্মণ" নামক এক প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি সাধারণের নিকট বিশিষ্টরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। এই সময় গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে প্রধান অনুবাদকের পদে নিযুক্ত হইতে অনুরোধ করেন, কিন্তু শিক্ষাসমিতি "শিবপুর বিসপস্ কলেজে" অধ্যাপক হইতে অনুরোধ করায় তিনি পূর্ব্ব কর্ম্মের মায়া পরিত্যাগ করিয়া ১৮৫২ খৃঃ বিসপস্ কলেজের অধ্যাপকতা গ্রহণ করিলেন। তিনি পরিবারবর্গ লইয়া শিবপুরে বাস করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণমোহনের শিক্ষানুরাগ অতুলনীয়। তিনি বিসপস্ কলেজে আসিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে সাহিত্যচর্চ্চা করিতে লাগিলেন। ১৮৬১-৬২ খৃঃ

হিন্দুর "ষড়দর্শন" বিষয়ে প্রভৃত গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ বাঙ্গালা ও ইংরাজী-ভাষায় প্রকাশ করিয়া তিনি উভয় ভাষারই পুষ্টিসাধনে সহায়তা করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, শারীরক ভাষ্য, নারদপঞ্চরাত্র, ব্রহ্মসূত্র, মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের সংস্কৃত ও ইংরাজী টীকার সহিত অনুবাদ প্রকাশ করিয়া সাহিত্য জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রকৃতিদত্তা সাহিত্যবিষয়িণী ক্ষমতা এই সময়ে পূর্ণশক্তিতে বিকাশমান। ১৮৭৫ খৃঃ তিনি "ঋগ্বেদ সংহিতা" টীকার সহিত প্রকাশ করিয়া হিন্দুসমাজের ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন। এই সময়ে "আর্য্যশাস্ত্রের সাক্ষ্য" নামে আর একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করায়, তাঁহার যশোভাতি সাহিত্য-জগতে বিস্তৃত করিল।

বিশপ কলেজে অবস্থানকালে ১৮৬৮ খৃঃ তাঁহার প্রাণপত্নী বিন্দুবাসিনী চারিটী কন্যা রাখিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহাদের একটী পুত্র জন্মিয়াছিল, শৈশবেই তাহার মৃত্যু হয়। জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম কমলমণি, মধ্যমার নাম দৈবকী, তৃতীয়া মনমোহিনী ও চতুর্থীর নাম মিলি। কন্যা-গুলি রূপলাবণ্যে দেবীমূর্ত্তি। কমলমণির রূপে মুগ্ধ হইয়া প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। মধ্যমা দৈবকী সেল সাহেবকে, মনমোহিনী (School Inspectress) হুইলার সাহেবকে এবং মিলি ষ্টুয়ার্ট সাহেবকে বিবাহ করেন। কন্যাগুলি সকলেই সুশিক্ষিতা।

কৃষ্ণমোহন ১৮৫২খৃঃ হইতে ১৮৬৮ খৃঃ পর্য্যন্ত শিবপুরে বিসপস্ কলেজে অধ্যাপনা করেন। স্ত্রীবিয়োগজনিত মনঃকষ্ট প্রাপ্তির অব্যব-হিত পরেই তিনি অধ্যাপকের পদ পরিত্যাগ করেন। বাঙ্গালী খৃষ্টানের মধ্যে তিনিই প্রথমে আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হন। ১৮৬৭ খৃঃ তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচিত হন; এবং বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই ইংরাজী-সাহিত্যের প্রথম পরীক্ষক নিযুক্ত হন। এতদ্ভিন্ন তিনি ফ্যাকল্টি

অফ্ আর্টের সভাপতি, কলিকাতা বিশপের অবৈতনিক মাননীয় চ্যাপলেন, এসিয়াটিক সোসাইটীর সভ্য, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া অতি উচ্চ সম্মান ও সম্ভ্রমের সহিত সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট ইঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া ১৮৭৬ খৃঃ লর্ড নর্থব্রুকের পরামর্শে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহাকে D. L. (Doctor of Law) উপাধি প্রদান করেন ; এবং ১৮৭৮ খৃঃ তিনি C. I. E. (companion of the Indian Empire) উপাধি লাভ করেন। উক্ত খৃষ্টাব্দে তিনি ভারত সভার (British Indian Association) সভাপতিরূপে মনোনীত হন। ১৮৮০ খৃঃ কলিকাতার অধিবাসিগণ তাঁহাকে মিউনিসিপালিটিতে আপনাদের প্রতিনিধিরূপে বরণ করেন। মিউনিসিপালিটিতে সকলে তাঁহাকে তেজস্বী, স্পষ্টবাদী, সত্যনিষ্ঠ ও অধর্ম্মদ্বেষী বলিয়া জানিত। তিনি তথায় নির্ভীকভাবে আত্মমত প্রকাশ করিতেন। ১৮৮৫ খৃঃ যখন কর্তৃপক্ষের কার্য্যপ্রণালী ইঁহার অসহ্য হয়, তখন ক্ষুব্ধ মনে ইনি স্বীয় পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সকল প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনেও তিনি অগ্রণী ছিলেন।

তাঁহার মাতৃভক্তি ও আত্মীয়-প্রীতি অচলা ছিল। তিনি বিধর্ম্মী হইলেও তাঁহার স্নেহময়ী জননী ও প্রাণপ্রিয় ভ্রাতা ভগ্নীদিগকে ভুলিতে পারেন নাই। অর্থ সাহায্য ও লোক বলের দ্বারা তিনি সর্ব্বদা তাঁহাদের সেবা করাইতেন। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া হিন্দুসমাজ পর্য্যন্ত তাঁহাকে সকল কার্য্যে আপনাদের মুখপাত্র নিযুক্ত করিতেন। এইরূপে তিনি সকলের নিকট আদর ও সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইয়া সম্মানের সহিত কাল কাটাইয়া ছিলেন।

সদনুষ্ঠানমাত্রেই কৃষ্ণমোহনের উৎসাহ ছিল। তিনি বিপত্নীক হইয়া বৃদ্ধ বয়সেও যুবার মত কার্য্য করিতেন। তিনি দেশীয় সমাজের কল্যাণকর প্রত্যেক সভা সমিতিতে উপস্থিত হইয়া সভ্যগণকে সন্নীতি ও পাপপুণ্যের ফলাফল-জ্ঞান দান করিতেন। তিনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইলেও উক্ত ধর্ম্মের

অসারভাগ ত্যাগ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম হইতে সার ভাগ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ফলতঃ তিনি এক জন প্রকৃত সত্যানুসন্ধায়ী ছিলেন, এবং তিনি বড় স্বাবলম্বনপ্রিয় ছিলেন। বালককাল হইতেই তিনি আত্ম-নির্ভরতা অবলম্বন করিয়া বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত উক্তভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। কি ধর্ম্ম বিষয়ে, কি সমাজ বিষয়ে, কি সাহিত্য বিষয়ে, কি আচার ব্যবহারে, সকল কার্য্যেই তাঁহার স্বাবলম্বনপ্রিয়তার প্রচুরতম দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়।

তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা দয়া মায়া ও ভালবাসাতে পূর্ণ থাকিত। যথার্থই তিনি সর্ব্বগুণাধার ছিলেন। দীনে দান তাঁহার নিত্য ক্রিয়া ছিল। অন্না-ভাবে দরিদ্রের করুণ ক্রন্দন তাঁহার কর্ণগোচর হইলে, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিতেন না। এরূপ ক্রন্দন তাঁহার বড়ই মর্ম্মস্পর্শী হইত। প্রকৃত দাতার হৃদয়, যশঃপ্রয়াসী দাতার হৃদয় হইতে স্বতন্ত্র। তিনি গোপনে দীন দুঃখীকে অন্ন, বস্ত্র ও অর্থ দান করিয়া চরিতার্থতা লাভ করিতেন। পাপ কার্য্য ও কুচরিত্রের প্রতি তাঁহার বড় ঘৃণা ছিল। দুশ্চরিত্র ব্যক্তি উচ্চপদস্থ হইলেও তাহার ছায়া স্পর্শ করিতে, আপনাকে অবমানিত বোধ করিতেন। তিনি সর্ব্বদাই কি সামাজিক কি নৈতিক সকল বিষয়েরই অসদ্ভাগ পরিত্যাগ করিয়া সদ্ভাগ গ্রহণ করিতেন। তিনি জীবনে কথনও মদ্যপান করেন নাই। মদ্যপায়ী ও ব্যসনী ব্যক্তিকে তিনি নরপশু বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন।

তিনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাঁহার হৃদয়ে আর্য্য ঋষির মত ধর্ম্মভাব বিদ্যমান ছিল। সে ধর্ম্মভাব জ্যোতিষ্মান্ অঙ্গারাবৃত মরকত সদৃশ। তিনি অন্তরের সহিত ভগবান্‌কে ডাকিতেন, এবং সেই জগৎপতির ভাবে বিভোর হইয়া সতত তাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। তিনি প্রকৃত হৃদয়বান্ ধার্ম্মিকের ন্যায় সকল কর্ম্মের প্রারম্ভেই, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ একেশ্বরের উপাসনা করিতেন। হিন্দুর চক্ষে তাঁহার ধর্ম্ম ঘৃণিত হইলেও

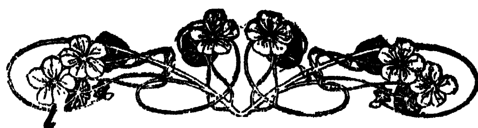
তাঁহার ধর্ম্ম ভাব অতি মহৎ ছিল। তিনি অতি নম্র, নিরহঙ্কার, নির্ভীক এবং ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন বলিয়া, সকলেই তাঁহাকে বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি চিরদিন দেবগুরু বৃহস্পতির ন্যায় পূজিত হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণমোহনের আর একটী গুণ ছিল—তিনি মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়ী ছিলেন। বাল্যকালের অনশন ক্লেশে তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, পরিমিতব্যয়ী হইয়া কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখা মনুষ্য-জীবনে অতি আবশ্যক। সঞ্চিত অর্থ অসময়ের বন্ধু। তিনি মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়ী ছিলেন বলিয়া যথাসাধ্য দান করিয়াও শেষকালে ষষ্ঠিসহস্র মুদ্রার "কোম্পানির কাগজ" এবং কলিকাতা ও হাওড়ায় কতকগুলি বাটী রাখিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। বাটীর ভাড়া ও কোম্পানির কাগজের সুদে তাঁহার শেষজীবন সুখে কাটিয়াছিল। শেষ বয়সে কর্ম্ম ত্যাগ করিবার পরও তিনি এক সহস্র টাকা বার্ষিক পেনসন পাইতেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষক হইয়া তিনি বৎসরে দুই সহস্র করিয়া টাকা পাইতেন। এতদ্ভিন্ন তিনি বিলাত প্রত্যাগত সিভিলিয়ানদিগের দেশীয় ভাষার পরীক্ষক হইয়া মাসিক দুই শত টাকা বৃত্তি পাইতেন। কাঙ্গালী কৃষ্ণমোহন সচ্চরিত্রতা ও সঞ্চয়ের গুণে বিপুল অর্থশালী হইয়াছিলেন। এরূপ আদর্শ জীবন প্রত্যেকের হৃদয়ে চিত্রিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

মৃত্যু।

কৃষ্ণমোহন শেষ জীবন পর্য্যন্ত স্বদেশের উন্নতির জন্য ক্রমাগত পরিশ্রম করিয়া হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইলেন। এই কঠিন পীড়া হইতে তিনি আর নিষ্কৃতি পাইলেন না। মৃত্যুর দুই তিন মাস পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে তাঁহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইত। কত চিকিৎসা হইল, কত ঔষধ সেবন করান হইল, কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। ১৮৮৫ খৃঃ ১১ই মে

সোমবার বৈশাখের কালরাত্রিতে ৭২ বৎসর বয়সে ৭নং চৌরঙ্গী লেনে তাঁহার জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল। এ প্রজ্জ্বলিত দীপ নির্ব্বাণের প্রকৃত হেতু সমগ্র জীবনের কঠোর পরিশ্রম। যে পরিশ্রমের গুণে তাঁহার এত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সেই পরিশ্রমই আজ তাঁহার কাল স্বরূপ হইল। বালককালের নির্য্যাতন ক্লেশ হইতে বৃদ্ধবয়সের উন্নতি ও সুখ্যাতির সৌধ-মন্দিরে অবস্থিতি পর্য্যন্ত, তিনি দেশহিতকর নানা কার্য্য করিতে করিতে অনন্ত পিতার অনন্ত ক্রোড়ে শয়ন করিলেন। কৃষ্ণতুরঙ্গম চালিত, কৃষ্ণ শকটাভ্যন্তরে কৃষ্ণবসন মণ্ডিত, কৃষ্ণমোহনের শব শিবপুরে ভাগীরথী-তীর সংস্থাপিত সমাধি স্থানে সমাহিত হইল। যথায় তাঁহার জীবনসঙ্গিনী সপ্তদশবর্ষ পূর্ব্বে সমাধিস্থ হইয়া প্রাণপতির জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, তথায় আজ দুটি আত্মা একত্রে মিলিত হইয়া পরমাত্মায় মিশিয়া গেল। তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ প্রচারিত হইলে চতুর্দ্দিক্ হইতে সকল জাতীয় লোক সমবেত হইয়া তাঁহার গোরস্থানের নিকটে যাইয়া গগনভেদী হাহাকার ধ্বনিতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। সংবাদ পত্রে শোকোচ্ছ্বাসের প্রবাহ বহিয়াছিল। এরূপ সর্ব্বব্যাপী দুঃখব্যঞ্জক শোকসন্তাপ অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। তাঁহার জন্য চতুর্দ্দিকে নানা শোক-সভা হইয়া সাধারণের অর্থে একখানি তৈল চিত্র প্রস্তুত হয়। ইহা টাউন হলের দ্বিতলে রক্ষিত হইয়াছে। এই সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করিলে দেবঋষি বলিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তির উদ্রেক হইয়া থাকে।





মহানুভব প্যারীচাঁদ মিত্র। (২০৩ পৃঃ

(টেকচাঁদ ঠাকুর।)



মহানুভব প্যারীচাঁদ মিত্র।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক বৎসর পরে বঙ্গের অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশের একটী উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে এই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথম সমাজ সংস্কারক দলের একজন অগ্রণী ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় ইনিই প্রথম উপন্যাস রচনা করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। স্বদেশের কল্যাণ কামনা তাঁহার কার্য্যময় জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। ১৮১৪ খৃঃ শ্রাবণ মাসে কলিকাতায় নিমতলার মিত্র বংশে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি পিতার চতুর্থ পুত্র ছিলেন, পিতার নাম রাম নারায়ণ মিত্র।

রাম নারায়ণ পুত্রকে প্রথমে গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা করিতে দেন। পাঠশালার বিদ্যা শেষ করিয়া তিনি পারস্য ভাষা শিখিতে লাগিলেন। সে সময়ে আদালতে পার্সী ব্যবহৃত হইত, তজ্জন্য তখন পার্সীর কিছু অধিক আদর ছিল। তৎপরে রাম নারায়ণ আত্মীয় স্বজনের পরামর্শে ১৮২৯ খৃঃ জুলাই মাসে পুত্রকে হিন্দুকলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে মেধাবী প্যারীচাঁদ প্রত্যেক বৎসরই পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে লাগিলেন। শেষে যখন তিনি প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন, তখন প্রতিমাসে ১৬৲ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতেন। ইনি পাঠদ্দশায় স্যারজন পিটার গ্র্যাণ্ট প্রদত্ত পুরস্কার লাভ করেন। এই পুরস্কার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখককে প্রদত্ত হইত।

ইঁহার হৃদয়ে জনহিতৈষণা স্বভাবতঃ এরূপ প্রবল ছিল যে, কলেজে ইংরাজী শিখিতে শিখিতে সাধারণের সুবিধার জন্য তিনি নিজবাটীতে একটী অবৈতনিক ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত মিঃ হেয়ার ও ডিরোজিও সাহেব এই বিদ্যালয়ের পরিদর্শক এবং তাঁহার সহাধ্যায়ী বন্ধু রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার ও শিবচন্দ্র দেব অবৈতনিক শিক্ষক ছিলেন।

মেটকাফ্ হল।

১৮৩৫ খৃঃ কলেজের শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর ডেপুটী লাইব্রেরিয়ান পদে নিযুক্ত হন। ঐ বৎসরেই এই লাইব্রেরী স্থাপিত হয়। ইহা কিছুদিন এসপ্লানেড রোডস্থ ডাক্তার ষ্ট্রঙ্গের বাটীর নিম্নতল গৃহে অবস্থিত ছিল। তৎপরে কিছু দিনের জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাটীতে উঠিয়া যায়। পরে যখন স্যার চার্লস্ মেটকাফের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য সাধারণের চেষ্টায় ও সংগৃহীত অর্থে বর্ত্তমান মেটকাফ্ হল নির্ম্মিত হয়, তখন ইহা ১৮৪৪ খৃঃ নূতন বাটীতে উঠিয়া আসে। প্যারীচাঁদ মেটকাফ্ হল নির্ম্মাণের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতে অম্লান বদনে দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনি এই লাইব্রেরীতে ২৩ বৎসর কাল অতি সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করেন। তাঁহার যত্ন ও পরিশ্রমে এই লাইব্রেরীর অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হইয়াছিল। তিনি ডেপুটী লাইব্রেরিয়ান হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে লাইব্রেরিয়ান, সেক্রেটারী, পরে কিউরেটর হন।

এই লাইব্রেরী হাতে পাইয়া তিনি আপনার জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য গভীর গবেষণার সহিত নানাবিধ পুস্তক পাঠ করিতেন। ইহার দ্বারা তাঁহার অতৃপ্ত জ্ঞান স্পৃহা পরিতৃপ্তির বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছিল। তিনি জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া জ্ঞান বিতরণের জন্য বন্ধুবর রসিক কৃষ্ণ মল্লিকের

সহিত মিলিত হইয়া "জ্ঞানান্বেষণ" নামক পত্রিকা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তৎপরে রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি একত্র হইয়া "বেঙ্গল স্পেক্টেটর" নামক এক সংবাদ পত্র বাহির করিলেন। ইহার দ্বারা এদেশে লোকের মনের ভাব যেন নূতন-তর হইল। বহুকাল নিদ্রার পর যেন দেশে চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। ইংরাজী শিক্ষার উজ্জ্বল জ্যোতিতে লোকের অজ্ঞানাচ্ছন্ন হৃদয়-কন্দরকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। প্যারীচাঁদ আপনার জ্ঞান চর্চ্চা করিলেও লাইব্রেরীর কার্য্যে তাঁহার কিছুমাত্রও অমনোযোগিতা ছিল না। তাঁহার মনে স্বাধীন ব্যবসার ইচ্ছা বলবতী হওয়ায় ১৮৬৭ খৃঃ তিনি লইব্রেরীর কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন।

কর্ম্মজীবন।

লাইব্রেরীর কর্ম্ম করিতে করিতে তিনি কালাচাঁদ শেট ও তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর সহিত মিলিত হইয়া বহির্বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলেন। বিদেশে নানাবিধ দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিলেন। প্যারীচাঁদ অত্যন্ত সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন, তজ্জন্য তিনি সকলকে অযথা বিশ্বাস করিতেন। ইহার ফলে বিদেশীয় এজেণ্টগণ তাঁহাকে প্রতারণা করিতে লাগিল। সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই ব্যবসায় তাঁহার অর্থ নষ্ট হইল। ইহাতে তিনি ভগ্নোদাম না হইয়া ১৮৫৫ খৃঃ তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর মৃত্যু হইলে আপনার দুই পুত্রকে অংশীদার করিয়া নিজে একটী স্বতন্ত্র কারবার খুলিলেন। ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট উন্নতি হইতে লাগিল। তাঁহার সদ্ব্যবহারে ও সত্য-পরায়ণতায় মুগ্ধ হইয়া ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়ের এমনি বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তিনি একাদিক্রমে অনেক গুলি অফিসের ডাইরেক্টরের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

তিনি গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল কোং, বেঙ্গল টি কোং, ডরং টি কোং, ল্যাণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট কোং, পোর্ট ক্যানিঙ্ প্রভৃতি অনেক কোম্পানির ডাইরেক্টর মনোনীত হন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি এতগুলি অফিসে যোগদান করিয়াও অন্তরের সহিত সকলের উন্নতির জন্য যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম করিতেন। তাঁহার কার্য্যের শক্তিও অদ্ভুত ছিল। প্রৌঢ়াবস্থাতেও তিনি সোসিয়াল সায়েন্স এসোসিয়েসন, এগ্রিহার্টিকাল-চারাল সোসাইটী, ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটী, স্কুলবুক সোসাইটী, প্রভৃতি বহু সমিতির সভ্য ছিলেন। এতদ্ভিন্ন দেশহিতকর প্রায় প্রত্যেক সভাতে তিনি আন্তরিক ইচ্ছার সহিত যোগদান করিয়া নের্তৃত্ব করিতেন। কিসে স্বজাতির উন্নতি হইবে, কিরূপে বিদ্যার বিমল জ্যোতি লোকের অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়কে আলোকিত করিবে, এইরূপ আলোচনা করিয়া তিনি সভাস্থ সমবেত জনমণ্ডলীকে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত করিতেন। তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া তদানীন্তন লেঃ গভর্ণর স্যার উইলিয়ম গ্রে ১৮৬৮ খৃঃ তাঁহাকে বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদে মনোনীত করেন। দুই বৎসর কাল তিনি সম্মান জনক এই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া স্বদেশের কল্যাণকর অনেক কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহারই উৎসাহ ও উদ্যমে ১৮৬৯ খৃঃ পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণী সভার স্থাপনা হইতেই তিনি তাহার একজন উদেযাগী সভ্য ছিলেন। এতদ্বারা তিনি দেশের যেরূপ উপকার করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনাতীত।

ছোটলাট স্যার সেসিল বিডনের উদেযাগে বেলভেডিয়ার উদ্যানে যে কৃষি প্রদর্শনী হইয়াছিল প্যারীচাঁদ তাহার একজন বিচারক ছিলেন। তিনি বিশ্ব বিদ্যালয়ের একজন ফেলো এবং একজন পুরাতন জষ্টিস অফ দি পিস ও অনারারি মেজিষ্ট্রেট ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহারই চেষ্টা ও আগ্রহে বেথুন স্কুল স্থাপিত হয়। তিনি স্ত্রী শিক্ষার অতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি অতিশয় শান্ত ও স্বাধীন প্রকৃতির লোক ছিলেন।

সুপণ্ডিত, সুলেখক, সদালাপী, সৎস্বভাব ও নিরহঙ্কার বলিয়া তাঁহার অতিশয় সুখ্যাতি ছিল। ডেলহাউসির রাজত্ব কালে যখন পুলিসের অত্যাচার অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে, তখন প্যারীচাঁদ ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। তিনি যেরূপ নির্ভয়ে ও দক্ষতার সহিত পুলিসের অত্যাচার কাহিনী বিবৃত করেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি সাধারণের অনুরাগ আকৃষ্ট হয়। তাঁহার দেশ-হিতৈষিতা বর্ত্তমানের ন্যায় কেবল বাক্যময় ছিলনা। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে প্রাণপণে যথার্থরূপে দেশের হিতসাধনে ব্রতী ছিলেন। ব্যক্তি বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি তাঁহার ঘৃণা বা বিদ্বেষ ছিল না।

পুস্তক প্রচার।

অতি অল্প বয়স হইতেই প্যারীচাঁদ সংবাদ ও সাময়িক পত্রে নানাবিধ প্রবন্ধ লিখিয়া যশস্বী হইয়া উঠেন। পূর্ব্বোল্লিত "জ্ঞানান্বেষণ" ও "বেঙ্গল স্পেক্টেটর" ব্যতীত তিনিই সর্ব্বপ্রথমে "মাসিক পত্রিকা" নামক একখানি বাঙ্গালা পত্র প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। এই সকল সংবাদপত্র ব্যতীত ইংলিসম্যান, বেঙ্গল হরকরা, কলিকাতা রিভিউ, ইণ্ডিয়ান ফিল্ড, হিন্দু পেট্রিয়ট প্রভৃতি পত্রে তিনি নিয়মিতরূপে লিখিতেন। তাঁহার প্রবন্ধগুলি এত সুখপাঠ্য, সময়োচিত ও জ্ঞানগর্ভ যে জমীদার ও রায়ত সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়া বিলাতে হাউস অফ লর্ডস্ পর্য্যন্ত তিনি সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

বঙ্গসাহিত্যে তিনি "টেকচাঁদ ঠাকুর" নামে সাধারণের নিকট পরিচিত। তাঁহার "আলালের ঘরের দুলাল" নামক পুস্তক বঙ্গভাষার প্রথম উপন্যাস। ইহা অতি অপূর্ব্ব ও উপাদেয় গ্রন্থ। চলিত কথায় ও সহজ ভাষায় কিরূপে বাঙ্গালা লিখিতে হয়, কিরূপ লিখিলে স্ত্রীলোক ও বালক পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে, তদ্বিষয়ে তিনিই প্রথম পথ প্রদর্শক। তাঁহার সমসাময়িক

যুগপ্রবর্ত্তক পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও খ্যাতনামা অক্ষয় কুমার দত্তের প্রভাবে যখন বঙ্গভাষা নবজীবন লাভ করিল, তখন তাঁহাদের ভাষাও সংস্কৃত বহুল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সংস্কৃত অলঙ্কারের ছটায় ঈশ্বর গুপ্তের "সংবাদ প্রভাকরেও" উপহাস বিদ্রূপ প্রকাশিত হইত। "জিগীষা" "জিজীবিষা" প্রভৃতি শব্দ লইয়া লোকের বাটীতে "চিটুটীমিষা" প্রতিশব্দ যোগ করিয়া হাস্যলহরী উত্থিত হইত। কিন্তু প্যারীচাঁদের পুস্তকে সংস্কৃত শব্দের আড়ম্বর নাই, বর্ত্তমান কালের ন্যায় ইংরাজীর নাম গন্ধও নাই, কেবল বঙ্গভাষার সুললিত শব্দ ও সহজ কথায় সমাজের প্রতি কষাঘাত দৃষ্ট হয়। তৎপরে তিনি "অভেদী" "কৃষিপাঠ" "যৎকিঞ্চিৎ" প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশ করিলেন। তিনি "মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়" নামক একখানি বিদ্রূপাত্মক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া সাধারণের বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন।

স্ত্রীলোকদিগের জ্ঞানালোক বিকীর্ণ করিবার জন্য তিনি "বামাতোষিণী" "রামারঞ্জিকা", "আধ্যাত্মিকা" ও "এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা" প্রভৃতি কতকগুলি স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক এবং "ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত" ও "গীতাঙ্কুর" প্রণয়ন করেন। তাঁহার পুস্তকের ভাষা সেই সময়ে বঙ্গসাহিত্যে নবযুগ আনয়ন করিয়াছিল। ইহা আড়ম্বর শূন্য, সহজ ও সুখপাঠ্য হওয়ায় সকলেই ইহাকে "আলালী ভাষা" বলিত। এতদ্ভিন্ন তিনি ইংরাজীতে "আত্মা ও আধ্যাত্মবাদ" সম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তক এবং রামকমল সেন ও কোলস্ ওয়ার্দি গ্রাণ্ট সাহেবের জীবন চরিত লিখিয়াছিলেন। হেয়ার প্রাইজ ফণ্ডের তিনি একজন প্রবর্ত্তক। হেয়ারের মৃত্যু তিথিতে বাৎসরিক সভায় তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। সঙ্গীত শাস্ত্রেও প্যারীচাঁদের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইঁহার রহস্য-প্রিয়তা শেষবয়স পর্য্যন্ত সমভাবে বিদ্যমান ছিল। লোকের প্রীতি আকর্ষণ করিতে তাঁহার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল।

মাতৃভক্তি।

প্যারীচাঁদের মাতৃভক্তি অসাধারণ ছিল। মাতৃভক্তির গুণে ও মাতার আশীর্ব্বাদে তিনি ইহ জগতে এত উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। প্রত্যহ প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া মাতার পাদোদক পান না করিয়া তিনি কোন কার্য্য করিতেন না। মাতা ও গুণবতী ভার্য্যার গুণে তাঁহার সংসারে সুখ ও শান্তির প্রবাহ বহিয়াছিল। তিনি খড়দহের প্রসিদ্ধ প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার ৮ পুত্র ও ৩ কন্যা জন্মে। ১৮৬০ খৃঃ তাঁহার সহধর্ম্মিনী ৪ পুত্র ও ২ কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। স্ত্রী বিয়োগের পর হইতেই তাঁহার মন ধর্ম্মের দিকে প্রধাবিত হয়। আত্মার স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ণয়ের নিমিত্ত তিনি নানাবিধ ইংরাজি ও সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়া জ্ঞান লাভ করেন। এই সময় হইতে তাঁহার প্রেত তত্ত্বে বিশ্বাস জন্মে। তাঁহার বাল্য সুহৃদ্ ও বৈবাহিক শিবচন্দ্র দেব প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে একজন প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। দুই বৈবাহিকে মিলিয়া সর্ব্বদা ইহার আলোচনা করিতেন। প্রাচীন বয়সে প্যারীচাঁদ প্রেততত্ত্বানুশীলনেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। কথিত আছে প্রেততত্ত্বে যখন তিনি অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তখন তাঁহার স্ত্রীর প্রেতাত্মা স্থূল শরীর ধারণ করিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত কথা বার্ত্তা কহিতেন। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বাস ক্রমে শিথিল হয়। শেষে তিনি একেশ্বর-বাদী হন। কিন্তু তিনি কোন সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন না।

শেষ জীবন।

১৮৮২ খৃঃ মাডাম ব্লাভাট্‌স্কি এবং কর্ণেল অলকট যখন এ দেশে থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন, সেই সময় প্যারীচাঁদ ইঁহাদের দল-ভুক্ত হন; তখন তিনি "ব্যানার অফ লাইট", "লাইট" ও "স্পিরিচুয়ালিষ্ট"

পত্রিকায় নানা প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি আমেরিকা ও বিলাতের প্রেততত্ত্ব বিষয়ক পত্রিকাগুলিতেও নিয়মিত ভাবে লিখিতেন। শেষ জীবনে তিনি মৎস্য মাংস পরিত্যাগ করিয়া ফল মূলাহারী যোগী সন্ন্যাসী হন। যোগ শিক্ষার নিমিত্ত তিনি রাশি রাশি সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করেন। কোন কোন দিন তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিতেন। এরূপ অনিয়মে ও শরীরের প্রতি অত্যাচারে তিনি উদরী রোগে আক্রান্ত হইলেন। নানা চিকিৎসাতেও তাঁহার রোগের উপশম হইল না। শেষে ১৮৮৩ খৃঃ ২৩শে নভেম্বর তিনি ৬৯ বৎসর বয়সে তিন পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া দিব্য ধামে গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের যে কি ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা অধুনা আমাদের হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা নাই। তাঁহার জন্য দুইটী শোক সভা আহূত হইয়াছিল। তাঁহার মহত্তর গুণাবলী জনসমাজে স্মরণ রাখিবার জন্য সাধারণের যত্ন ও অর্থে, মেটকাফ্ হলে একখানি অয়েল পেণ্টিং প্রতিকৃতি ও টাউন হলে একটী প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপিত হয়।





বাগ্মিবর রামগোপাল ঘোষ।

(২১১ পৃঃ)



বাগ্মিবর রামগোপাল ঘোষ।

দুর্ভাগিনী বঙ্গমাতার হীনাবস্থার সময়ে বঙ্গবাসীর ন্যায়সঙ্গত সমস্ত স্বত্ব রক্ষা করিবার জন্য এই মহাত্মার আবির্ভাব হইয়াছিল। ১৮১৫ খৃঃ কায়স্থকুলে বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীটে স্বীয় মাতামহ দেওয়ান রামপ্রসাদ সিংহের ভবনে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ। হুগলী জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ ত্রিবেণী তীর্থের সন্নিকট বাগাটী গ্রামে তাঁহার পৈত্রিক বাসভূমি ছিল। চীনাবাজারে তাঁহার পিতার একখানি সামান্য দোকান ছিল। ঐ দোকানে জাহাজের দড়ি, নোঙ্গর ও শিকল প্রভৃতি বিক্রয় হইত।

গোবিন্দচন্দ্র স্বীয় পুত্র রামগোপালকে সেরবোর্ণ সাহেবের বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ প্রেরণ করেন। রামগোপাল মেধাবী ও পরিশ্রমী ছিলেন। তাঁহার বিদ্যানুরাগ ও শিক্ষাশক্তি দেখিয়া গোবিন্দচন্দ্রের আত্মীয় ও বন্ধুগণ রামগোপালকে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি করিবার পরামর্শ দেন। তখন হিন্দু-কলেজের বেতন পাঁচ টাকারও অধিক ছিল। সুতরাং পিতার এরূপ অর্থ সামর্থ ছিল না যে, তিনি বেতন দিয়া পুত্রকে হিন্দু কলেজে পড়ান। কিং হামিলটন কোম্পানির (King Hamilton & Co.) আফিসে মিষ্টার রজার্স (Mr. Rogers) নামক একজন সাহেব কর্ম্মচারীর সহিত গোবিন্দচন্দ্রের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি রামগোপালের বেতন দিতে

স্বীকৃত হওয়ায় গোবিন্দচন্দ্র পুত্রকে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। তখন তাঁহার বয়স দশ বৎসর মাত্র। মেধাবী রামগোপাল আপনার প্রতিভাবলে শীঘ্রই শিক্ষকগণের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার পাঠে মনোযোগ ও অসাধারণ মেধা দেখিয়া মহামতি হেয়ার সাহেব তাঁহাকে ত্বরায় অবৈতনিক ছাত্রদলে প্রবিষ্ট করিয়া লইলেন। এই সময়ে বিদ্যালয়ে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো, রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতির সহিত তাঁহার সখ্য হয়। ক্রমে রামগোপাল বিখ্যাত ডিরোজিওর শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। রামগোপালের আশ্চর্য্য ধীশক্তির পরিচয় পাইয়া ডিরোজিও তাঁহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। ছুটীর পর তিনি রামগোপালকে রসেল, লক, ষ্টিওয়ার্ট, সেক্সপিয়ার, মিলটন প্রভৃতি দর্শনকার ও সুকবিগণের গ্রন্থ সকল পাঠ করাইতেন। তাঁহার সুন্দর শিক্ষার গুণে রামগোপালের ইংরাজীতে ব্যুৎপত্তি, স্বাধীন চিন্তা ও তর্ক-শক্তির স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল। ডিরোজিও ক্লাবের রামগোপাল প্রভৃতি ছাত্রগণ এই সময় হইতে হিন্দু আচারের সীমা উল্লঙ্ঘন করেন।

ডিরোজিওর বিষয় ১৯১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। হিন্দু কলেজ হইতে তিনি পদচ্যুত হইলে, তাঁহার দলের অধিকাংশ ছাত্র সেই সময় কলেজ ছাড়িয়া দেন। রামগোপালও কলেজ ছাড়িয়া কাজ কর্ম্মের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মিষ্টার জোসেফ নামক এক জন ধনবান্ য়িহুদী বাণিজ্য করিবার জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। কলভিন কোম্পানীর অধ্যক্ষ এণ্ডারসন সাহেবের নিকট, তিনি এক জন ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ উৎকৃষ্ট বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর প্রার্থনা করেন। এণ্ডারসন্ মহামতি হেয়ার সাহেবের নিকট এক জন উপযুক্ত ও বিশ্বস্ত ছাত্রকে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ডেভিড হেয়ার রামগোপালকে উপযুক্ত জ্ঞানে তথায় পাঠাইয়া দিলেন। ১৭ বৎসর বয়সে ১৮৩২ খৃঃ রামগোপাল জোসেফ সাহেবের আফিসে ৪০৲ টাকা বেতনে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলেন।

কর্ম্ম জীবন।

হিন্দু কলেজের সমগ্র পাঠ শেষ না করিয়াই রামগোপালকে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইল। অফিসে কর্ম্ম করিলেও তিনি বিদ্যার বিমল জ্যোতিঃ বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। য়িহুদিগণের বিশ্রাম দিন প্রতি শনিবারে তিনি হিন্দু কলেজের প্রথম শ্রেণীতে আসিয়া ছাত্রগণের সহিত সমভাবে শিক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময় মাণিকতলায় শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগান বাটীতে "একাডেমিক এসোসিয়েসন" (Academic Association) নামক একটী সাহিত্য আলোচনার সভা সংস্থাপিত হয়। তিনি নিয়মিতভাবে তথায় উপস্থিত হইয়া তর্ক বিতর্ক ও বক্তৃতা অভ্যাস করিতেন। এই স্থানেই তাঁহার বক্তৃতাশক্তির প্রথম বিকাশ হয়। তিনি ওজস্বী ও হৃদয়গ্রাহী ইংরাজী ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করিতে শিখিলেন। এই সভা তৎকালে অতিশয় প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। ডিরোজিও সাহেব ইঁহার সভাপতি ছিলেন। গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিকের প্রাইভেট সেক্রেটারী কর্ণেল বেন্সন (Colonel Benson) সর্ব্বদা এই সভায় যোগ দিতেন। অফিসে কর্ম্ম করিলেও রামগোপাল নিজের যত্ন ও চেষ্টায় একজন প্রতিভাশালী অসাধারণ বিদ্বান্ ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন।

মিঃ জোসেফ যেরূপ লোক খুঁজিয়া ছিলেন, তিনি তদ্রূপ মনের মত লোক পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন। রামগোপালের বিদ্যা, বুদ্ধি, শ্রমশক্তি, কার্য্যদক্ষতা প্রভৃতি গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পদবৃদ্ধি করিয়া দিলেন। তিনিও সর্ব্বদা পরিশ্রম ও মনোযোগসহকারে প্রভুর কার্য্য সম্পাদন করিতেন; এবং অবসর পাইলেই কাব্য, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান ও দর্শন-শাস্ত্রসমূহের আলোচনা করিয়া সময় ক্ষেপণ করিতেন। কিয়দ্দিবস পরে মিঃ জোসেফ রামগোপালের উপর অফিসের ভারার্পণ করিয়া বিলাত গমন

করিলেন। তিনি এমন সুন্দরভাবে অফিসের কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন যে মিঃ জোসেফ বিলাত হইতে আসিয়া রামগোপালের উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপনার হাউসের সর্ব্বময় কর্ত্তা করিয়া দিলেন।

কিছুকাল পরে মিষ্টার কেলসেল (Kelsall) নামক অপর এক ধনী, জোসেফের সহিত যোগ দিয়া অংশীদার হইলেন। রামগোপাল তাঁহাদের মুচ্ছুদ্দি হইলেন। এইরূপে পদবৃদ্ধিসহকারে তাঁহার ধন ও মান বাড়িতে লাগিল। ক্রমে তিনি ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিলেন। কিয়দ্দিবস পরে জোসেফ ও কেলসেল উভয়ের মধ্যে মনোবিবাদ উপস্থিত হইল। তখন রামগোপালকে লইয়া কেলসেল স্বতন্ত্র বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সাহেব রামগোপালকে এত ভাল বাসিতেন যে, তাঁহাকে আপনার অংশীদার করিয়া Kelsall Ghose & Co. নাম দিয়া কারবার চালাইতে লাগিলেন। এইভাবে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল, কিছুদিন পরে ১৮৪৮ খৃঃ রামগোপাল দুই লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়া নিজে R. G. Ghose & Co. নাম দিয়া স্বতন্ত্রভাবে সওদাগরী কাজ চালাইতে লাগিলেন। এই সময় তিনি আকায়াবে একটী কুটী স্থাপন করিয়া আরাকান দেশোৎপন্ন চাউল আমদানী করিতে লাগিলেন। ইহা দ্বারা তিনি ঐশ্বর্য্যশালী হইতে লাগিলেন।

ন্যায়পরায়ণতা।

তৎকালে বণিক্ সম্প্রদায়ের মধ্যে রামগোপালের ন্যায় বিদ্বান্, সত্যবাদী ও ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি অতি বিরল ছিল। অন্যূন দশ বৎসর কাল তাঁহার বাণিজ্য কার্য্য উত্তমরূপ চলিয়াছিল। তৎপরে কোন অনিবার্য্যকারণবশতঃ একবার তাঁহার ব্যবসায়ের সঙ্কটকাল উপস্থিত হয়। সেই সময় দেউলিয়া হইয়া অনেক বণিক্‌কে অফিসের কাজ বন্ধ করিতে হইয়াছিল। রামগোপালও সেই গোলযোগে পড়িয়াছিলেন। তিনি

প্রাপ্য টাকার বিল বিলাতের বণিক্‌দিগের নিকট পাঠাইয়া ছিলেন; কিন্তু সাহেবেরা দেউলিয়া হইয়া পড়ায়, অনাদায় হেতু রামগোপালের এমন অবস্থা হইয়াছিল, যে মহাজনদিগের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিতে হইলে তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। সেই সময়ে তাঁহার বন্ধুদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে বিষয়সম্পত্তি বেনামী করিতে পরামর্শ দেন। কিন্তু রামগোপাল ঘৃণার সহিত প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন—"আমার সর্ব্বস্ব যায় সেও ভাল, ঋণ পরিশোধের জন্য যদি পরিধেয় বস্ত্রও বিক্রয় করিতে হয় তাহাও করিব, কিন্তু উত্তমর্ণদিগকে প্রতারণা করিতে পারিব না।" তিনি ঋণ পরিশোধের বিষয়ে অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। এই সাধুতার গুণে ভগবান্ তাঁহার প্রতি সদয় হইয়াছিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহাকে সেবারে কিছুমাত্র লোকসান দিতে হয় নাই। তাঁহার ন্যায়পরায়ণতার জন্য বাজারে এমনি বিশ্বাস ছিল যে, ইঁহার মুখের কথায় লোকে লক্ষ টাকা দিতেও কুণ্ঠিত হইত না। সকলকার এই বিশ্বাস ছিল যে, পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হইলেও রামগোপাল কাহাকেও ঠকাইবে না।

সহৃদয়তা ও ন্যায়পরায়ণতার ন্যায় তাঁহার পরোপকারেচ্ছা এবং স্বদেশপ্রীতি অতি প্রবল ছিল। কিরূপে দেশের উন্নতি হইবে, কিরূপে গভর্ণমেণ্টের সুশাসন বর্দ্ধিত হইবে, কিরূপে ভারতবাসী উচ্চ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইবে, কিরূপে দেশে শিক্ষার বিস্তার হইবে, এই সকল বিষয় লইয়া তিনি সর্ব্বদা বক্তৃতা ও লেখনী সঞ্চালন দ্বারা আন্দোলন করিতেন। প্যারীচাঁদের জ্ঞানান্বেষণ ও বেঙ্গল স্পেক্টেটর (Bengal Spectator) পত্রে তিনি এই সকল বিষয় লইয়া নানা প্রবন্ধ লিখিতেন। ডিরোজিও ক্লাবের বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া তিনি ১৮৩৮ খৃঃ রাজনীতি প্রভৃতি চর্চ্চার জন্য, "সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জন সভা" (Society for the Acquisition of General Knowledge) নামে সভা স্থাপন করিলেন। এই সভা দ্বারা তিনি স্বনামধন্য মহাপুরুষ হইয়াছিলেন।

বক্তৃতা।

উক্ত সভায় তিনি বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার বক্তৃতায় দেশের অনেক কাজ হইত। ১৮৪২ খৃঃ দ্বারকানাথ ঠাকুর, সুপ্রসিদ্ধ জর্জ্জ টমসন নামক প্রসিদ্ধ বক্তাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত হন। টমসনের অগ্নিময় বক্তৃতায় কলিকাতা যেন বৈদ্যুতিক শক্তিতে নৃত্য করিতে লাগিল। রামগোপাল প্রভৃতি ডিরোজিওর শিষ্যগণ তাঁহাকে আবেষ্টন করিলেন। রামগোপাল সেই বৈদ্যুতিক বক্তৃতালোকে বুঝিলেন, যে বক্তৃতা ভিন্ন লোকের মন আকৃষ্ট করিবার আর অন্য উপায় নাই। তখন তিনি জর্জ টমসনের সহিত মিলিত হইয়া জ্ঞানোপার্জ্জন সভাতে বজ্র নির্ঘোষে নানাবিধ বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। ক্রমে রামগোপালের বক্তৃতায় যেন বৈদ্যুতিক অগ্নির সৃষ্টি হইতে লাগিল। তাঁহার বক্তৃতার দুইটা কথা শুনিবার জন্য দলে দলে লোক সকল আগমন করিত। তাঁহার বক্তৃতা সামরিক তোপ্‌ধ্বনির ন্যায় উন্মাদকারী ছিল। এইরূপে প্রসিদ্ধ বাগ্মী রামগোপাল স্বীয় বাগ্মিতার বলে সমাজে অনেক সৎকার্য্য করিতে লাগিলেন। সামাজিক, রাজনীতিক, সাহিত্য সম্বন্ধীয়, যে কোন অনুষ্ঠান হউক না কেন, সর্ব্বস্থানেই রামগোপাল উপস্থিত হইয়া জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করিতে লাগিলেন। টমসনের পরামর্শে তাঁহাদের সভা "Bengal British India Society"তে পরিণত হইল। উক্ত সভাই বর্ত্তমান "British Indian Association"এর জননী।

কার্য্য বিবরণ।

১৮৪১ খৃঃ ১৭ই জুন কাশীম বাজারের রাজা কৃষ্ণনাথের আহ্বানে মেডিকেল কলেজে এক সভার অধিবেশন হয়। এই সভাতে মহামতি হেয়ার সাহেবের একটী প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণের প্রস্তাব হয়। ইহাতে অনেকে ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। কিন্তু বাগ্মিবর রামগোপাল উদ্যোগী

হইয়া নিজের এক মাসের আয় দিয়া এবং হেয়ার সাহেবের ছাত্রগণকে এক এক মাসের আয় দিবার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহার বক্তৃতার জোরে অনেকে এই সদনুষ্ঠানে যোগ দিয়া অর্থ সাহায্য করিয়া ছিলেন। সেই সংগৃহীত অর্থে হেয়ার সাহেবের শ্বেত প্রস্তর মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে ইহা সংস্কৃত কলেজের প্রাঙ্গণে স্থাপিত হয়, তৎপরে প্রেসিডেন্সি কলেজ নির্ম্মিত হইলে, তাহার প্রাঙ্গণে রাখা হইয়াছে। সুতরাং রামগোপালের চেষ্টাতেই হেয়ার সাহেব অদ্যাবধি অমর হইয়া রহিয়াছেন।

১৮৪৭ খৃঃ ২৪শে ডিসেম্বর কলিকাতা টাউন হলে গভর্ণর হার্ডিঞ্জের স্মৃতি রক্ষার্থ এক সভা হয়। ইহাতে Tuston, Hume, Colville প্রভৃতি কতকগুলি বাগ্মী-প্রধান ইংরাজ ব্যারিষ্টার প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি স্থাপনের বিরোধী হইয়া দণ্ডায়মান হন। হার্ডিঞ্জ এদেশে শিক্ষা বিস্তারের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামগোপাল তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা যখন দেখিলেন যে প্রস্তাবটী পণ্ড হয়, তখন রামগোপাল প্রজ্বলিত অগ্নিসম অদ্ভুত বক্তৃতা দ্বারা সমগ্র সভাকে স্তম্ভিত করিয়া দিলেন। ইংলিসম্যান প্রভৃতি সংবাদ পত্রে বাহির হইল যে—"বাঙ্গালায় একজন ডিমস্থিনিস আবির্ভূত হইয়াছেন, তিনি কতিপয় সুদক্ষ ব্যারিষ্টারকে ধরাশায়ী করিয়াছেন।" যাহা হউক রামগোপালের বক্তৃতার ফলে হার্ডিঞ্জ সাহেবের অশ্বারোহী মূর্ত্তি গভর্ণমেণ্ট হাউসের সম্মুখস্থ ময়দানে অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে।

পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় ইংরাজগণের বিচার কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টেই হইত। ঐ সকল ইংরাজদিগের মোকদ্দমা ফৌজদারী আদালতের দণ্ডবিধির অধীন করিবার জন্য ১৮৪৯-৫০ খৃঃ বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভাতে একটী আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়। এ দেশীয়দিগকে ইংরাজগণের অত্যাচার হইতে রক্ষা করাই ঐ আইনের উদ্দেশ্য ছিল। ইহাতে ইংরাজগণ "কালা আইন" (Black Acts) নাম দিয়া ঘোরতর আপত্তি করেন।

তখন দেশের এমনি অবস্থা যে দুইটা কথা বলিবার কেহই ছিল না। কেবল একমাত্র রামগোপাল ঘোষ বজ্রসম ওজস্বিনী বক্তৃতা ও লেখনী ধারণ করিয়া ঐ আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রজ্বলিত অগ্নিসম ভাষা উদ্গিরণ করিতে লাগিলেন। "A few remarks on Certain Draft Acts commonly called Black Acts" এই নাম দিয়া তিনি একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিলেন। ইহার ফলে আইন পাশ হইল, এবং ইংরাজগণ ইঁহার উপর চটিয়া গিয়া তাঁহাকে Agri-Horticultural Societyর সহকারী সভাপতির পদ হইতে বিদায় দিলেন।

১৮৫৩ খৃঃ ভারতবাসীদিগকে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষায় লওয়া উচিত কি না, এই বিষয় লইয়া বিলাতে আন্দোলন উপস্থিত হইলে রামগোপাল টাউন হলে একটী সভা আহ্বান করিলেন। ইহাতে প্রায় দশ সহস্র লোকের সমাগম হয়। রামগোপাল একখানি চেয়ারের উপর দণ্ডায়মান হইয়া সারগর্ভ, সুদীর্ঘ ও সুফলদায়িনী বক্তৃতা করিলে সভাগৃহ প্রশংসাবাদে প্রতিধ্বনিত হইল। স্যার রাধাকান্ত দেব এই সভার সভাপতি ছিলেন। তিনি রামগোপালকে বলিলেন—"তুমি দেশ বরেণ্য ও বঙ্গবাসীর আভরণ, জগদীশ্বরের আশীর্ব্বাদে তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপ চিরকাল স্বদেশের হিতসাধন কর।" বক্তৃতা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া বিলাতে ও দেশ বিদেশে প্রেরিত হইল। তাঁহার সুযুক্তিপূর্ণ সুদীর্ঘ বক্তৃতা পাঠ করিয়া বিলাতের লোকেরা চমকিত হইয়া, সুবিখ্যাত বাগ্মী বার্ক ও সেরিডেনের বক্তৃতার সহিত তুলনা করিতে লাগিলেন। পার্লিয়ামেণ্ট সভায় ইহার আন্দোলন হইয়া ভারতবাসীদিগকে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রবেশাধিকার দেওয়া হইল। উক্ত খৃষ্টাব্দে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনন্দ পুনর্গ্রহণের সময় এক মহা সভা হয়, তখন রামগোপাল উক্ত সভায় এমন ওজস্বিনী বক্তৃতা দেন যে সভা শুদ্ধ লোক তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

১৮৬৪ খৃঃ গভর্ণমেণ্ট নিমতলার বর্ত্তমান শ্মশান ঘাট স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব করেন। অধিকন্তু গঙ্গার জলে সৎকার প্রথা রহিত করিয়া শবদেহ কলে দাহ করিবার প্রস্তাব হয়। ইহাতে দেশ শুদ্ধ লোক বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য রামগোপালের শরণাপন্ন হইলেন। রামগোপাল ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া এক সভা করিয়া বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অদ্ভুত বাক্-পটুতাগুণে গভর্ণমেণ্ট ইহাতে নিরস্ত হন। রামগোপালের মত উপযুক্ত লোক ইহাতে হস্তক্ষেপ না করিলে, আজ আমাদের কোথায় ও কি ভাবে যে শব দাহ করিতে হইত, তাহার স্থিরতা নাই। রামগোপালের বক্তৃতা তৎকালে ওজস্বী, উৎসাহ পূর্ণ ও কার্য্যকারী ছিল। এইরূপ অগ্নিসম বক্তৃতার গুণে তিনি দেশের নানাবিধ সৎকার্য্য করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা আজ কালের ন্যায় কেবল বাক্যময় ও অসার ছিল না।

রামগোপালের একটী মহৎ গুণ ছিল যে তিনি বন্ধুগণের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। তিনি বড়লোক হইলেও স্বীয় ঔদার্য্যগুণে পূর্ব্ববন্ধুগণের সহিত পূর্ব্ববৎ বন্ধুত্বই রাখিয়া ছিলেন। একদিন কেহ না আসিলে স্বয়ং তাঁহার বাটীতে যাইয়া অনুসন্ধান লইতেন। মধ্যে মধ্যে অর্থ সাহায্য করিয়া বন্ধুগণের অভাব দূর করিতেন। তিনি সর্ব্বদা বন্ধুগণের সঙ্গে সদালাপে ও সৎগ্রন্থ পাঠে সুখে সময় অতিবাহিত করিতেন। তিনি কামারহাটী নামক স্থানে একটী উৎকৃষ্ট বাগানে পরম সুখে বাস করিতেন। বন্ধুবর্গকে তথায় নিয়তই ভোজ দিতেন। শারীরিক স্বাস্থ্য বর্দ্ধনার্থ বন্ধু-বান্ধব লইয়া গঙ্গায় "লোটাস" নামক ষ্টিমারে প্রায়ই জল বিহার করিতেন। তিনি মনুষ্য জীবনের উপভোগ্য বিষয় প্রকৃতরূপে ভোগ করিয়াছিলেন। রামগোপাল স্ত্রী শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। ১২৫৬ সালে বালিকা-দিগের জন্য বেথুন বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইলে, তিনি স্বীয় কন্যাকে সামাজিক বাধা অতিক্রম করিয়া ঐ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন।

বদান্যতা।

তাঁহার দান শক্তিও যথেষ্ট ছিল। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪০ হাজার টাকা দান করেন। দাতব্য চিকিৎসালয়ে ২০ হাজার টাকা দেন। বন্ধুগণের নিকট ৪০ হাজার টাকা পাওনা ছিল, তিনি সেই সমস্ত খত পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বন্ধুদিগকে ঋণের দায় হইতে মুক্ত করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তিন লক্ষ মুদ্রার সম্পত্তি রাখিয়া যান। এক লক্ষ মুদ্রা তাঁহার পত্নী ও পরিবারবর্গকে দিয়া যান।

তিনি অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন। মাতার মনস্তুষ্টির জন্য সর্ব্বদা তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতেন। ব্রতপরায়ণা মাতাঠাকুরাণী পুত্রের নিকট যখনি যাহা চাহিতেন, তখনি তিনি তাহা পাইতেন। মাতার মতের বিরুদ্ধে কখনও কোন কার্য্য করিতেন না। তিনি নিষিদ্ধ দ্রব্য ভোজন করিয়াছিলেন বলিয়া একবার ব্রাহ্মণগণ তাঁহার মাতার নৈবেদ্য ফিরাইয়া দেন। ইহাতে জননী ব্যথিত হইয়া পুত্রকে বলিয়াছিলেন যে, এমন পুত্র গর্ভে ধরিয়াছিলাম যে আমার নৈবেদ্য কেহ গ্রহণ করিলেন না। তখন রাম-গোপাল মাতাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া প্রত্যেক নৈবেদ্যের উপর ১৬৲ টাকা দিয়া পুনরায় প্রত্যেক ব্রাহ্মণের বাটী পাঠাইয়া দেন। ব্রাহ্মণগণ রাম-গোপালকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে নৈবেদ্য গ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহার জননী অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সহাস্য বদনে পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। মাতার আশীর্ব্বাদেই তিনি লাট দরবারে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়া ছিলেন, এবং শক্তিশালী বাঙ্গালী রাজ-নীতিকগণের মধ্যে তিনি তৎ-কালে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় বাগ্মী ও মাননীয় ব্যক্তি তৎকালে কেহই ছিলেন না। যাঁহারা দেশের নেতা ছিলেন, ইনি তাঁহাদের মধ্যে প্রধানতম হইয়া দেশ সেবায় জীবন সমর্পণ করিয়া ছিলেন। তিনি কলিকাতা ইউনিভার্সিটির ফেলো, অবৈতনিক মেজিষ্ট্রেট,

পুলিস কমিটির সদস্য, (১৮৪৯ খৃঃ) লণ্ডন ও প্যারিস প্রদর্শনীর ভারতীয় শিল্পজাত সংগ্রহিনী সমিতির সদস্য, চেম্বার অফ কমার্সের সদস্য প্রভৃতি বিবিধপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দেশহিতকর নানাকার্য্য করিয়া গিয়াছেন। বৃদ্ধাবস্থাতে রামগোপাল বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়া একান্তে বাস করিতেন। তখন আত্মীয় স্বজনকে ও স্বীয় বন্ধুবান্ধবকে বিবিধ প্রকারে সহায়তা করা তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল।

মৃত্যু।

তাঁহার একমাত্র প্রিয়তমা কন্যার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তিনি নিজ জীবনাশা এককালে পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করেন। (১২৭৫ সালে) ১৮৬৮ খৃঃ জানুয়ারি মাসে তাঁহার মানব-লীলা সম্বরণ হয়। তাঁহার মৃত্যুতে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট দুঃখ প্রকাশ করিয়া প্যারীচাঁদ মিত্রকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। বাঙ্গালার নানা স্থানে নানা সভা সমিতিতে তাঁহার জন্য শোক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাঁহার অভাবে বঙ্গমাতা যথার্থই পুত্র হারা হইয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন। রামগোপালের অনন্য সাধারণ মনীষা ও মনস্বিতা, অবিচলিত উৎসাহ ও অধ্যবসায়, অপূর্ব্ব বক্তৃতা ও বাক্‌পটুতা, সর্ব্ব বিষয়ে শ্রমশীলতা ও কার্য্য-দক্ষতা যথার্থই গৌরবময় ও আদর্শস্থল ছিল।





বদান্যবর তারকনাথ প্রামাণিক।

বঙ্গমাতার দুঃখ দূর করিবার জন্য যে সময়ে ভগবান্—কৃষ্ণমোহন, প্যারীচাঁদ, রামগোপাল প্রভৃতি কৃতি সন্তানগণকে প্রেরণ করেন, সেই শুভ সম্মিলন সময়ে এই মহাত্মা দানবীররূপে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন। সামান্য লেখা পড়া শিখিয়া অল্প বয়সে বিষয় কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া শরীরের শ্রম, বুদ্ধির প্রখরতা, কর্ম্মে মনোযোগ ও ধর্ম্মপথে মতি রাখিয়া কিরূপে অবস্থার উন্নতি করিতে পারা যায়, ইনি তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া কিরূপে অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে হয়, তাহা ইনি দ্বিতীয় দাতাকর্ণরূপে সকলকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

১২২৩ সালের (১৮১৬ খৃঃ) ৫ই আশ্বিন কলিকাতা কাঁসারি পাড়ায় কংস বণিক কূলে তারকনাথের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম গুরুচরণ প্রামাণিক। তারকনাথ পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন। বাল্যকালে পাঠশালায় সামান্য বিদ্যাশিক্ষা করিয়া দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময় তিনি ব্যবসার কার্য্য শিখিতে আরম্ভ করেন। কলিকাতার চাঁদনীতে তাঁহার পিতার একখানি বাসনের দোকান ছিল, সেই দোকানে তিনি প্রথমে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, ভাল রকম লেখা পড়া না শিখিয়া এত অল্প বয়সে কাজকর্ম্মে প্রবিষ্ট হইলে, প্রায়ই অনেক বালক কুসংসর্গে পতিত হইয়া কুপথের পথিক হয়; কিন্তু তারকনাথের বিশেষ প্রশংসার বিষয় এই যে, তিনি সমস্ত প্রলোভনকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া শ্রম-



বদান্যবর তারক নাথ প্রামাণিক। ১

Queen Pr ss.

পরায়ণ ও কষ্ট সহিষ্ণু হইয়া, দোকানের কাজকর্ম্ম মনোযোগের সহিত করিতে লাগিলেন। কোন প্রকার দোষ তাঁহাকে ধরিতে পারে নাই। পিতা পুত্রের কর্ম্ম প্রবণতা, শিষ্টাচার ও ব্যবসায় বুদ্ধিতে মুগ্ধ হইয়া তথায় আর একখানি দোকান খুলিলেন। তারকনাথ সেই দোকান প্রাণপণ শক্তিতে উত্তমরূপে চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার সহৃদয়তা, সচ্চরিত্রতা ও স্নেহশীলতাগুণে দিন দিন দোকানের উন্নতি হইতে লাগিল। ক্রমে তিনি তথায় তিন চারিখানি বাসনের দোকান খুলিলেন। দেখিতে দেখিতে বড় বাজারে সাত আট খানি দোকান খুলিলেন। নূতন বাজারেও দুইখানি দোকান খুলিলেন। সমস্ত দোকান পর্য্যবেক্ষণ করা একজনের পক্ষে অসম্ভব, তজ্জন্য তিনি ঐ সমস্ত দোকানের অংশীদার লইয়া ছিলেন। তিনি নির্ব্বিরোধী নিরপেক্ষ ও শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন বলিয়া, কোন দোকানে কাহারও সহিত কখন মনোমালিন্য ঘটে নাই, সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক ভাল বাসিত। সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, ধর্ম্মপরায়ণতা ও দায়িত্ব-জ্ঞান তাঁহার হৃদয়ে বড়ই প্রবল ছিল। এই সমস্ত কারণে তিনি শীঘ্রই ঋদ্ধিমান হইয়া উঠিলেন।

১২৫৯ সালে হাবড়া শালিখায় একটী "ডক" অর্থাৎ জাহাজ মেরামতি কারখানা ক্রয় করিলেন। পূর্ব্বে উহা "শ্লিপ ডক" ছিল, তিনি ইহার পরিবর্ত্তে রবার্ট প্রামাণিক নামকরণ করিয়া "গ্রেভিং ডক" করেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা ও শ্রমশক্তির গুণে ডকটীর অবস্থা দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল। এই কার্য্যে তাঁহার প্রতি মাসে প্রায় দশ সহস্র মুদ্রা লাভ হইত। ক্রমে তিনি নিমতলায় কাঠের গোলা খুলিলেন। ইহাতেও তাঁহার বিলক্ষণ আয় হইতে লাগিল। এতদ্ব্যতীত তিনি নানা রকমে আয়ের পথ প্রশস্ত করিতে লাগিলেন। ব্যবসায় কার্য্যে তাঁহার অসীম অধ্যবসায় ছিল। তিনি যে কেবল ব্যবসায় বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের বলে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ছিলেন, তাহা নহে। ঐকান্তিক যত্ন

ও দৃঢ় উত্তম সহকারে সাধুতার গুণে নানা সদনুষ্ঠানে অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। যুবা বয়সে তিনি বিলক্ষণ বলশালী ও শ্রমসহিষ্ণু ছিলেন। তিনি নিজমুখে বলিয়াছিলেন—"কারবারের কার্য্যে আমাকে প্রত্যহ প্রায় দশ ক্রোশ পথ হাঁটিতে হইত।" তিনি তামা ও পিত্তলের চাদর প্রস্তুত করিয়া বিলাতে রপ্তানি করিতেন এবং উক্ত কার্য্যের সুবিধার জন্য, তিনি দুইখানি জাহাজ খরিদ করিয়া ছিলেন। রপ্তানি কার্য্যের জন্য যখন ওজন দিবার চারি পাঁচটা কাঁটা চলিত, তখন কর্ম্মচারী থাকা সত্বেও তিনি অনেক সময় নিজ হাতে কাঁটায় মাল তুলিয়া দিতেন। তাঁহার মনে কোনরূপ অহঙ্কার বা আত্মাভিমান ছিল না। যাহাহউক এইরূপে চতুর্দ্দিকে তাঁহার কার্য্য-বিস্তৃতিতে অজস্র অর্থাগম হইতে লাগিল। তখন তিনি ধনমদে মত্ত না হইয়া ধনের সদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

দান শক্তি।

তাঁহার যেমন ধন বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তেমনি সেই সঙ্গে তাঁহার দানশক্তিও প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি ধনী হইয়াও ধর্ম্মভীরু ও বিনীত লোক ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই মনে করিতেন যে জগদীশ্বর ধন দিয়াছেন পরোপকারের জন্য। এই বিশ্বাসে তিনি হাজার হাজার গরীব লোককে দান করিতেন। শাস্ত্রে বলে—"দত্ত্বা ন পরিকীর্ত্তয়েৎ" অর্থাৎ দান করিয়া তাহা বলিবে না। সকল দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রে এই উপদেশ আছে যে গোপনে দান করিবে—নাম কিনিবার ইচ্ছায় দান করিলে সে দানের মূল্য থাকে না; তাহা অতি নীচমনার কার্য্য। তারকনাথের দান তদ্রূপ ছিল। তিনি এমনি গোপনে দান করিতেন যে, বাটীর লোকেরাও তাহা জানিতে পারিত না। কর্ম্মচারিগণের হাত দিয়া দান করিলে, পাছে তাহারা জানিতে পারে তজ্জন্য তিনি স্বহস্তে দান করিতেন।

যখন কোন প্রার্থী আসিয়া তাঁহাকে দুঃখ জানাইত, এবং তাঁহার মনে কিছু দিবার ইচ্ছা হইত, তখন তিনি কি দিবেন তাহা মনে মনে স্থির করিতেন; এবং টাকা লইয়া তাহাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া আস্তে আস্তে টাকাগুলি হস্তে গুঁজিয়া দিতেন, এবং তাহার হাতখানি মুঠা করিয়া বলিতেন—"যৎকিঞ্চিৎ হইল, এখানে দেখিবেন না।" সুতরাং সে ব্যক্তি টাকা গণিয়া দেখিতে পারিত না এবং কত টাকা পাইল তাহা বাটী পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে জানিতেও পারিত না।

এইরূপ প্রত্যহ কত লোক যে তাঁহার সাহায্য পাইয়াছে, কত লোক যে তাঁহার অর্থে মানুষ হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। গরিব ছাত্রগণের বিদ্যালয়ের বেতন তিনি প্রতি মাসে ১৫০৲ টাকা করিয়া দিতেন। একবার একটী গ্রামে অত্যন্ত জলকষ্ট হওয়ায়, জনৈক ভদ্র লোক তাঁহার নিকট আসিয়া অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন। প্রামাণিক মহাশয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাতে কত খরচ পড়িবে?" সেই ভদ্র লোক পুষ্করিণী খননের খরচ একটা অনুমান করিয়া কয়েক শত টাকার হিসাব দিলেন। তারকনাথ হাসিয়া বলিলেন, না মহাশয়! আপনি যত টাকা হিসাব ধরিলেন, ইহাতে কিছুই হইবে না। পুকুর কাটিতে এত, ঘাট বাঁধাইতে এত, প্রতিষ্ঠা করিতে এত, ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে এত, মোট প্রায় এত টাকা পড়িবে। এইরূপ একটা আনুমানিক হিসাব ধরিয়া সেই সমস্ত টাকা তাঁহাকে দান করিলেন। তিনি নাম জাহির করিবার জন্য কখনও দান করিতেন না। তিনি কেবল লোকের প্রকৃত অভাব অনুসন্ধান করিয়া যেরূপ বুঝিতেন সেইরূপ ভাবে দান করিতেন। তাঁহার দানের কোন আড়ম্বর ছিল না এবং কাহারও সহিত কোন পরামর্শ করিয়া দান করিতেন না।

একবার তাঁহার সহপাঠী কোন বাল্য বন্ধু কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া তাঁহার সহিত দেখা করেন। বহুকাল পরে বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, শরীরের

বৈলক্ষণ্য ঘটিলেও তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। তাঁহার মলিন বসন ও শুষ্ক বদন দেখিয়া তাঁহাকে কাছে বসাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। কন্যার বিবাহের সাহায্যের জন্য তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া একটু অপেক্ষা করিতে বলিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহাকে উত্তম বস্ত্র পরিধান করাইয়া কিছু জলযোগ করাইলেন। তৎপরে বন্ধুকে একখানি ৫০০৲ টাকার নোঁট দিয়া বলিলেন, ভাই এখানে খুলিও না, যৎকিঞ্চিৎ হইল, কিছু মনে করিও না। বন্ধু বাটী পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখেন যে ৫০০৲ টাকার নোট। তিনি মনে করিয়া ছিলেন যে বন্ধু বোধ হয় ১০৲ টাকা দিয়াছেন, কিন্তু তিনি ৫০০৲ টাকা দেখিয়া বিস্ময়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন, বন্ধু বোধ হয় ভ্রম করিয়াছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তারকনাথের সহিত দেখা করিয়া বলিলেন, ভাই তুমি ভুল করিয়া এই নোটখানি দিয়াছ। তারকনাথ বলিলেন, না ভাই উহাই তোমাকে দিয়াছি। সামান্য হইল, আর কিছু বেশী দিতে পারিলে, ভাল হইত। বন্ধু বিস্ময় বিহ্বলচিত্তে ভগবানের নিকট তাঁহার কুশল প্রার্থনা করিতে করিতে আহ্লাদে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার দানের এইরূপ কত গল্প প্রচলিত আছে।

কলিকাতার দক্ষিণে বেহালায় "আদি হরি সভা" নামে যে বিখ্যাত হরিসভা আছে, তাহা তাঁহারই দেয়। ইহার সাহায্যার্থ তিনি জমী ও বিপুল অর্থ প্রদান করেন। সুকচরের বাগানে তিনি প্রত্যেক সপ্তাহেই যাইতেন। যাইবার সময় মতিলাল শীলের ঠাকুর বাটীর নিকটে তাঁহার ঘোড়া বদল হইত। সেই স্থানে প্রায় চারি পাঁচ শত কাঙ্গালী বসিয়া থাকিত। তিনি প্রত্যেককে প্রতিবারেই এক আনা হিসাবে দান করিতেন। এইরূপে তিনি প্রত্যেক বৎসরে প্রায় একলক্ষ বত্রিশ হাজার টাকা দান করিতেন। এইরূপ দান চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া শেষ জীবন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

Presidency Medical Dispensaryতে তিনি গরিব দুঃখীর জন্য ঔষধের বন্দোবস্ত করেন। তথায় তাঁহার সহি দেখাইলে তিনি বিনামূল্যে ঔষধ পাইতেন। তাঁহাদের ঔষধের মূল্য তিনি বৎসরে দুইবার হিসাব করিয়া মিটাইয়া দিতেন। পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে সাগর স্নানের জন্য তিনি অনেক নৌকার ভাড়া দিয়া সন্ন্যাসীদের সাগরে পাঠাইতেন; এবং তাহাদের সমস্ত ব্যয় ভার তিনি বহন করিতেন। তাঁহার এইরূপ দানের আর কত পরিচয় প্রদান করিব। প্রায় এমন দিন যাইত না, যে দিন তাঁহার দ্বারে দলে দলে গরিব লোক অন্ন না পাইত।

এক সময় খ্যাতনামা কালীসিংহের পিতা শান্তিরাম সিংহ, গুরুচরণ প্রামাণিককে শীতকালে নামাবলি গাত্রদিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতে দেখিয়া উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন,—"এত পয়সা কি হইবে, একখানি শীত বস্ত্রও কি গাত্রে দিতে নাই?" গুরুচরণ কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া স্নানান্তে বাটীতে আসিয়া পুত্রকে এই বিষয় বলিলেন। তারকনাথ এই কথা শুনিয়া পিতাকে বলিলেন, "বাবা উত্তম হইয়াছে, আপনি কিছু বনাত ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দান করুন, তাহা হইলেই শীতবস্ত্র আপনার গাত্রে দেওয়া হইল।" গুরুচরণ পুত্রের সহিত পরামর্শ করিয়া এই উপলক্ষে প্রায় পঁচিশ হাজার টাকার বনাত ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন।

তারকনাথ দুর্গোৎসব উপলক্ষে প্রত্যেক বৎসর প্রায় ২৫০০০৲ টাকা ব্যয় করিতেন। ব্রাহ্মণ ভোজন, আত্মীয় কুটুম্ব ভোজন, কাঙ্গালী বিদায় প্রভৃতি কার্য্যে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রত্যেক বিষয়ের তদারক করিতেন। প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া চারি আনা দক্ষিণা দিতেন এবং কাঙ্গালীদের একসরা মুড়কি, মিঠাই, লুচি ও সন্দেশ প্রদান করিয়া এক আনা বিদায় দিতেন। আহূত অনাহূত প্রত্যেককেই তিনি সম্মান প্রদর্শন করিয়া প্রীতি ভোজনে সন্তুষ্ট করিতেন। তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ এক বিরাট ব্যাপার ও অতুল কীর্ত্তি। এতদুপলক্ষে

এরূপ সমারোহ হইয়াছিল যে, তিনি দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। হাটে বাজারে যেথানে যত জিনিষ আসিত তৎ সমস্তই তারকনাথ ক্রয় করিয়া লইতেন। সুতরাং বাধ্য হইয়া সকলকে তাঁহার বাটীতে আহারাদি করিতে আসিতে হইয়াছিল। ১৫ দিন যাবৎ কোন প্রতিবেশীর বাটীতে রন্ধনাদি হয় নাই। তথন দ্রব্যাদির মূল্য কম ছিল, কিন্তু সেই সময় হইতে দ্রব্যাদি মহার্ঘ হওয়ায়, একটা প্রবাদ প্রচলিত হয় যে, গুরুচরণের শ্রাদ্ধের সময় হইতে জিনিষ পত্রের যে দাম চড়িয়াছে তাহা আর নামিল না।

তারকনাথের একটা প্রধান গুণ ছিল যে তিনি কথনও যশঃপ্রত্যাশী হইয়া দান করিতেন না। যশের আশা তাঁহার দানকে কথনও কলুষিত করিতে পারে নাই। তিনি অনুপম দাতা ছিলেন। তাঁহার নিকটে কেহ তাঁহার প্রশংসা করিলে তিনি লজ্জিত হইতেন। কাঙ্গালী ও নিরাশ্রয়দিগের দুঃখ মোচন তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। তিনি অনেক স্থানে পুষ্করিণী ও কূপ খনন করিয়া অনেক লোকের জল কষ্ট নিবারণ করিয়া ছিলেন। তাঁহার অর্থে অনেক স্থানে হরি-সভার পুষ্টি সাধন হইয়াছিল। ভাগবত পাঠ, ব্রাহ্মণ ভোজন, কাঙ্গালী ভোজন, দেবার্চ্চন প্রভৃতি হিন্দু শাস্ত্রের অনুমোদিত ক্রিয়া কলাপ তিনি অক্ষুণ্ণ ভাবে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সদনুষ্ঠানেই তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার দানের ইয়ত্তা ছিল না। যদিচ তিনি প্রকাশ্যভাবে কোন লোক-হিতকর কার্য্যে বা সভা সমিতিতে দান করেন নাই, তথাপি তাঁহার গুণাবলী ও গুপ্তদানের কথা কুসুম-সৌরভবৎ সমগ্র দেশবাসীর হৃদয়কে মুগ্ধ করিয়া ছিল। এমন কি ১৮৭৭ খৃঃ ১লা জানুয়ারি দিল্লির দরবারে লর্ড লিটন বাহাদুর পর্য্যন্ত তাঁহার বদান্যতার সুখ্যাতি করিয়া, তাঁহাকে রাজা উপাধি প্রদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তারকনাথ এই উপাধি লইতে অস্বীকার করিলে তিনি শেষে এক প্রশংসা পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন।

প্রশংসা পত্র।

By command of His Excellency the Viceroy and Governor General of India, this Certificate is presented in the name of Her most Gracious Magesty Victoria Empress of India, to Babu Taruk Nath Poramanic in recognition of his noted character, charity and liberality.

তাঁহাকে সার্টিফিকেট প্রদান করিবার সময় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন বড়লাট লীটন সাহেব বলিয়াছিলেন যে এমন লোক আর কখনও হয় নাই। এরূপ নির্ম্মল-চরিত্র, নিরহঙ্কার ও দানশীল আর কেহ কোথাও আছেন কি না জানি না। এই প্রশংসাবাদে সকলেই আনন্দিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তারক নাথ বলিয়াছিলেন ইহাতে আমি বড় লজ্জিত হইলাম।

তারকনাথ যদিও বাল্যে অধিক লেখা পড়া করেন নাই, তথাপি বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে তাঁহার অতিশয় উৎসাহ ছিল। ব্যবসার জন্য তাঁহাকে নানাস্থানে যাইতে হইত এবং কার্য্যকরী নানা বিষয়ের আলোচনাতে তাঁহার এরূপ অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে, সাহেবদের ইংরাজী কথা বার্ত্তা বুঝিতে পারিতেন। সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিবা মাত্র প্রায় তাহার অর্থ বুঝিতে পারিতেন। হিসাব পত্র, দেনা পাওনা সমস্ত তাঁহার মুখে মুখে নিষ্পন্ন হইত। তাঁহার স্মরণশক্তিও অসাধারণ ছিল। তিনি অতি বুদ্ধিমান্ ও সর্ব্ববিষয়ে বিচক্ষণ ছিলেন। নানাপ্রকার লোকের সহিত সংস্রব থাকায় তাঁহার এমন একটী ক্ষমতা জন্মিয়াছিল, যে কোন লোককে দেখিবা মাত্র তিনি বলিতে পারিতেন যে তিনি কি ধরণের লোক। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার বিশ্বাস অচল ও অটল ছিল। এই ধ্রুব বিশ্বাসই তাঁহার সমস্ত সদনুষ্ঠানের মূল। তাঁহার বাটীতে যখন হরি সংকীর্ত্তন হইত, তখন তিনি ভাবে বিভোর হইয়া ভগবানের মধুময় হরিনামে উন্মত্ত হইয়া নাচিতে নাচিতে হরি সংকীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। এইরূপ সঙ্গীত তাঁহার বড় আদরের জিনিষ ছিল।

বিলাসিতা যে কি বস্তু তাহা তিনি জানিতেন না। কোন আড়ম্বর, জাঁক জমক বা বাবুগিরি তাঁহার চক্ষুঃশূল ছিল। তিনি সে কালের লোকের মত অতি সরল ও ধর্ম্মভীরু ছিলেন। হাঁটুর উপর সামান্ত ঠেঁটি কাপড় পরিধান করিয়াই সন্তুষ্ট হইতেন। আটাইস বৎসর বয়সের সময় তিনি মৎস্য মাংস পরিত্যাগ করেন। একবেলা নিরামিষ ও অপর বেলা ফল মূলাদি ভোজন করিতেন। তৈলের পরিবর্ত্তে তিনি গোমূত্র মাখিতেন এবং প্রত্যহ গোমূত্র পান করিয়া দেহ শুদ্ধ করিতেন। তিনি নিষ্কলঙ্ক ও নির্ম্মল-চরিত্র ছিলেন। বিনয়, নম্রতা ও সৌজন্য প্রভৃতি সদ্‌গুণে তিনি বিমণ্ডিত ছিলেন। দান করিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দ পাইতেন। দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণ বিশিষ্ট এরূপ মহচ্চরিত্র ব্যক্তি জগতে অতি দুর্ল্লভ।

তারকনাথ জীবনের শেষ ভাগে সাত আট বৎসর বিষয় বিরত হইয়া কেবল ধর্ম্ম চিন্তায় সময় ক্ষেপণ করিতেন। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবল পূজা আহ্নিক, শাস্ত্রপাঠ ও হরি সংকীর্ত্তনে কাল কাটাইতেন। প্রাতঃকালে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণগণের পদধূলি* লইতেন। গাভীগণকে স্বহস্তে কদলী ও তৃণ ভোজন করাইতেন। দুর্গা নাম লিখিয়া চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতেন এবং সমস্ত দিন মালা জপ করিতেন। তিনি পরম বৈষ্ণব ও সাধু পুরুষ ছিলেন। যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিতেন, তাঁহাদের সহিত শাস্ত্র চর্চ্চা করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। তিনি পর নিন্দা বা পর চর্চ্চা ভালবাসিতেন না। একদিন তাঁহার বৈঠকখানায় বসিয়া দুইজন ভদ্রলোক পরের দোষ গুণ বিচার করিতেছিলেন। তিনি বাহির হইতে শুনিতে পাইয়া বলিলেন—"দেখুন

---

* তাঁহার বাটীতে যত ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, সকলকার পদধূলি তিনি নিজে গ্রহণ করিয়া স্বতন্ত্র পাত্রে পুনরায় রক্ষা করিতেন। এইরূপে তিনি লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি দুঃসাধ্য মহাব্যাধিরও অমোঘ ঔষধ। এখনও এই পদধূলি তাঁহার বাটীতে পাওয়া যায়।

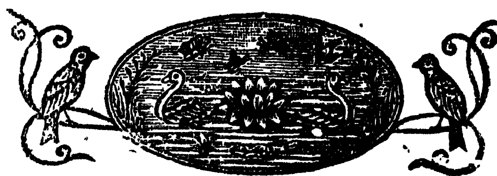
আপনারা যে পরের দোষগুণ বিচার করিতেছেন, তাহা আদালতের বিচারকের কর্ম্ম। বরং গুণের আলোচনা করা ভাল; দোষের আলোচনাতে আমাদের লাভ কি?" তারকনাথ এইরূপ সদুপদেশ দান করিয়া সকলকার হৃদয়কে মুগ্ধ করিতেন।

মৃত্যু।

এই মহাপুরুষ কল্পতরুরূপে প্রার্থীদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া ১২৯১ সালের ৭ই চৈত্র ৬৯ বৎসর বয়সে গঙ্গাতীরে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন। গঙ্গাযাত্রার সময় তাঁহার গাত্রে গঙ্গামৃত্তিকার হরিনাম ছাপ দেওয়া হয়। পবিত্র তুলসীগুচ্ছ তাঁহার দেহের চতুষ্পার্শে রাখিয়া মধ্যে মধ্যে গঙ্গোদক তাঁহাকে পান করান হয়। সেই সময়ে তাঁহার মুখে অন্য কোন কথা নাই, বিষয় বৈভবের চিন্তা নাই, কেবল জিহ্বা হরি হরি করিতেছে। সাধু পুরুষের মৃত্যু এইরূপেই হইয়া থাকে। অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দীন প্রতিপালক পুণ্যশ্লোক পরম বৈষ্ণব ভক্তচূড়ামণি তারকনাথ তাঁহার নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। ইঁহার সৎকার কালে চিতা প্রজ্জ্বলিত হইবামাত্র, আকাশে সূর্য্যমণ্ডল আরম্ভ হয়, এবং চিতায় যতক্ষণ তাঁহার দেহ ছিল, ততক্ষণ ঐ পরিবেষ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। চিতা নির্ব্বাপিত হইলে পরিবেষ অদৃশ্য হইয়া যায়। ইহাতে কলিকাতাবাসী সকলেই বলিয়াছিলেন যে, এই সূর্য্যমণ্ডলে দেবগণ সমবেত হইয়া বিচার করিতেছেন যে, এমন দানশীল তারকনাথকে লইয়া গিয়া তাঁহারা কোন্ দিব্যলোকে স্থানদান করিবেন। তিনি যে স্থানের যোগ্য লোক, দেবদূত আসিয়া সেইস্থানে লইয়া গেলেন। আর এখানে আমরা একজন প্রকৃত ধার্ম্মিক, সত্যপ্রিয়, নিরহঙ্কার, উদারপ্রকৃতিক, ক্ষমাবান্, দয়ালু লোক হারাইলাম। তাঁহার অভাবে সমগ্র দেশ কাঁদিয়াছিল। প্রত্যেক সংবাদপত্রে তাঁহার জন্য গভীর শোক প্রকাশ

করিয়া সম্পাদকীয় স্তম্ভ সকল পরিপূর্ণ হইয়াছিল। কতলোক যে তাঁহার দ্বারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। এমন নিঃস্বার্থ পরোপকারী দানশীল ব্যক্তি আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

তারকনাথ মৃত্যুকালে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি এবং তাঁহার সহধর্ম্মিনী, একমাত্র পুত্র কালীকৃষ্ণ ও দুই কন্যা রাখিয়া যান। কালীকৃষ্ণ চিররুগ্ন, তাঁহার অম্লরোগ ছিল। ইঁহার জন্য তারকনাথ অনেক অর্থব্যয় করেন। কেবল তাঁহার দানের পুণ্য প্রভাবে এই এক-মাত্র পুত্রকে রাখিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। কালীকৃষ্ণও পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। তিনি পিতার মৃত্যুর পর বিংশতি বৎসর পরে ১৩১২ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ৬৩ বৎসর বয়সে পিতার মত সজ্ঞানে গঙ্গা-গর্ভে অরুণোদয়ে পরলোক গমন করেন। তাঁহার চারি পুত্র ও এক কন্যা হইয়াছিল। তন্মধ্যে উপস্থিত দুই পুত্র ও এক পৌত্র বর্ত্তমান। ৩য় পুত্র শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ প্রামাণিক স্বীয় স্বভাব সুলভ সুন্দর চরিত্রের গুণে বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটস্থ প্রাসাদসম সুন্দর ভবনে, পিতৃপিতামহাদির পদানুসরণ করিয়া বংশ মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন।



সম্পূর্ণ।